সীরাতে সরওয়ারে আলম

২য় খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সীরাতে সরওয়ারে আলম

দ্বিতীয় খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা

অনুবাদঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩২২

২য় প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৪
চৈত্র ১৪১৮
এপ্রিল ২০১২

বিনিময় মূল্য : ২১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سیرت سرور عالم -এর বাংলা অনুবাদ
SERAT-E-SARWAR-E-ALAM 2nd volume. by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 215.00 Only.

আমাদের কথা

মাওলানা মরহুম তাঁর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। হিজরত পর্যন্ত লেখার পর তিনি ওফাত লাভ করেন। উর্দু ভাষায় হিজরত পর্যন্ত এ অংশটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উর্দু প্রথম খণ্ডকে আমরা বাংলায় দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছি। বর্তমান গ্রন্থটি তারই দ্বিতীয় অংশ। উর্দু দ্বিতীয় খণ্ডকে আমরা বাংলায় তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশ করার আশা রাখছি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানার সবগুলো গ্রন্থই বাংলা-ভাষী পাঠকদের সামনে দ্রুত হাযির করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান। তাঁর অনুবাদ কাজের পারদর্শিতা, শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা এবং ভাষার বলিষ্ঠতা সম্পর্কে সুধী পাঠকগণকে নতুন করে কিছু বলার আছে বলে আমরা মনে করি না।

একাডেমীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এ গ্রন্থের সকল পাঠককে তিনি নবুওয়াতের প্রকৃত মিশন উপলব্ধির তাওফীক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ডিরেক্টর
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

✪✪✪

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনের নাম যা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসের ওপরে মানব জীবনের গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এ আন্দোলন অতি প্রাচীনকাল থেকে একই ভিত্তির ওপরে এবং একই পদ্ধতিতে চলে আসছে। এর নেতৃত্ব তাঁরা দিয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার নবী-রাসূল বলা হয়। আমাদেরকে যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তাহলে অনিবার্যরূপে সেসব নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ এছাড়া অন্য কোনো কর্মপদ্ধতি এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে না আছে, আর না হতে পারে। এ সম্পর্কে যখন আমরা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর পদাংক অনুসন্ধানের চেষ্টা করি, তখন আমরা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হই। প্রাচীনকালে যেসব নবী তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু জানতে পারি না। কুরআনে কিছু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে গোটা পরিকল্পনা উদ্ধার করা যায় না। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে হযরত ঈসা (আ)-এর কিছু অনির্ভরযোগ্য বাণী পাওয়া যায়—যা কিছু পরিমাণে একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে এবং তাহলো এই যে, ইসলামী আন্দোলন তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে পরিচালনা করা যায় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-কে পরবর্তী পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়নি এবং সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটি মাত্র স্থান থেকে আমরা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ পথনির্দেশ পাই এবং তা হচ্ছে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর জীবন। তাঁর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ পথের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধু নবী মুহাম্মাদ (সা)-ই একমাত্র নেতা যাঁর জীবনে আমরা এ আন্দোলনের প্রাথমিক দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং অতপর রাষ্ট্রের কাঠামো, সংবিধান, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত এক একটি পর্যায় ও এক একটি দিকের পূর্ণ বিবরণ এবং অতি নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানতে পারি।

সূচীপত্র

মানচিত্র সূচী

অধ্যায় ঃ ১৩

পূর্ববর্তী উম্মতগণের অধঃপতন ও তাদের ধ্বংসাবশেষ

সূচনা

যেসব জাতি দুনিয়াকে নিছক ভোগবিলাস ও লীলাখেলার কেন্দ্র মনে করে নবীগণের প্রচারিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করেছে, তারা পর পর কোন্ ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে, তা আমরা জানতে পারি মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করে।[২৫২]

অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি নিছক কৌতুক ও ঔৎসুক্য সহকারে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তার থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর থেকে বুঝা যায়, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি থেকে কতটা আলাদা। একজন তামাশা দেখে অথবা বড় জোর ইতিহাস রচনা করে। আর অন্যজন এসব দেখে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন সব তথ্য ও তত্ত্বের নাগাল পায়।[২৫৩]

মানুষের সংস্কার সংশোধনের জন্যে যাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা সকলেই আপন আপন জনপদেরই অধিবাসী ছিলেন। হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) কে ছিলেন ? এখন আপনারা দেখুন, যেসব জাতি তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করেনি, নিজেদের ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা এবং বল্গাহীন প্রবৃত্তির পেছনে ছুটেছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে ? অনেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করতে গিয়ে আদ, সামুদ, মাদ্ইয়ান, লূতজাতি এবং অন্যান্যদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ অতিক্রম করেছে। তারা কি সেখানে কিছুই দেখতে পায়নি ? যে পরিণাম তারা দুনিয়ায় ভোগ করেছে তা-তো এ কথারই ইংগিত বহন করছে যে, পরকালে তারা অধিকতর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করবে। অপরদিকে যারা এ দুনিয়াতে তাদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে তারা শুধু দুনিয়াতেই মহৎ ছিল না বরং আখেরাতে তাদের অবস্থা অধিকতর ভালো ও সুখময় হবে।[২৫৪]

যেসব জাতি নবীদের কথায় কর্ণপাত করেনি এবং যারা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তাদের জীবন পরিচালনা করেছে, তারা অবশেষে অধঃপতন ও ধ্বংসেরই যোগ্য হয়েছে। ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জ এ কথার সাক্ষ্যদান করে যে, নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যেসব নৈতিক বিধান পাঠিয়েছেন এবং তদনুযায়ী আখেরাতে মানুষের কাজকর্মের যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তা একেবারে মোক্ষম সত্য। কারণ এ নৈতিক বিধানের পরোয়া না করে যে জাতিই নিজেকে সকল দায়িত্বের উর্ধে মনে করেছে এবং ধরে নিয়েছে যে, কারো কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না, তাদেরকে অবশেষে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে।[২৫৫]

অতীতে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছে, তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে প্রভূত সম্পদ ও প্রতিপত্তি দান করেন, তখন তারা ভোগবিলাস ও ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা শুরু করে। তখন সমাজের সামগ্রিক নৈতিক অধঃপতন এতখানি হয়ে পড়ে যে, তাদের মধ্যে এমন কোনো সৎলোকের অস্তিত্বই

থাকে না যে, তাদেরকে অসৎকাজে বাধাদান করবে। আর যদি এমন কেউ থেকেও থাকে তো তাদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে, তাদের দুর্বল কণ্ঠ তাদেরকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এসব কারণেই সেসব জাতি আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপের যোগ্য হয়ে পড়ে।[২৫৬]

যারা সত্যানুসন্ধিতসু তাদের জন্যে আল্লাহর যমীনে শুধু নিদর্শন আর নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে। এসব দেখে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যারা হঠকারী তারা এসব দেখার পরও ঈমান আনেনি। উর্ধলোকের নিদর্শনাবলী এবং নবীদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখেও তারা ঈমান আনেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি না আসা পর্যন্ত তারা সর্বদা গুমরাহির মধ্যেই লিপ্ত রয়েছে। এ প্রসংগে সূরা শুয়ারায় ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ঠিক তেমনি হঠকারিতা করছিল যেমন নবী মুস্তাফা (স)-এর সময় মক্কার কাফেরগণ করছিল। এসব ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন।

প্রথম কথা এই যে, নিদর্শন দু প্রকারের। এক প্রকারের নিদর্শন যা আল্লাহর যমীনে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বিবেকবান ব্যক্তি এসব দেখে নির্ণয় করতে পারে যে, আল্লাহর নবীগণ যে দিকে আহ্বান করছেন তা ঠিক কিনা। দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শন এমন যা দেখেছিল ফেরাউন ও তার জাতি, দেখেছিল নূহের জাতি, আদ এবং সামুদ। আর দেখেছিল লূতের জাতি এবং আসহাবে আয়কাহ্। এখন মক্কার কাফেরদের সিদ্ধান্ত করার ব্যাপার যে, তারা কোন্ প্রকারের নিদর্শন দেখতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক যুগেই কাফেরদের মন-মানসিকতা, যুক্তি-তর্ক, অভিযোগ ও ওজর আপত্তি একই ধরনের ছিল। ঈমান না আনার জন্যে তাদের কলা কৌশল ও বাহানা একই ধরনের ছিল। অবশেষে তাদের পরিণামও হয়েছে একই ধরনের। পক্ষান্তরে সকল যুগে নবীগণের শিক্ষা ছিল একই ধরনের, তাঁদের চরিত্র ও আচার-আচরণ ছিল একই। প্রতিপক্ষের মুকাবেলায় তাঁদের যুক্তি-তর্কের ধরন ছিল একই এবং সেই সাথে আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপারও ছিল এক রকমের। এ দুটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।[২৫৭]

অতীতের জাতিসমূহকে তাদের আপন আপন যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা অন্যায় অবিচার ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে। তাদেরকে সুপথ দেখাবার জন্যে যেসব নবী পাঠানো হয়, তাঁদের কথার প্রতি তারা কর্ণপাত করেনি। ফলে তারা পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হয়েছে এবং তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ হতে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সব শেষে আরববাসীদের পালা এলো। পরবর্তীদের স্থানে এদেরকে কাজ করার সুযোগ দেয়া হলো। যে পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে তাদের পূর্ববর্তীগণ বহিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে এরা (আরববাসী) দণ্ডায়মান। তাদেরকে বলা হলো যে, পূর্ববর্তীদের পরিণাম যদি তারা ভোগ করতে না চায় তাহলে তাদেরকে যে সুযোগ দেয়া হলো তার থেকে তারা কল্যাণ লাভ করুক। তারা যেন অতীত জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যেসব ভুলের কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি তারা যেন না করে।[২৫৮]

হযরত নূহ (আ)-এর জাতি

কুরআনের ইংগিত এবং বাইবেলের বিবরণ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর জাতি যে দেশে বাস করতো তা আজ ইরাক নামে অভিহিত। ব্যাবিলনের প্রাচীন নিদর্শনাবলীতে বাইবেল পূর্ব যেসব প্রাচীন শিলালিপি ও প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে, সেসব থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। এসবের মধ্যে প্রায় এ ধরনের একটা কাহিনী বর্ণিত আছে, যার উল্লেখ কুরআন এবং বাইবেলে পাওয়া যায়, এবং তাতে বলা হয়েছে যে, মুসেলের আশেপাশেই তাদের আবাসস্থল ছিল। আবার যেসব কিংবদন্তী কুর্দিস্তান এবং আর্মেনিয়ায় বংশানুক্রমে চলে আসছে তার থেকেও জানা যায় যে, ঝড়-বৃষ্টি ও তুফানের পর হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা এ অঞ্চলেরই কোনো স্থানে এসে ভিড়েছিল। মুসেলের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের আশেপাশে এবং আরমেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত আরারাত পর্বতের ধারে হযরত নূহ (আ)-এর বিভিন্ন নিদর্শন এখনও চিহ্নিত করা হয় এবং নখ্‌চিওয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে আজও এ কথা প্রচলিত আছে যে, এ শহরের ভিত্তিস্থাপন হযরত নূহ (আ) করেছিলেন।
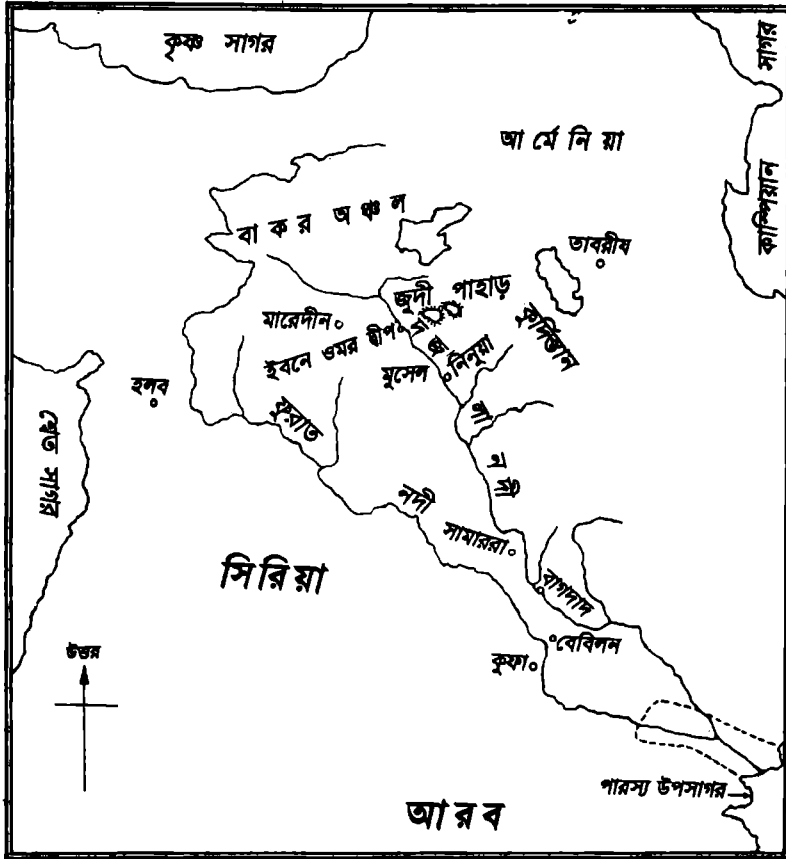
কওমে নূহ-এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

এক প্রবল ঝড়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ চিত্র

হযরত নূহ (আ)-এর উপরোক্ত কাহিনীর সাথে মিলে যায় এমন কিংবদন্তী যা গ্রীক, মিসর, ভারত এবং চীনের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। উপরন্ত বার্মা, মালয়েশিয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের কিংবদন্তী প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ কাহিনী এমন এক যুগের যখন গোটা মানব গোষ্ঠী কোনো একটি ভূখণ্ডেই বসবাস করতো এবং পরবর্তীকালে তারা সেখান থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে সকল জাতিই তাদের প্রাথমিক ইতিহাসে এক ব্যাপক ঝড়ের উল্লেখ করে। অবশ্যি কালচক্রে তার প্রকৃত বিবরণ তারা ভুলে গেছে এবং প্রকৃত ঘটনার উপরে প্রত্যেকেই তাদের আপন আপন ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী এক বিরাট কাল্পনিক রঙের প্রলেপ দিয়েছে।[২৫৯]

যে জুদি পাহাড়ে হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা এসে থেমেছিল, তা কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। বাইবেলে এ নৌকার তটস্থ হওয়ার স্থান বলা হয়েছে আরারাত যা আর্মেনিয়ার একটি পর্বতের নাম। এ হচ্ছে একটা পর্বতমালা। আরারাত নামীয় এ পর্বতমালার অর্থ হচ্ছে, তা আর্মেনিয়ার উচ্চ শীর্ষ থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্তান পর্যন্ত চলেছে। এ পর্বত পুঞ্জের একটি পাহাড়ের নাম জুদি যা আজও জুদি নামে খ্যাত। প্রাচীন ইতিহাসগুলোতে বলা হয়েছে নৌকা এ স্থানে এসেই থেমেছিল। বস্তুত হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের আড়াইশ বছর পূর্বে বেরাসাস (Berasus) নামে ব্যাবিলনের জনৈক ধর্মীয় নেতা প্রাচীন পরম্পরাগত বর্ণনার ভিত্তিতে আপন দেশের যে ইতিহাস রচনা করেন, তার মধ্যে তিনি হযরত নূহ (আ)-এর নৌকার তটস্থ হওয়ার স্থান জুদি পাহাড়ই বলেছেন। এরিস্টলের শিষ্য আবিদেনুসও (Abydenus) তাঁর ইতিহাসে এর সত্যায়ন করেছেন। উপরন্তু তিনি সে যুগের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, ইরাকের বহু লোকের কাছে সে নৌকার খণ্ডিত অংশগুলো সংরক্ষিত আছে, যেগুলো ধুয়ে ধুয়ে তারা রোগীদেরকে পানি পান করায়।[২৬০]

নূহের জাতির নৈতিক অধঃপতন

হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর জাতির যে অবস্থা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ জাতি না আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, আর না তাঁর সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। আল্লাহর ইবাদাত করতেও তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু যে গুমরাহিতে তারা লিপ্ত ছিল তা ছিল শিরকের গুমরাহি। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য সত্তাকেও খোদায়ীর অংশীদার মনে করতো এবং তাদেরও স্তবস্তুতি ও ইবাদাত পাবার অধিকার আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো। অতপর এ মৌলিক গুমরাহি থেকে বহু প্রকারের অনাচার এ জাতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। যেসব স্বনির্মিত দেব-দেবীকে তারা খোদায়ীর অংশীদার মনে করতো তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে জাতির মধ্য থেকে এক বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি হলো। তারা যাবতীয় ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলো। তারা মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ সৃষ্টি করলো। সামাজিক জীবন অবিচার অনাচারে ভরে দিল এবং নৈতিক অনাচার ও পাপাচার মানবতার মূল অন্তসারশূন্য করে দিল।

হযরত নূহ (আ)-এর সংস্কার প্রচেষ্টা

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا - نوح : ٢٢

"তারা বিরাট প্রতারণার জাল বিস্তার করে রেখেছিল।"–সূরা আন নূহ ঃ ২২

প্রতারণা হলো ঐসব নেতৃবৃন্দের কলাকৌশল যার দ্বারা তারা জনসাধারণকে হযরত নূহ (আ)-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতো। যেমন তারা বলতো, নূহ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। এ কথা কি করে মেনে নেয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর অহী এসেছে (সূরা আল আরাফ ঃ ৬৩, সূরা হুদ ঃ ২৭) নূহের আনুগত্য তো আমাদের নীচ শ্রেণীর লোকেরা না বুঝেই মেনে নিয়েছে। তার কথায় সত্যিই যদি কোনো গুরুত্ব থাকতো, তাহলে আমাদের মুরব্বীগণ তা অবশ্যই মেনে নিত। (সূরা হুদ ঃ ২৭)। কোনো নবী-রাসূল পাঠাবার দরকার আল্লাহর হলে, কোনো ফেরেশতাকেই তিনি পাঠাতেন (সূরা মুমিনূন ঃ ২৪)। সে যদি আল্লাহর প্রেরিতই হতো, তাহলে তার সাথে অর্থ ভাণ্ডার থাকতো, গায়েবের এল্‌ম তার জানা থাকতো। আর ফেরেশতাদের মতো সে যাবতীয় মানবীয় অভাব থেকে বেপরোয়া হতো (সূরা হুদ ঃ ৩১)। নূহ এবং তার অনুসারীদের মধ্যে এমন কি কারামত দেখা যায় যার জন্যে তার মর্যাদা স্বীকার করা যায় (সূরা হুদ ঃ ২৭) ? এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের উপরে তার সর্দারি মতব্বরি চালাতে চায় (সূরা মুমিনূন ঃ ২৪)। তার প্রতি কোনো জ্বিনের ছায়া লেগেছে যে তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে (সূরা মু'মিনূন ঃ ২৫)।[২৬১]

হযরত নূহ (আ) এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্য ও হিকমতের সাথে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা জনসাধারণকে প্রতারণার জালে এমনভাবে ফাঁসিয়ে রেখেছিল যে, সংস্কারের কোনো চেষ্টাই কাজে লাগলোনা। অবশেষে হযরত নূহ (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে প্রভু! এ কাফেরদের একটিকেও পৃথিবীতে জীবিত ছেড়ে দিও না। কারণ তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাহ্‌দেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশ থেকে যারাই পয়দা হবে, বদকার এবং কাফের নিমকহারাম হয়েই পয়দা হবে।[১][২৬২]

আযাব

হযরত নূহ (আ)-এর দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে[২] কবুল হলো। অতপর সে জাতির উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়লো। কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্লাবনের সূচনা

১. এখানে হযরত নূহ (আ)-এর ঐ দোয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে যা তিনি করেছিলেন সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাঁর জাতির সংস্কার সংশোধনের জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করার পর। তিনি দোয়া করেছিলেন– اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ আল্লাহ, আমি আর পারছি না, আমাকে সাহায্য কর (সূরা কামার ঃ ১০)। رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا পরওয়ারদেগার! দুনিয়ার একজন কাফেরকেও তুমি ছেড়ে দিও না।–(সূরা আন নূহ ঃ ২৬)

২. হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াত এবং তাঁর জাতির কুফরীর উপরে অটল থাকার ব্যাপার নিয়ে কয়েক শতক ধরে যে দীর্ঘ সংঘাত-সংঘর্ষ চলছিল তার উল্লেখ কুরআনে পাওয়া যায়। সূরায়ে আন্‌কাবুতে বলা হয়েছে, এ সংঘাত-সংঘর্ষ সাড়ে নয় শত বছর ধরে চলে। فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا হযরত নূহ (আ)-এর বংশ পরম্পরা ক্রমে তাদের এ সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখে শুধু এতটুকু ধারণাই করেননি যে, সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই, বরং এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশ থেকে সৎ ও ঈমানদার লোক পয়দা হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হয়েছিল একটি বিশেষ চুলা থেকে, যার নীচ থেকে পানির ঝর্ণা উৎক্ষিপ্ত হয়। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয় এবং অন্যদিকে স্থানে স্থানে যমীনের মধ্যে ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। সূরা হুদে শুধুমাত্র চুলা থেকে গরম পানি উৎক্ষিপ্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। পরে অবশ্যি বৃষ্টিপাতের ইংগিতও করা হয়েছে। কিন্তু সূরা কামারে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে ঃ

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ـ

"আমি আসমানের দরজা খুলে দিলাম যার থেকে আবিরাম বর্ষণ হতে থাকলো। আর যমীনকেও বিদীর্ণ করলাম যার ফলে চারদিকে শুধু ঝর্ণা আর ঝর্ণা বেরুতে থাকলো। এ উভয় প্রকারের পানি আল্লাহর লিখন পূরণের জন্যে লেগে গেল।"

উপরন্তু কুরআনে 'তন্নুর' শব্দের পূর্বে ال (আলিফ-লাম) ব্যবহারের তাৎপর্য এটা মনে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা একটি বিশেষ চুলাকে এ কাজের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। তারপর ইংগিত মাত্রই যথা সময়ে তার থেকে গরম পানি উপরে উঠতে লাগলো। পরে এটাই ঝড় ও প্লাবন সৃষ্টিকারী চুলা নামে অভিহিত হয়।[২৬৩]

প্লাবন কি বিশ্ব জুড়ে ছিল ?

এ প্লাবন কি সারা বিশ্ব জুড়ে ছিল, না শুধু ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল যেখানে নূহের জাতি বসবাস করতো ? এ এমন এক প্রশ্ন যার জবাব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ইসরাঈলী বর্ণনামতে সাধারণ ধারণা এই যে, প্লাবন সমগ্র দুনিয়া জুড়ে হয়েছিল (আদি পুস্তক ৭ ঃ ১৮-২৪)। কিন্তু কুরআনে এ কথা কোথাও বলা হয়নি। কুরআনের ইশারা-ইঙ্গিত হতে একথা অবশ্যই বুঝা যায় যে, তুফান পরবর্তী সময়ের মানব গোষ্ঠী নূহের প্লাবন হতে বাঁচিয়ে রাখা মানব গোষ্ঠী হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা একথা বুঝা জরুরী নয় যে, নূহের প্লাবন বিশ্বজোড়া হয়েছিল। কারণ একথা এভাবেও ঠিক বলে বলা যেতে পারে যে, তখন বনী আদমের গোষ্ঠী বিশ্বের ঐ ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো যেখানে তুফান সংগঠিত হয়েছিল। আর তুফানের পর যে মানব বংশ জন্ম নিয়েছিল ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারণার সমর্থন দুটি বিষয় থেকে পাওয়া যায়। একটা এই যে, দাজলা ও ফোরাত বিধৌত ভূখণ্ডে এক মহাপ্লাবনের প্রমাণ ঐতিহাসিক বর্ণনা, প্রাচীন নিদর্শনাবলী এবং যমীনের ভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির মধ্যে এক মহাপ্লাবনের কিংবদন্তী প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এমনকি অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউ গিনির মতো সুদূর দেশগুলোর প্রাচীন কিংবদন্তীতেও

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ـ

-"হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাহদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশ থেকে যারাই পয়দা হবে তারা পাপাচারী ও সত্যের বিরোধী হবে।" আল্লাহ তাআলা স্বয়ং হযরত নূহের এ অভিমত সঠিক মনে করেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ ও অভ্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন-

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

-তোমার জাতির মধ্যে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান এনেছে। আর কেউ ঈমান আনার নেই। অতএব তাদের পরিণামের জন্যে দুঃখ করা ছেড়ে দাও।[২৬৪]

এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, কোনো এক সময়ে হয়তো এসব জাতির পূর্ব পুরুষ একই জনপদে বসবাস করতো যেখানে এ প্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তারা দুনিয়ায় বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন এসব কিংবদন্তী তারা তাদের সথে বহন করে নিয়ে যায়।[২৬৫]

নূহের নৌকা একটা শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে পড়ে

وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ العنكبوت : ١٥

"আমি তাকে বিশ্ববাসীর জন্যে একটা শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।"

–সূরা আনকাবুত ঃ ১৫

এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়ানক শাস্তি অথবা এ বিরাট ঘটনাকে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানানো হয়েছে। কিন্তু এখানে সূরা ক্বামারে (১১৫ আয়াত) এটাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে এটাই মনে হয় যে, শিক্ষণীয় নিদর্শন স্বয়ং ঐ নৌকাটি ছিল যা পর্বতশীর্ষে বিদ্যমান রইলো এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে এ সংবাদ বহন করতে থাকলো যে, দুনিয়ায় এমন ধরনের একটি প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের উপরে আটকে গিয়েছিল। সূরা আল ক্বামারের আয়াতের তাফ্সীরে ইবনে জারির কাতাদার এ বর্ণনা উধৃত করে বলেন, সাহাবীদের যুগে যখন মুসলমানগণ আল্‌জাযিরা অঞ্চলে গমন করেন, তখন, তাঁরা জুদি পাহাড়ের উপরে (মতান্তরে বাকেরওয়া নামে একটি বস্তির নিকটে) ঐ নৌকাটি দেখতে পান। বর্তমান সময়েও কখনো কখনো শুনতে পাওয়া যায় যে নূহের নৌকার সন্ধানে মাঝে মাঝে অভিযান পাঠানো হয়। কারণ স্বরূপ বলা হয় যে, অনেক সময় আরারাত পর্বতমালার উপর দিয়ে যখন কোনো বিমান চলে তখন বৈমানিকগণ পাহাড়ের মাথায় নৌকার মত কিছু একটা দেখতে পান।

ইমাম বুখারী, ইবনে আবি হাতেম, আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে জারির কাতাদা থেকে বর্ণনা উধৃত করে বলেন, মুসলমানদের ইরাক এবং আল্‌জাযিরা বিজয়ের সময় এ নৌকা জুদী পাহাড়ের উপরে (মতান্তরে বাকেরওয়া বস্তির নিকটে) বিদ্যমান ছিল যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ দেখতে পান।[২৬৬]
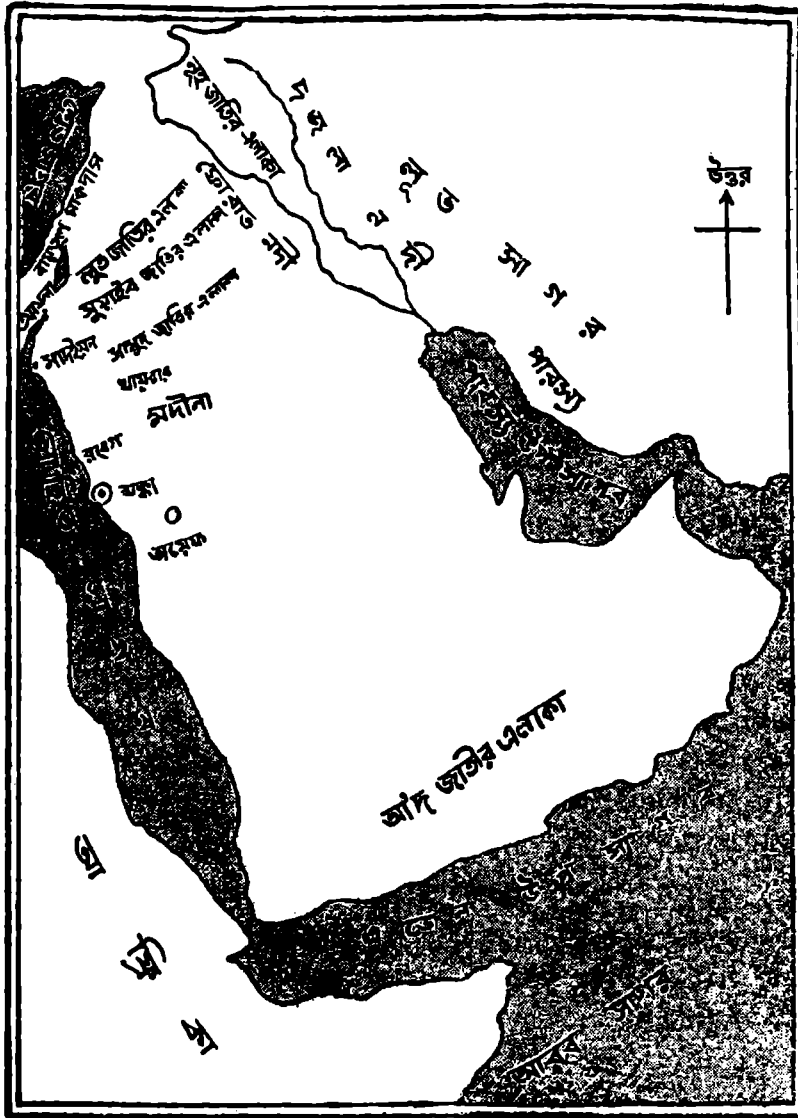
আ'দ জাতির এলাকা

আদ জাতি

নামকরণ

এ ছিল আরবের অতি প্রাচীন জাতি। এ জাতির কাহিনী আরববাসীদের মুখে মুখে শুনা যেতো। তাদের নাম ছোট ছেলেমেয়েদেরও জানা ছিল। তাদের শান শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। আবার দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা মুছে যাওয়াও ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তাদের এ খ্যাতির জন্যে আরবী ভাষায় প্রত্যেক প্রাচীন জিনিসকে 'আদি' বলা হয়। প্রাচীন নিদর্শনাবলীকেও 'আদিয়্যাৎ' বলা হয়। যে জমির কেউ মালিক থাকে না এবং যা অনাবাদী পড়ে থাকে তাকে 'আদিয়্যুল আর্‌দ' বলা হয়। প্রাচীন আরবী কাব্যে এ জাতির উল্লেখ খুব বেশী পাওয়া যায়। আরবের কুলপঞ্জী বিশারদগণ আপন দেশের অতীত জাতিদের সকলের প্রথমে এ জাতির নাম করে। হাদীসে আছে, একবার নবী করীম (সা)-এর নিকটে বনী যুহল বিন শায়বানের এক ব্যক্তি এলো, যে ছিল আদ জাতির অঞ্চলে বসবাসকারী। সে নবীকে ঐসব কাহিনী শুনালো যা ঐ জাতি সম্পর্কে বহু প্রাচীন কাল থেকে তার এলাকার লোকেরা লোক পরম্পরা শুনে এসেছে।

আদ জাতির আবাস স্থল

কুরআনের দৃষ্টিতে এ জাতির প্রকৃত আবাসস্থল ছিল আহকাফ[১] অঞ্চল যা হেজায, ইয়ামিন এবং ইয়ামামার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখান থেকে বিস্তার লাভ করে তারা ইয়ামিনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ইরাক পর্যন্ত তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাসের দিক থেকে এ জাতির ধ্বংসাবশেষ দুনিয়া থেকে প্রায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ আরবে কোথাও কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়—যা আদ জাতির প্রতি আরোপ করা হয়।

এক স্থানে হযরত হুদ (আ)-এর কবর আছে বলে কথিত আছে। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ নৌবাহিনীর জনৈক অফিসার (James R. Wellested) 'হিসনে গোরাবে' একটা শিলালিপি দেখতে—পান যাতে হযরত হুদ (আ)-এর উল্লেখ ছিল। লেখা থেকে পরিষ্কার মনে হয় এ ঐসব লোকের লেখা যারা হযরত হুদের (আ) শরিয়তের অনুসারী ছিল।[২৬৭]

ইবনে ইসহাক বলেন, আদ জাতির বসতি ওমান থেকে ইয়ামিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুরআন আমাদেরকে বলে যে, তাদের প্রকৃত আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ', যেখান থেকে বের হয়ে তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দুর্বল জাতিগুলোর উপর ছেয়ে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত দক্ষিণ আরবের লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত আছে যে, আদ জাতি এ অঞ্চলেই বসবাস করতো। বর্তমান শহর মুকাল্লা থেকে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে হাজারামাওতে একটি স্থান আছে, যেখানে লোকে হযরত হুদ (আ)-এর কবর বানিয়ে রেখেছে এবং তা হুদের কবর বলে খ্যাত। প্রতি বছর ১৫ই শাবানে সেখানে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে জমা হয়। যদিও এ কবর

---

১. আহ্‌কাফ্‌ 'হেকফ' শব্দের বহুবচন এবং তার আভিধানিক অর্থ হলো, বালুর লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতার দিক দিয়ে অবশ্যি পাহাড়ের মতো নয়। কিন্তু পরিভাষার দিক দিয়ে এ আরব মরুর (রুবউল খালী) পশ্চিমাংশকে বলে যেখানে কোনো বসতি নেই।-গ্রন্থকার২৬৮

ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রমাণিত নয়, তথাপি দক্ষিণ আরবের বহু সংখ্যক লোকের সেখানে একত্র হওয়া সম্ভবতঃ এ কথারই প্রমাণ যে, স্থানীয় কিংবদন্তী এ অঞ্চলকেই আদ জাতির বাসস্থান বলে নির্ধারণ করে। উপরন্তু হাজারামাওতে বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ এখন পাওয়া যায় যে, স্থানীয় অধিবাসীগণ এখন পর্যন্ত এটাকেই আদ জাতির বাসস্থান বলে।

আদ জাতির আবাসস্থলের বর্তমান অবস্থা

আহ্কাফের বর্তমান অবস্থা দেখে কারো পক্ষে এ ধারণা করা সম্ভব নয় যে, কোনো কালে একটি সভ্যতামণ্ডিত শক্তিশালী জাতি এখানে বসবাস করতো। সম্ভবতঃ হাজার হাজার বছর আগে এটি একটা শস্যশ্যামল অঞ্চল ছিল এবং কালে ভদ্রে আবহাওয়ার পরিবর্তনে তা মরুময় প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন তার অবস্থা এই যে, এমন এক গ্রাসকারী মরুময় প্রান্তর যে, যার মাঝখানে থাকার দুঃসাহস কারো হতে পারে না। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে বাভিরিয়ার জনৈক সামরিক অফিসার তার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছেছিল। সে বলে, হাজারামওতের উত্তরে উচ্চভূমির উপর দাঁড়িয়ে দেখলে এ মরু প্রান্তরকে এক হাজার ফুট নীচে দেখা যায়। তার স্থানে স্থানে এমন সাদা ভূখণ্ড আছে যেখানে কিছু পড়লে তা বালুর সমুদ্রে তলিয়ে যায় এবং তা জরাজীর্ণ হয়ে যায়। আরবের বেদুঈনরা পর্যন্ত এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে। কোনো রকমেই তারা সেখানে যেতে রাজী হয় না। একবার যখন বেদুঈন সেই সামরিক অফিসারকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজী হলো না—তখন সে একাকীই সেখানে গেল। সে বলে, এখানকার বালু পাউডারের মতো সূক্ষ্ম ও মিহি। আমি দূর থেকে একটা বালতি সেখানে নিক্ষেপ করলাম। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেটা তলিয়ে গেল। যে রশি দিয়ে বেঁধে তা ফেলে দিয়েছিলাম তাও তৎক্ষণাৎ গলে গেল।[১]২৬৯

ধ্বংসের পূর্বের সচ্ছলতা

আরববাসীর ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রথম যুগের আদ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের স্মৃতি চিহ্নগুলোও দুনিয়া থেকে নির্মূল হয়েছে। আরব ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে লুপ্ত জাতি বলে গণ্য করে। আবার এটাও আরব ইতিহাসের সর্বসম্মত কথা যে, আদ জাতির শুধু মাত্র ঐ অংশই অবশিষ্ট ছিল যারা ছিল হযরত হুদ (আ)-এর অনুসারী। আদ জাতির এই অবশিষ্ট অংশকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়েছে। 'হিসনে গোরাবের' যে শিলালিপির উল্লেখ আমরা উপরে করেছি তা তাদেরই স্মৃতি চিহ্নসমূহের একটি। এ শিলালিপি প্রায় আঠারশ' বছর খৃস্ট পূর্বের বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ শিলালিপির যে মূল বচনটি পড়েছেন, তার কয়েকটি বাক্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ঃ
1. Arabia and the Isles, Harold Ingrams, London, 1946.
2. The Unveiling of Arabia, R. H. Kirnan, London, 1937.
3. The Empty Quarter, Philby, London, 1933.

"আমরা দীর্ঘকাল যাবত এ দুর্গে এমন প্রভাব প্রতিপত্তিসহ বসবাস করছি যে, দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। আমাদের নদীগুলো কানায় কানায় পূর্ণ থাকতো এবং শাসকগণ এমন বাদশাহ ছিলেন যাদের চিন্তাধারা ছিল পবিত্র পরিশুদ্ধ এবং অনাচার ও দুষ্কৃতির প্রতি তাঁরা ছিলেন কঠোর। তাঁরা হুদ (আ)-এর শরিয়াত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসন চালাতেন এবং সুন্দর সিদ্ধান্তগুলো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হতো। আমরা অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন বিশ্বাস করতাম।"

এ বচন কুরআনের ঐ বর্ণনাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করে যে আদ জাতির অতীত প্রভাব প্রতিপত্তি ও সচ্ছলতার উত্তরাধিকারী অবশেষে তারাই হয়েছিল যারা হযরত হুদ (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল।[২৭০]

কুরআনে তাদের সমৃদ্ধি ও গর্ব অহংকারের উল্লেখ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ ـ الاعراف : ٦٩

"স্মরণ কর আল্লাহ তায়ালার সেই অনুগ্রহ-অনুকম্পাকে যে নূহের জাতির পরে তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানালেন।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৬৯

দৈহিক দিক দিয়ে তারা ছিল খুব হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী।

وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ـ الاعراف : ٦٩

"শারীরিক দিক থেকে তোমাদেরকে তিনি খুবই স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট করেছিলেন।"

আপন যুগে তারা ছিল নজীর বিহীন জাতি। অন্য কোনো জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না।

الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ـ الفجر : ٨

"যাদের মতো অন্যজাতি দেশে পয়দা করা হয়নি ।"–সূরা আল-ফাজর ঃ ৮

তাদের সভ্যতা ছিল খুব উন্নত ধরনের। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের উপরে উঁচু উঁচু দালানকোঠা তৈরী করা। আর এ জন্যে তারা দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছিল।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ـ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ـ الفجر : ٦ـ٧

"তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু উচ্চস্তম্ভের মালিক আদে এরামের সাথে কি ব্যবহার করেছেন?"–সূরা আল ফজর ঃ ৬-৭

তাদের এ বৈষয়িক ও দৈহিক শৌর্য বীর্য তাদেরকে গর্বিত করেছিল। তারা শক্তি মদমত্ত হয়ে পড়েছিল।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ـ حم السجده :١٥

"এখন আদের কথা। তারা ত দুনিয়ায় সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে গর্ব অহংকারের আচরণ করেছিল এবং বলতে শুরু করেছিল–কে আছে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?"
–সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ১৫

তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল কতিপয় বড়ো বড়ো স্বৈরাচারীর হাতে যাদের সামনে কেউ টু' শব্দটিও করতে পারতো না।

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ـ هود ٥٩

"এবং সত্যের দুশমন প্রত্যেক স্বৈরাচারীর হুকুম তারা মেনে চলতো।"–সূরা হুদ ঃ ৫৯

ধর্মীয় দিক থেকে তারা আল্লাহকে অস্বীকারকারী ছিল না বরং শিরকে লিপ্ত ছিল। দাসত্ব আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর করতে হবে এ কথা তারা মানত না।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ـ الاعراف : ٧٠

"তারা (হুদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যে এসেছো যে, আমরা শুধু আল্লাহর বন্দেগী করবো এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে ছেড়ে দেব ?"–সূরা আল আরাফ ঃ ৭০[(২৭১)]

তাদের উপর আযাব নাযিলের কারণ

প্রাচীন আদ জাতি ধ্বংস এ জন্যে হয়নি যে, তাদের সাথে আল্লাহর কোনো দুশমনি ছিল এবং তার জন্যে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। বরঞ্চ তারা নিজেরাই এমন জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তো তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং নিজেদেরকে সামলাবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদের হেদায়াতের জন্যে রাসূল পাঠান। রাসূলগণের মাধ্যমে ভ্রান্ত পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তাদেরকে সুস্পষ্ট করে বলে দেন যে, তাদের কল্যাণের পথ কোন্‌টা, আর ধ্বংসের পথ কোন্‌টা। কিন্তু তারা যখন সংস্কার সংশোধনের কোনো সুযোগ গ্রহণ করলো না এবং ধ্বংসের পথে চলার জন্যেই জিদ ধরে বসলো। তখন অনিবার্যরূপে তাদের যা পরিণাম হবার ছিল তাই হলো।[২৭২]

আযাব সম্পর্কে কুরআনের বিবরণ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط

"অবশেষে আমি কিছু অশুভ দিনে তাদের উপরে ভয়ানক ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করলাম, যাতে করে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ গ্রহণ করাতে পারি।"

–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ১৬

কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে এ আযাবের যে বিবরণ এসেছে তা হলো এই যে, প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু সাত রাত এবং আট দিন ধরে ক্রমাগত চলতে থাকে। তার প্রচণ্ডতায় মানুষ এমনভাবে পড়ে পড়ে মরতে থাকে যেন খেজুর গাছের শুষ্ক কাণ্ড পড়ে রয়েছে–(সূরা আল-হাক্কাহ্ ঃ ৭)। যে সবের উপর দিয়ে এ বায়ু বয়ে গেল, তার সব কিছুকেই জরাজীর্ণ করে গেল– (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৪২)। যখন এ বাতাস বইতে শুরু করে, তখন আদ জাতির লোকেরা আনন্দ করছিল। বলছিল, বাঃ! বেশ ঘনো মেঘ দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি হবে এবং শুকনো জিনিস সজীব হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাতাস এমন প্রচণ্ড বেগে এলো যে, গোটা জনপদকে ধ্বংস করে দিল।[২৭৩]

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ القمر : ١٩ ـ ٢٠

"আমি একটি অশুভ দিনে প্রচণ্ড তুফান তাদের উপর পাঠালাম। এ তুফান তাদেরকে উপরে তুলে তুলে এমনভাবে নীচে ফেলে দিচ্ছিল যেন তারা মূলোৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৯-২০

অর্থাৎ এমন এক দিন যার অনিষ্টকারিতা ক্রমাগতঃ কয়েক দিন ধরে চলেছিল। সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্জাদার ১৬ আয়াতে فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-হাক্কার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে এ তুফান সাত রাত এবং আট দিন ধরে চলেছে।[১](২৭৪)

১. কথিত আছে যে, যে দিন এ আযাব শুরু হয় সে দিনটা ছিল বুধবার। তাতে করে লোকের ধারণা জন্মে যে, বুধবার দিনটা অশুভ দিন এবং এই দিনে কোনো কাজ শুরু করা ঠিক না। এর সমর্থনে কিছু দুর্বল হাদীসও উদ্ধৃত করা হয়। যার ফলে সেদিনের অশুভতার ধারণা জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন, ইবনে মারদুইয়া এবং খতিব বাগদাদীর বর্ণনা–اخر اربعاء فى الشهر نحس مستمر ـ অর্থাৎ মাসের শেষ বুধবার অশুভ দিন, যার অশুভতা চলতেই থাকে। ইবনে জাওযী এ হাদীসকে কাল্পনিক বলেন। ইবনে রজব বলেন, এ হাদীস সহীহ্ নয়। হাফিজ সাখাবী বলেন, যতভাবে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মনগড়া। এমনিভাবে তাবারানীর এ হাদীসকেও মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন–হাদীসটি হলো–يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ـ অর্থাৎ বুধবার দিন মনহুস্ বা অশুভ দিন। অন্যান্য কোনো কোনো রাওয়ায়াতে বলা হয়েছে, বুধবার দিনে সফর করা ঠিক নয়, লেন-দেন ও নখ কাটা ঠিক নয়। রোগীর সেবা করাও ঠিক নয়। কারণ কুষ্ঠ রোগ ঐদিন থেকে শুরু হয়। কিন্তু এসব বর্ণনাই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য এবং তার উপরে কোনো আকীদার বুনিয়াদ হতে পারে না। মুহাক্কিক মুনাদী বলেন–
توقى الاربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم اذا الايام كلها لله تعالى لاتنفع ولا تضر بدء تها ـ অর্থাৎ বদ ফালির ধারণায় বুধবারকে অশুভ দিন মনে করে পরিত্যাগ করা, গণকদের মতো ধারণা এ ব্যাপারে পোষণ করা কঠিন হারাম। কারণ সব দিন আল্লাহর। কোনো দিনই স্বয়ং মংগল বা অমংগলকারী নয়।

আল্লামা আলুসী বলেন, সব দিন সমান। বুধবারের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। রাত ও দিনের মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যা কারো জন্যে ভালো এবং কারো জন্যে মন্দ হয় না। সবসময় আল্লাহ তায়ালা কারো জন্যে উপযোগী এবং কারো জন্যে অনুপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করে দেন।–গ্রন্থকার২৭৫

সামুদ জাতি

পরিচয়

আরবের প্রাচীনতম জাতিসমূহের মধ্যে সামুদ জাতি দ্বিতীয়, যারা আদের পর সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে তাদের গল্প-কাহিনী আরবের সকলের মুখে শুনা যেতো। জাহেলিয়াতের যুগের কবিতা ও ভাষণের মধ্যে বেশীর ভাগ তাদের উল্লেখ করা হতো। আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোল বেত্তাদের বইপুস্তকেও তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মসীহ্ (আ)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এ জাতির কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, এ জাতির লোকেরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে নাবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কারণ নাবতীদের সাথে এদের শত্রুতা ছিল।

সামুদ জাতির অধিবাস

এ জাতির অধিবাস উত্তর-পশ্চিম আরবের সেই অঞ্চলে ছিল যা আজও 'আল-হিজর' নামে অভিহিত। বর্তমানকালে মদীনা এবং তবুকের মধ্যে স্থাপিত হেজায রেলওয়ের একটি স্টেশনের নাম 'মাদায়েনে সালেহ'। এটাই ছিল সামুদ জাতির সদর বাসস্থান এবং প্রাচীনকালে একে বলা হতো 'হিজর'। আজ পর্যন্ত সেখানে হাজার হাজার একর জুড়ে প্রস্তর নির্মিত দালান কোঠা দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় খোদাই করে বানিয়েছিল। এ নীরব ও বিজন শহরটি দেখলেই অনুমান হয় যে কোনো এক কালে এ শহরের জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের কম ছিল না।[১]

কুরআন নাযিল কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এসব ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতো। তবুও অভিযানকালে নবী করীম (সা) যখন এ পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি মুসলমানদেরকে এসব ধ্বংসাবশেষ দেখান এবং এসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেন। এক স্থানে তিনি একটি কূপের দিকে ইংগিত করে বলেন, এটা সেই কূপ যার থেকে হযরত সালেহের (আ) উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদেরকে শুধু এ কূপ থেকে পানি পান করার নির্দেশ দেন। তিনি একটি পাহাড়ী উপত্যকা দেখিয়ে বলেন, এখান থেকে এসেই উটনী পানি পান করতো। এখনো সে স্থানটি ফাজ্জুন্নাকাহ্, নামে খ্যাত।[২]২৭৭

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ

وَاذْكُرُوٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ

الْجِبَالَ بُيُوْتًا ع ـ الاعراف : ٧٤

---

১. হেজাজের উত্তরাঞ্চলে রাবেগ থেকে উক্‌বা পর্যন্ত এবং মদীনা ও খায়বর থেকে তাইমা ও তবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজও সামুদের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। কুরআন নাযিল কালে এসব ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কাল থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট থাকারই কথা।–গ্রন্থকার২৭৬

২. তবুক অভিযানে যাবার পথে মুসলমানগণ সামুদের এ ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। তাঁদেরকে একত্র করে নবী করীম (সা) বলেন, সামুদ জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। তিনি আরও বলেন, এ এমন এক জাতির বাসস্থান ছিল, যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। এটা আনন্দ ভ্রমণের স্থান নয়, বরঞ্চ কান্নার স্থান। অতএব শীগ্গীর এ স্থান অতিক্রম করে চল।–গ্রন্থকার২৮০

"সে কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তায়ালা আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, আজ তোমরা তাঁদের তৈরি উপযোগী ভূমি খণ্ডে বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় খোদাই করে বসবাস করার দালান কোঠা বানাচ্ছ।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৭৪

সামুদ জাতির স্থাপত্য শিল্প (পাহাড় খোদাই) ঠিক সেরূপ ছিল যেমন ভারতে ইলোরা, অজন্তা এবং অন্যান্য স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। মাদায়েনে সালেহ্তে এখনো সেসব দালান কোঠা অবিকল বিদ্যমান রয়েছে। সেসব দেখে মনে হয়, এ জাতি প্রকৌশল বিদ্যায় কত উন্নতি করেছিল।[২৭৮]

হিজ্র ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় আবাসস্থল। তার ধ্বংসাবশেষ মদীনার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান শহর 'আল-উলা' থেকে কয়েক মাইল ব্যবধানে দেখতে পাওয়া যায়। মদীনা থেকে তবুক যাবার পথে এ স্থানটি প্রধান সড়কের উপরেই পাওয়া যায়। এ উপত্যকার উপর দিয়েই কাফেলা চলাচল করে। কিন্তু রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেউ এখানে অবস্থান করে না।

অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে ইবনে বতুতা হজ্জে যাবার পথে এখানে পৌছেন। তিনি বলেন, এখানে লাল রঙের পাহাড়ে সামুদ জাতির দালান কোঠা বিদ্যমান। পাহাড় খোদাই করে করে তারা এসব বানিয়েছিল। তাদের নির্মিত কারুকার্য এখন পর্যন্ত এতটা জীবন্ত যে, মনে হয় এই এখনই বুঝি তা তৈরী করা হয়েছে। এসব স্থানে এখনো মানুষের গলিত হাড়-হাড্ডি দেখা যায়।[২৭৯]

বস্তুগত উন্নতি ও নৈতিক অধপতন

এ জাতি সম্পর্কে কুরআন মজীদের সূরা আরাফের ৭৩ থেকে ৭৯ আয়াতে, সূরা হুদের ৬১-৬৮, সূরা হিজ্রের ৮০-৮৪, সূরা নমলের ৪৫-৫৩, সূরা যারিয়াতের ৪৩-৪৫, সূরা ক্বামারের ২৩-৩১, সূরা আল হাক্কার ৪-৫, সূরা আল-ফজরের ৯ এবং সূরা আশ শামসের ১১ আয়াতে যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তার থেকে জানা যায় যে, আদ জাতির পর যে জাতিকে সমৃদ্ধি দান করা হয়েছিল তা ছিল এই সামুদ জাতি। جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ - الاعراف ٧٤ কিন্তু তাদের তামাদ্দুনিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির একই পরিণামই হয়েছিল—যা হয়েছিল আদ জাতির। অর্থাৎ জীবন-যাপনের মান যতোটা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছিল, মানবতার মান ততো নিম্নগামী হচ্ছিল। এক দিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ইলোরা এবং অজন্তার মতো পাথর খোদাই করে করে প্রাসাদের পর প্রাসাদ তৈরী হচ্ছিল। অপরদিকে সমাজে শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটছিল। যুলুম অত্যাচারে সমাজ জর্জরিত হচ্ছিল। সমাজে চরিত্রহীন লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।। উচ্চ শ্রেণীর লোক গর্ব অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। হযরত সালেহ (আ) যে হকের দাওয়াত পেশ করেন, তাতে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই শুধু সাড়া দেয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এই বলে নবীর দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে।

إِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

"তোমরা যার উপর ঈমান এনেছ, তাকে আমরা মানি না।"

সত্য প্রত্যাখ্যান করার তিনটি কারণ

সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ)-কে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল তিনটি কারণে। প্রথম এই যে, তিনি ছিলেন একজন মানুষ। তিনি কোনো অতি মানব ছিলেন না। বলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে দিতে তারা পারেনি। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাদের স্বজাতিরই লোক ছিলেন। অতএব তাদের মতে তাদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কারণ থাকতে পারে না। তৃতীয়তঃ তাদের মতে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন। তিনি কোনো শক্তিশালী দলপতি নন, তাঁর সাথে কোনো লোক লস্কর বা সেনাবাহিনী নেই, তাঁর কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই। এজন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া যায় না। তারা মনে করতো, নবী কোনো অতি মানব হবেন। আর যদি মানুষই হবেন তো, তাদের দেশ এবং জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন না। অন্য কোথাও থেকে আসবেন অথবা বাইর থেকে তাঁকে পাঠানো হবে। এটাও যদি না হয় তো নিদেনপক্ষে তাঁকে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি হতে হবে। তাঁর সুখ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে যার কারণে এ কথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে, পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহর দৃষ্টি তাঁর উপর পড়েছে তাঁকে নির্ধারিত করার জন্যে।[২৮২]

মংগল ও অমংগলের দ্বন্দ্ব

হযরত সালেহ (আ) তাঁর দাওয়াতের সূচনা করার পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ   النمل ٤٥

"তারা সহসা দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।"—সূরা আন নামল ঃ ৪৫

একদল ঈমান আনে এবং অপর দল ঈমান আনতে অস্বীকার করে। এ মতবিরোধের কারণে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে—

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ○ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ○ الاعراف ٧٥ ـ ٧٦

"ঐ জাতির গর্বিত দলপতিরা দুর্বল ঈমানদারদেরকে বলতো, তোমরা সত্যিই কি জান যে, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ? তারা জবাব দিল, যে সত্যসহ তাঁকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমরা ঈমান রাখি। তখন ঐসব গর্বিত লোকেরা বলে, যে জিনিসের উপর তোমরা বিশ্বাস পোষণ কর তা আমরা মানি না।"

অন্যত্র এ জাতির দলপতিদের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "হে সালেহ! তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা এনে দাও না দেখি, যদি সত্যিই তুমি রাসূলদের মধ্যে একজন হয়ে থাক।"—সূরা আল আ'রাফ ঃ ৭৭

মোজেযা প্রদর্শনের দাবী

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ز وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ج كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ـ القمر ٢٧-٢٨

"আমরা উটনীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা হিসাবে পাঠাচ্ছি। এখন তুমি ধৈর্য্য সহকারে দেখ যে, তাদের কি পরিণাম হচ্ছে। তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, পানি তাদের এবং উটনীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। প্রত্যেক পক্ষ তার পালার দিন পানি পান করতে আসবে।"–সূরা আল ক্বামার ঃ ২৭-২৮

আমরা উটনীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা হিসাবে পাঠাচ্ছি–এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, হঠাৎ একটি উটনী তাদের সামনে এনে হাজির করা হলো এবং তাদেরকে বলা হলো, এ একা একদিন পানি পান করবে এবং তোমরা ও তোমাদের পশু অন্যদিন পানি পান করতে পারবে। তার পালার দিনে তোমরা কেউ কোনো কূপ অথবা ঝর্ণাতে পানি নিতে আসবে না এবং তোমাদের পশুকেও পানি পান করাতে আসবে না। এ চ্যালেঞ্জ ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া হলো যার সম্পর্কে তারা নিজেরা বলতো, তার কোনো সৈন্য-সামন্ত নেই অথবা তার পক্ষে কোনো দল-বলও নেই।[২৮৪]

সিদ্ধান্তকর নিদর্শন

সূরা আশ্ শুয়ারার ১৫৪-১৫৬ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, সামুদের লোকজন হযরত সালেহ (আ)-এর নিকটে এমন এক নিদর্শনের দাবী জানায় যা তাঁর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে। তার জবাবে হযরত সালেহ (আ) এ উটনী পেশ করেন।[১] এর থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোজেযা হিসাবেই উটনীর আবির্ভাব হয়েছিল। আর এ ছিল ঐ ধরনের মোজেযা যা কোনো কোনো নবী অস্বীকারকারীদের দাবী পূরণের জন্যে নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন। উপরন্তু উটনীর অলৌকিকভাবে আত্মপ্রকাশের এটাও প্রমাণ যে, হযরত সালেহ (আ) তাকে পেশ করে কাফেরদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, এ উটনীর জীবনের সাথে তোমাদের জীবন ওতোপ্রোত জড়িত। এ স্বাধীনভাবে তোমাদের ক্ষেত-খামারে চরে বেড়াবে। একদিন সে পানি পান করবে আর পর দিন তোমাদের সকলের পশু পানি পান করবে। তোমরা যদি তার গায়ে হাত দাও, তাহলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। এটা ঠিক যে, এ ধরনের পূর্ণ নিশ্চয়তা ও প্রত্যয়ের সাথে শুধু মাত্র সে জিনিসই পেশ করা যায়, যা মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায় যে, তা একটা অসাধারণ কিছু। তারপর উটনী বেশ কিছুকাল যাবত যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে থাকলো এবং একদিন সে একাই পানি পান করে এবং আর একদিন অন্যান্য পশু। এসব কিছুই তারা নেহায়েৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরদাশ্ত করতে থাকলো। অবশেষে অনেক শলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করে তারা উটনীকে মেরে ফেললো অথচ হযরত সালেহ (আ)-এর নিকটে আর কোনো শক্তি ছিল না, যার জন্যে তারা তাঁকে ভয় করতে পারতো। এ সত্যটির আরও প্রমাণ এই যে, তারা উটনীর জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল এবং তারা জানতো যে তার পেছনে অবশ্যই কোনো শক্তি আছে যার বলে সে তাদের মধ্যে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করতো।[২][২৮৫]

---

১. এ কথাই বলা হয়েছে সূরা আ'রাফের–৭৩ আয়াতে।– গ্রন্থকার।

২. কুরআন কোনো বিশদ ব্যাখ্যা দেয়নি যে উটনী কেমন ছিল এবং কিভাবে তার আবির্ভাব হলো। কোনো সহীহ হাদীসেও এর বিবরণ পাওয়া যায় না। এজন্যে তাফসীরকারগণ যেসব রেওয়াতের ভিত্তিতে উটনীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন তা মেনে নেয়া জরুরী নয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে যে উটনীর আবির্ভাব হয়েছিল তা কুরআন থেকে প্রমাণিত।

উটনীর হত্যা

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ ـ الاعراف : ٧٧

"তারা উটনীকে মেরে ফেললো এবং তাদের রবের আদেশ লংঘন করলো।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৭৭

বেশ কিছু কাল যাবত উটনী গোটা জাতির জন্যে এক সমস্যা হয়ে পড়েছিল। লোকেরা মনে মনে এর উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর শলাপরামর্শ চলতে থাকে অবশেষে এক গোঁয়ার দলপতি জাতিকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সূরা আশ শামসে সে ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে– اذ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا হঠাৎ জাতির সবচেয়ে দুষ্কৃতিকারী এক ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত হলো। সূরা আল ক্বামারে বলা হয়েছে– فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "তারা তাদের সাথীকে অনুরোধ জানালো এবং সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো। তারপর সে উটনীর কু'জ কেটে ফেললো।"[২৮৬]

যদিও এক ব্যক্তি উটনীকে মেরে ফেলেছিল, যেমন সূরা আশ শামস এবং আল ক্বামারে বলা হয়েছে, তথাপি যেহেতু গোটা জাতি তার পেছনে ছিল এবং সে প্রকৃতপক্ষে এ অপরাধে গোটা জাতির মর্জি পূরণ করে, সেজন্যে গোটা জাতিকে অপরাধী করা হয়েছে।[১][২৮৭]

হযরত সালেহ (আ)-এর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্র

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ النمل : ٤٨ ـ ٥١

"ঐ শহরের নয়জন দলপতি ছিল যারা দেশের মধ্যে অরাজকতা ছড়াতো এবং কোনো সংস্কারমূলক কাজই তারা করতো না। তারা পরস্পরে বলাবলি করলো, আল্লাহর কসম করে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা সালেহ এবং তার পরিবারের উপরে রাতে হঠাৎ হামলা করবো। তারপর তার দায়িত্বশীলকে বলবো যে, তার পরিবারের ধ্বংসের সময় আমরা মোটেই সেখানে হাজির ছিলাম না। আমরা একেবারে সত্য কথাই বলছি।

এ অপকৌশল তো তারা চালালো। কিন্তু আমরাও একটা কৌশল অবলম্বন করলাম, যা তারা মোটেই টের পেলো না। এখন দেখে নাও যে, তাদের অপকৌশলের কি পরিণাম হলো। আমরা তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম।"–সূরা আন নমল ঃ ৪৮- ৫১

---

১. জাতির ইচ্ছা অনুযায়ী যে অপরাধ করা হয় অথবা যে অপরাধের জন্যে জাতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তা একটা জাতীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় যদিও অপরাধ সংঘটনকারী কোনো এক ব্যক্তি হয়। বরঞ্চ কুরআন এ কথাও বলে যে, প্রকাশ্য ঘোষণা করে যে অপরাধ করা হয় যেটা জাতি মেনে নেয়, তাও জাতীয় অপরাধ বলে গণ্য।–গ্রন্থকার[২৮৯]

তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে হযরত সালেহ (আ)-এর উপর চড়াও হবার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন।

মনে হয় এ ষড়যন্ত্র তারা উটনীর কুঁজ কেটে দেয়ার পর করেছিল। সূরা হুদে উল্লেখ আছে যে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে এই বলে হুশিয়ার করে দিলেন যে, ঠিক আছে, এখন তিন দিন তোমরা ঘরে বসে খুব মজা করে নাও, তারপর তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসছে فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ তারপর তারা হয়তো মনে করছিল, সালেহের প্রতিশ্রুত আযাব আসুক আর নাই আসুক, আমরা সবাই মিলে উটনীর সাথে তারও দফা-রফা শেষ করে দিই না কেন ?' খুব সম্ভব তারা সে রাতেই আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করেছিল, যে রাতে তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার কথা। তারপর হলো এই যে, হযরত সালেহ (আ)-এর গায়ে হাত দেয়ার আগেই, আল্লাহর কঠিন হাত তাদের উপর এসে পড়লো।[২৯০]

আযাবের বিবরণ

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ط - الشعراء : ١٥٨ "তাদের উপর আযাব এসে পড়লো।"

কুরআনের অন্যত্র এ আযাবের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হলো এই যে, যখন উটনীকে মেরে ফেললো তখন হযরত সালেহ (আ) বললেন–

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ - هود ٦٥

"মাত্র তিনটি দিন নিজেদের ঘরে আরও বসবাস করে লও।"

এ নোটিশের মুদ্দৎ খতম হওয়ার পর শেষ রাতের দিকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো এবং তার সাথে এমন ভূমিকম্প শুরু হলো যে, মুহূর্তের মধ্যে গোটা জাতিকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। পরদিন সকালে দেখা গেল, নিষ্পেষিত মৃতদেহগুলো পড়ে আছে। যেন বেড়ায় লাগানো ঝোঁপ-জাড় পশুদের যাতায়াতে দলিত-মথিত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। না, তাদের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদগুলো, আর না তাদের পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করা গৃহগুলো তাদেরকে রক্ষা করতে পারলো।[২৯১] (সূরা আল ক্বামার আয়াত ৩১, সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৭৮ এবং সূরা আল হিজর আয়াত ৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।–গ্রন্থকার

আহলে ঈমানকে রক্ষা করা হলো

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ط هود :٦٦

"অবশেষে যখন আমাদের ফয়সালার সময় এসে গেলো, তখন আমার রহমত দ্বারা সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলাম এবং সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম।"–সূরা হুদ ঃ ৬৬

সিনাই উপদ্বীপে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তার থেকে জানা যায় যে, যখন সামুদ জাতির উপর আযাব আসে, তখন হযরত সালেহ (আ) হিজরত করে সেখানে চলে যান। হযরত মূসা (আ)-এর পাহাড়ের নিকটেই আর একটি পাহাড় আছে, যাকে সালেহ নবীর পাহাড় বলা হয়। কথিত আছে যে, এখানেই তাঁর বাসস্থান ছিল।[২৯২]

সামুদের তামাদ্দুনিক উন্নতি ও তার ধ্বংসাবশেষ

আদ জাতির যেমন সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা সুউচ্চ স্তম্ভের উপর অট্টালিকা নির্মাণ করতো, তেমনি সামুদ জাতিরও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তারা পাহাড় খোদাই করে তার মধ্যে অট্টালিকা নির্মাণ করতো। এজন্যে প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে তারা ছিল প্রসিদ্ধ। সূরা ফজরে যেমন আদকে 'যাতুল্ ইমাদ' (স্তম্ভের মালিক) উপাধি দেয়া হয়েছে, তেমনি সামুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা উপত্যকায় পাহাড় খোদাই করেছে– اَلَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ - উপরন্তু কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে, তারা প্রস্তর ভূমিতে বড়ো বড়ো প্রাসাদ নির্মাণ করতো– تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا - الاعراف ٧٤ তাদের এ ধরনের প্রাসাদ নির্মাণের কারণ কি ছিল ? কুরআন– فَرِهِيْنَ শব্দের দ্বারা আলোকপাত করেছে। অর্থাৎ এসব কিছু তারা করেছিল গর্ব অহংকার, সম্পদ ও শক্তিমত্তা এবং স্থাপত্য শিল্পের প্রদর্শনীর জন্যে। তাছাড়া সত্যিকার কোনো প্রয়োজন তাদেরকে এ কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেনি। একটা উচ্ছৃংখল সভ্যতার অবস্থা এই হয়ে থাকে। এক দিকে সমাজে যখন বিত্তহীনগণ মাথা গুঁজবার এতটুকু স্থান পায় না এবং অপরদিকে আমীর-ওমরা ও সম্পদশালীগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন তারা প্রদর্শনীমূলক স্মারণিক প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামুদ জাতির এসব প্রাসাদের মধ্যে এখনও কিছু বিদ্যমান আছে। সেগুলো আমি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের কিছু চিত্র এতদসহ দেয়া হলো। এ স্থানটি মদীনা এবং তবুকের মাঝখানে হেজাজের প্রসিদ্ধ স্থান 'আল উলার' কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। নবী (সা)-এর যমানায় তাকে 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো। আজও সে স্থানের অধিবাসীগণ তাকে 'আল হিজর' এবং 'মাদায়েনে সালেহ' নামে স্মরণ করে।

এ অঞ্চলে 'আল উলা' এখনো একটা শস্যশ্যামল উপত্যকা। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ঝর্ণা ও বাগ-বাগিচা দেখা যায়। কিন্তু আল হিজরের আশেপাশে ভয়ানক অশুভসূচক পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। লোক সংখ্যা নামমাত্র। উর্বরতার অভাব। সেখানে কয়েকটি কূপ আছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এর একটি কূপ সম্পর্কে এ কিংবদন্তী চলে আসছে যে, হযরত সালেহ (আ)-এর উটনী এ কূপ থেকে পানি পান করতো। তুর্কী যুগের একটা জীর্ণ সামরিক ক্যাম্পের মধ্যে বর্তমানে সে কূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা একেবারে শুষ্ক। তার ছবিও দেয়া হলো।

এ এলাকায় যখন আমরা প্রবেশ করলাম, তখন আল উলার নিকট পৌঁছতেই এমন পাহাড় নজরে পড়লো যা একেবারে জ্বলে পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে আছে। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যে, কোনো ভয়ংকর ভূমিকম্পে তার নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ওলট-পালট করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখে গেছে। এসব পাহাড়ের চিত্রও দেয়া হলো। এ ধরনের পাহাড় পূর্ব দিকে আল উলা থেকে খায়বার যাবার পথে প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্দানের ভেতরে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল। তার অর্থ এই যে, দৈর্ঘে তিন-চারশ মাইল এবং প্রস্থে একশ' মাইল একটি এলাকা ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। আল হিজর সামুদদের যেসব দালানকোঠা আমরা দেখলাম, এ ধরনের কিছু

আল আলা পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ) পাহাড়
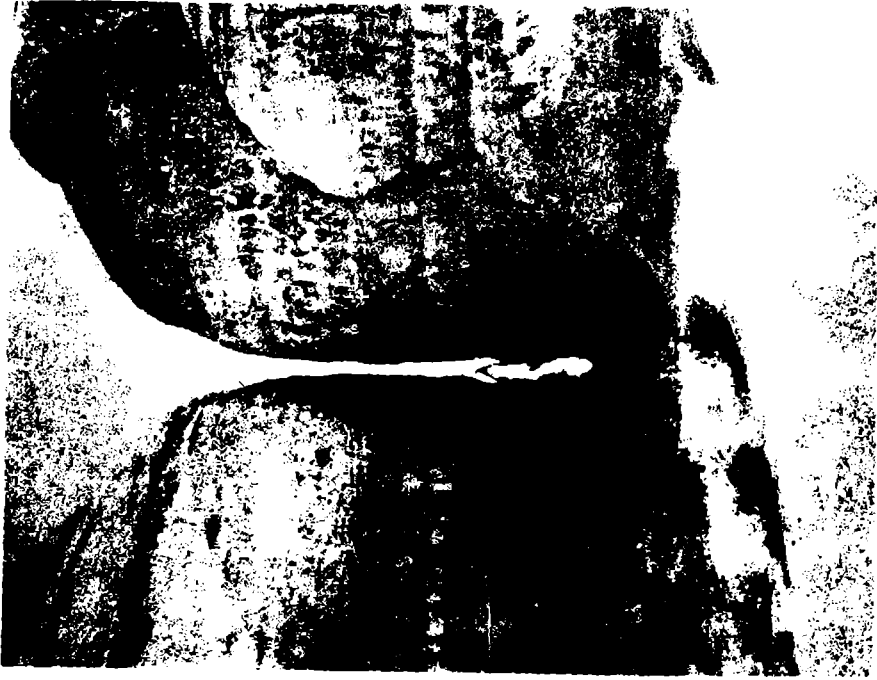
মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক সামূদীয় অট্টালিকা
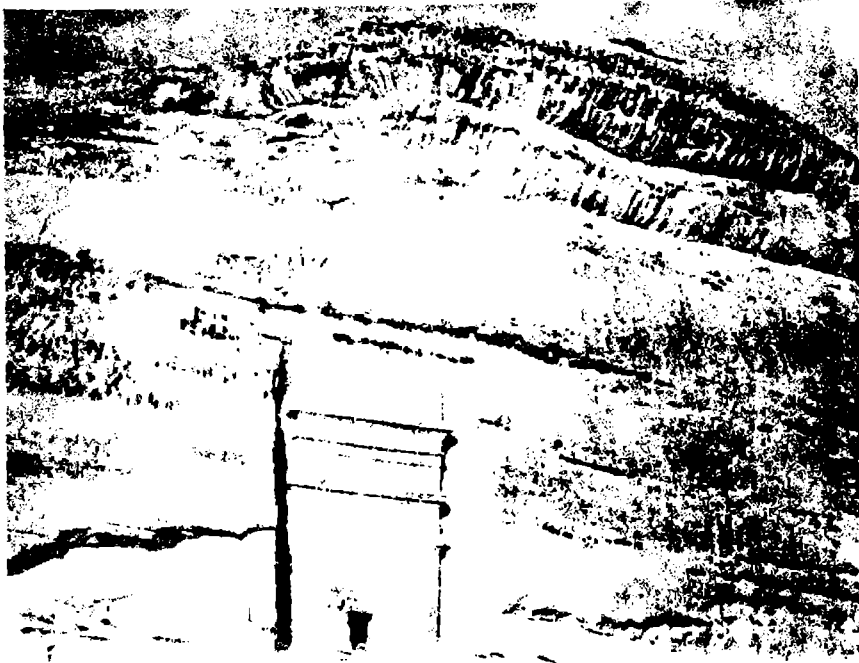
মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক অট্টালিকা

মাদয়ানে সামূদীয় পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
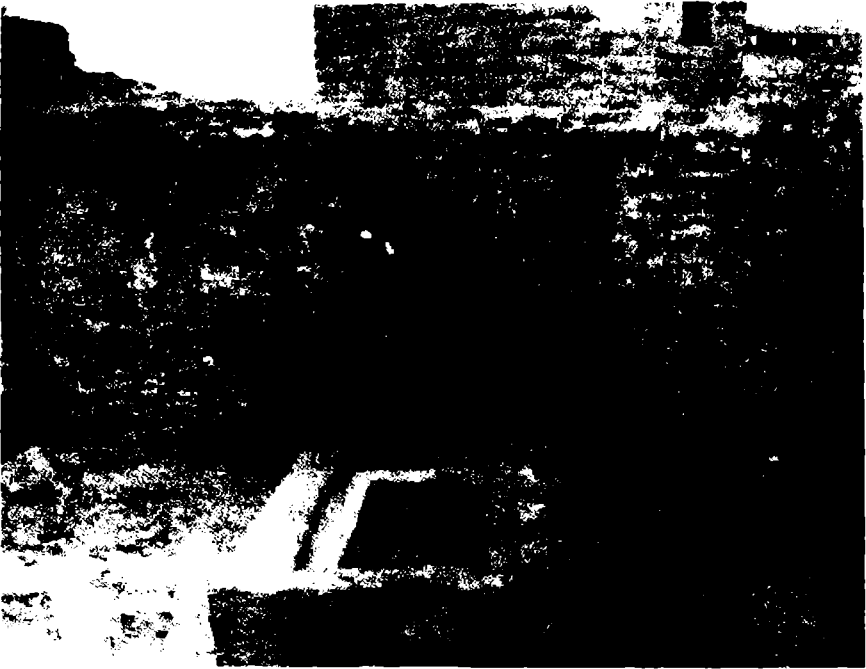
মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী যে কূপে পানি পান করত

মাদায়ানে সালেহ (আ)-এর সামূদীয় অট্টালিকা

পেট্রায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
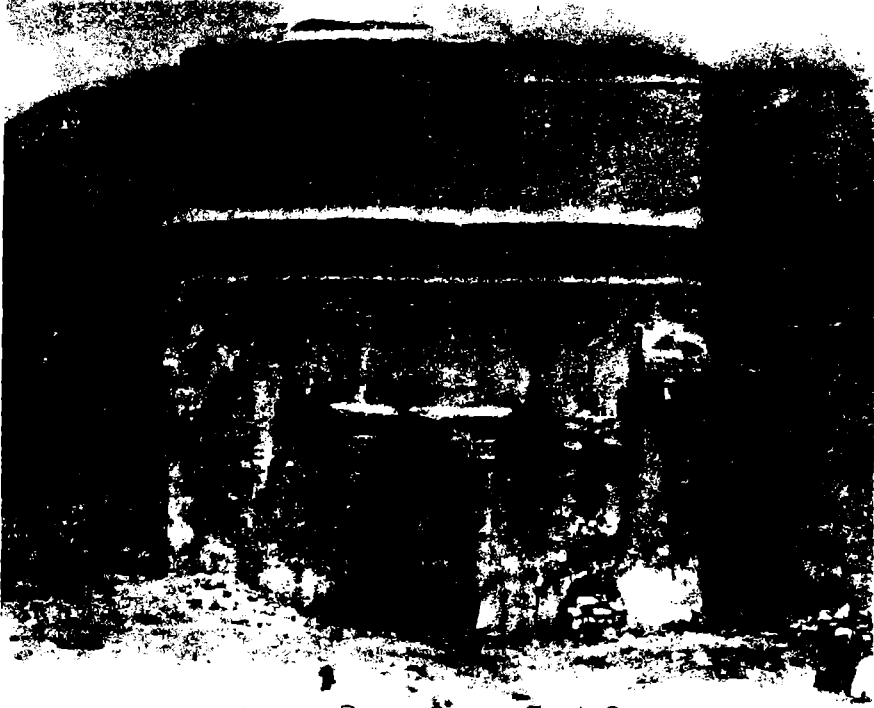
পেট্রায় সামূদীয় পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
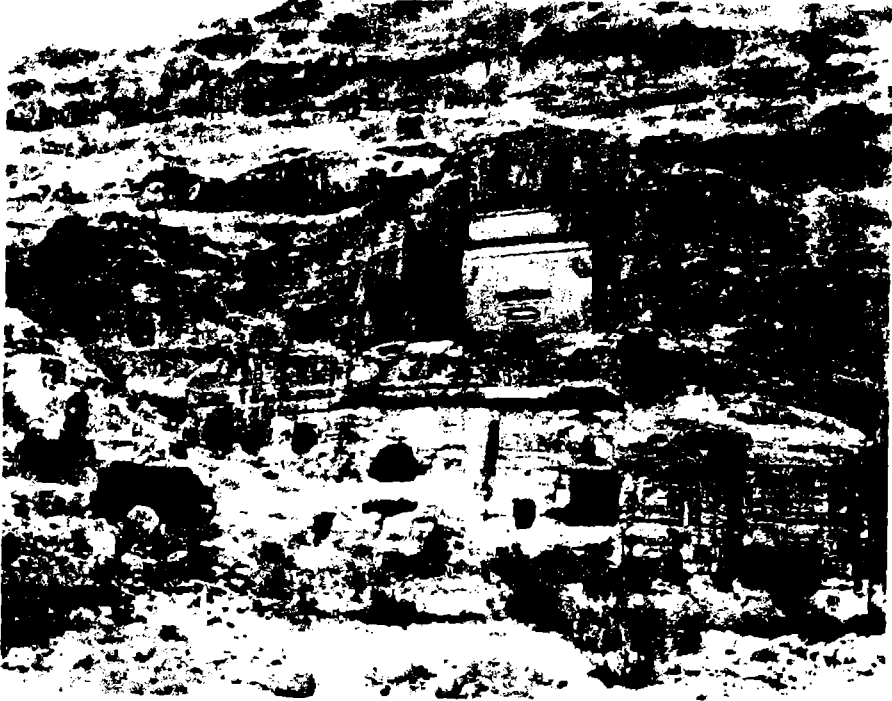
পেট্রায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

দালানকোঠা আমরা আকাবা উপসাগরের তীরে মাদ্‌য়ানে এবং জর্দান রাজ্যের পেট্রা নামক স্থানেও দেখলাম। বিশেষ করে পেট্রাতে (Petra) সামুদদের দালানকোঠা এবং নাবতিদের তৈরী দালানকোঠা পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে। তাদের কারুকার্য ও গঠন পদ্ধতির মধ্যে এতোটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, যে কেউ এক নজরে বুঝতে পারে যে, এসব এক যুগেরও নয় এবং এক জাতের নয়।

ইংরেজ প্রাচ্যবিদ Daughty কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে আল হিজরের দালানকোঠা সম্পর্কে এ দাবী করেন যে, এসব সামুদদের নয় নাবতিদের তৈরী। কিন্তু উভয় ধরনের দালান-কোঠার মধ্যে পার্থক্য এতো সুস্পষ্ট যে, একজন অন্ধই সেগুলোকে একই জাতির দালানকোঠা মনে করতে পারে। আমার ধারণা এই যে, পাহাড় খোদাই করে দালানকোঠা তৈরীর শিল্পনৈপুণ্য সামুদ জাতি থেকেই শুরু হয়। তার কয়েক হাজার বছর পরে নাবতিগণ খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীতে এ স্থাপত্য শিল্পকে উন্নীত করে। তারপর ইলোরাতে এ স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। অবশ্যি ইলোরার গুহা পেট্রার প্রায় সাতশ’ বছর পরের।[২৯৩]

ইবরাহীম (আ)-এর জাতি

হযরত নূহ (আ)-এর পর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম নবী, যাঁকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রথমে স্বয়ং ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং শাম ও ফিলিস্তিন থেকে আরব মরুর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরাফেরা করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও বন্দেগীর অর্থাৎ ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান। অতঃপর নিজের মিশনের প্রচারকল্পে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্দানে আপন ভাইপো হযরত লূত (আ)-কে এবং শাম ও ফিলিস্তিনে আপন পুত্র হযরত ইসহাক (আ)-কে এবং আরবের অভ্যন্তরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে নিযুক্ত করেন। তারপর আল্লাহ তাআলার আদেশে মক্কায় এমন এক ঘর তৈরী করেন, যার নাম কা'বা। এ ঘরকেই তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর মিশনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গণ্য করেন।[২৯৪]

ইবরাহীম (আ)-এর জন্মস্থান

হযরত ইবরাহীম (আ) যে শহরে জন্মগ্রহণ করেন তা শুধু আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলেই জানতে পারা যায়নি, বরঞ্চ তাঁর যুগে সে অঞ্চলের মানুষের যে অবস্থা ছিল তার উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। স্যার লিওনার্ড উলী (Sir Leonard Woolley) তাঁর "Abraham", London, 1935 নামক গ্রন্থে গবেষণার যে ফল প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

'উর' শহর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও তামাদ্দুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আনুমানিক ২১০০ খৃস্টপূর্ব কালে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অভ্যুদয় হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ আজকাল সাধারণভাবে স্বীকার করেন। সে সময়ে 'উর' শহরের লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের কাছাকাছি ছিল। হয়তো বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে। শহরটি একটি বিরাট ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র ছিল। একদিকে পামীর এবং নীল গিরি থেকে সেখানে পণ্যদ্রব্যাদি যেতো এবং অন্যদিকে এনাতোলিয়ার সাথেও তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। যে রাজ্যের এ রাজধানী ছিল, তার সীমানা বর্তমান ইরাক থেকে উত্তর দিকে কিছুটা কম এবং পশ্চিমে কিছু বেশী ছিল। দেশের অধিকাংশ লোকেরই পেশা ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে সে যুগের যেসব শিলালিপি হস্তগত হয়েছে, তা থেকে জানতে পারা যায় যে, জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিকোণ ছিল নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। সম্পদ অর্জন করা এবং বহুল পরিমাণে ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য। সুদের বাজার অত্যন্ত গরম ছিল। মানুষ ছিল বেনিয়া মনোভাবাপন্ন। তারা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং পরস্পরের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা চলতো খুব বেশী। তাদের দেব-দেবীর কাছে তাদের দোয়া বেশীর ভাগ হতো দীর্ঘায়ু, সচ্ছলতা ও ব্যবসার উন্নতির জন্যে। অধিবাসী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

একঃ আমীলু। এরা ছিল উচ্চশ্রেণীর লোক। পূজারী, সাধারণ বেসামরিক কর্মচারী এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দুই ঃ মিশ্‌কিনু। এরা ছিল ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কৃষিজীবী।

তিন ঃ আরদু অর্থাৎ ক্রীতদাস।

এ তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী অধিকার অন্যান্যদের থেকে পৃথক ছিল। তাদের জান-মালের মূল্যও অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি ছিল।
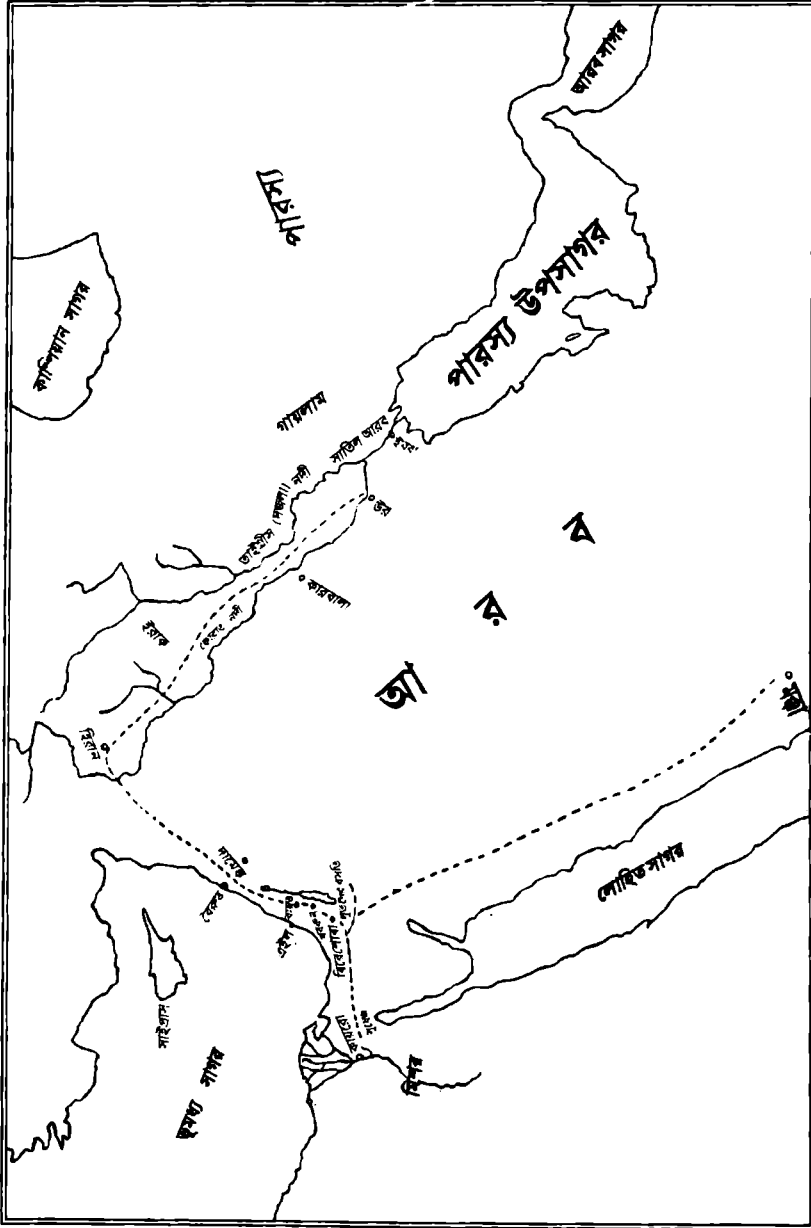
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের পথ

এ ছিল সে শহর ও সমাজ যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) চোখ খুলেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের যে অবস্থা আমরা তালমুদে দেখতে পাই, তাতে তিনি আমীলু শ্রেণীর একব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নমরুদের নিকট তিনি রাজ্যের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। (Chief officer of the state) ছিলেন।

দেব-দেবী, দেব মন্দির ও পূজাপার্বণ

'উরের' শিলালিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার দেব-দেবীর নাম পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন আরাধ্য দেবতা ছিল। প্রত্যেক শহরের একজন রক্ষক থাকতো। তাকে 'রাব্বুল বালাদ' বা শহরের রব বলা হতো। তাকে মহাদেব বা 'রাইসুল আলেহা' মনে করা হতো এবং তাকে সকল দেব-দেবী থেকে অধিক শ্রদ্ধা করা হতো। 'উর' শহরের 'রাব্বুল বালাদ' ছিল 'নান্নার' (চন্দ্রদেবতা)। তার নামানুসারে পরবর্তীকালের লোকেরা এ শহরের নাম 'কামরিনা' বলেছে। দ্বিতীয় বৃহৎ শহর ছিল 'লারসা' যা পরবর্তীকালে উরের পরিবর্তে রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। তার 'রাব্বুল বালাদ' ছিল 'শাম্মাস' (সূর্যদেব)। এসব বড়ো দেব-দেবীর অধীনে অনেক ছোটো ছেটো খোদা বা দেব-দেবীও ছিল। তাদের অধিকাংশ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পৃথিবী থেকে নির্বাচন করা হতো। মানুষের ছোটো-খাটো প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল এদের সাথে। পুতুলের আকারে তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়েছিল এবং তাদের সামনে সব রকমের পূজাপার্বণ করা হতো। 'নান্নারের' প্রতিমূর্তি উর শহরের সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপরে একটি সুরম্য অট্টালিকায় স্থাপিত ছিল। তার নিকটে নান্নারের স্ত্রী 'নান্গুলের' মন্দির ছিল। নান্নারের মন্দির ছিল রাজপ্রাসাদের মতো। তার শয়নকক্ষে প্রতি রাতে একজন পূজারিণী তার বধু সাজতো। মন্দিরে বহু স্ত্রীলোক দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। তাদেরকে দেবদাসী (Religious Prostitutes —ধর্মীয় বেশ্যা) বলা হতো। সেসব নারীদেরকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হতো যারা তাদের 'খোদা' বা দেবতার নামে তাদের কুমারীত্ব উৎসর্গ করতো। সম্ভবত একবার দেবতার পথে নিজেকে কোনো অপরিচিত পুরুষের দেহ-সংগিনী করে দেয়াকে মুক্তির পথ মনে করা হতো। এ ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তি থেকে আনন্দ সম্ভোগ যে অধিকাংশ পূজারীই করতো তা না বললেও চলে।

নান্নার দেবতার মর্যাদা

'নান্নার' শুধুমাত্র দেবতাই ছিল না। বরঞ্চ দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জমিদার, বিরাট ব্যবসায়ী, বড়ো শিল্পপতি এবং দেশের রাজনৈতিক অংগনের বিরাট শাসক ছিল। বহু সংখ্যক বাগ-বাগিচা, জমি ও ঘর-বাড়ী এ মন্দিরের নামে ওয়াক্‌ফ করা হতো। এসবের আয় ছাড়াও কৃষক, জমিদার ও ব্যবসায়ী তাদের সকল প্রকার শস্য, দুধ, সোনাদানা, কাপড় প্রভৃতি মন্দিরে নজর স্বরূপ পাঠাতো। মন্দিরের পক্ষ থেকেই বিরাট আকারে ব্যবসা করা হতো। এসব কাজ-কর্ম দেবতার নৈকট্য লাভের জন্যে পূজারীগণই সমাধা করতো। আবার দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় এ মন্দিরেই ছিল। বিচারক ছিল পূজারীগণ এবং তাদের রায় খোদারই রায় মনে করা হতো। স্বয়ং রাজ পরিবারের শাসন কর্তৃত্বের উৎসও ছিল এ নান্নার দেবতা। প্রকৃত বাদশাহ ছিল নান্নার এবং দেশের শাসক তার পক্ষ থেকেই দেশ শাসন করতো। এ সূত্র অনুযায়ী দেশের বাদশাহ স্বয়ং আরাধ্য দেবতাদের মধ্যে গণ্য হতো এবং দেবতাদের মতো তাদেরও পূজা করা হতো।

নমরুদ রাজ্যের সূচনা, উন্নতি ও অবসান

উরের যে শাহী খান্দান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যমানায় শাসক ছিল, তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল 'উরনামু'। সে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের দু' হাজার তিনশ' বছর আগে এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করে। পূর্বে সূসা এবং পশ্চিমে লেবানন পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। তার থেকে এ পরিবার 'নামু' নাম গ্রহণ করে—যা আরবী ভাষায় নমরুদ হয়ে পড়ে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেশ থেকে হিজরত করার পর এ পরিবারের উপর উপর্যপরি ধ্বংসলীলা শুরু হয়। প্রথমে আয়লামীনগণ উর শহর ধ্বংস করে এবং নমরুদকে তার দেবতা নান্নারসহ ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর লারসায় একটা আয়লামী শাসন কায়েম হয় যার অধীনে 'উর' অঞ্চলের অধিবাসীরা গোলামে পরিণত হয়। অতপর আরব বংশোদ্ভূত একটি পরিবার বেবিলনে শক্তিশালী হয় এবং লারসা ও উর উভয়কে অধীনস্ত করে ফেলে। নান্নারের প্রতি উরবাসী যে বিশ্বাস পোষণ করতো, এসব ধ্বংসলীলার পর তা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। কারণ 'নান্নার' তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

পরবর্তী যুগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষার প্রভাব

পরবর্তী যুগে সে দেশের লোকের উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষার প্রভাব কতটা পড়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টপূর্বে বেবিলনের বাদশাহ হামুরাবী (বাইবেলের আমুরাফিল) যে আইন রচনা করেছিলেন তাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নবীগণের অলোকবর্তিকা থেকে গৃহীত আলোকেরই সাহায্য নেয়া হয়েছিল। এসব আইনের বিস্তারিত শিল্যলিপি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকের হস্তগত হয়। তিনি তাঁর ইংরাজী অনুবাদ C. H. W. John, The oldest Code of Law নামে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এসব আইনের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে।

পরিপূর্ণ মুশরিকী তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা

এ যাবত যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়েছে তা যদি সঠিক হয়, তাহলে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতি যে শিরকে লিপ্ত ছিল তা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পৌত্তলিক পূজা-পার্বণের সমষ্টিই ছিল না। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে সে জাতির গোটা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা ঐ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে চলতো। তার মুকাবেলায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার প্রভাব শুধু প্রতিমা পূজার উপরেই পড়েনি, বরঞ্চ শাহী খান্দানের খোদা হওয়ার দাবী, তাদের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব, পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সমগ্র দেশের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার উপর তা এক চরম আঘাত হেনেছিল। তাঁর দাওয়াত বহন করার অর্থ এই ছিল যে, নীচ থেকে উপর পর্যন্ত গোটা সমাজ-প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। তারপর তাকে আবার নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওয়াজ ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বসাধারণ, নমরূদ ও পূজারীগণ সকলে একত্রে সে আওয়াজ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো।[২৯৫]

নমরূদের মুশরিকী ব্যবস্থার পর্যালোচনা

অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুশরিক সমাজের এ একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে রাব্বুল আরবাব অর্থাৎ সকল রবের রব এবং সকল খোদার খোদা বলে তো মানে কিন্তু শুধু একাকী সেই রবকে এবং সেই খোদাকে মা'বুদ বলে স্বীকার করে না।

মুশরিকগণ সর্বদা খোদার খোদায়িকে দু' ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। এক–অতি প্রাকৃতিক খোদায়ি যা কার্যকরণ পরম্পরার উপর কর্তৃত্বশীল এবং যার দিকে মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ-আপদ দূর করার জন্যে ধাবিত হয়। এ খোদায়ির মধ্যে তারা (মুশরিকগণ) আল্লাহ তাআলার সাথে আত্মা, ফেরেশতা, জ্বিন এবং অন্যান্য বহু সত্তাকে অংশীদার বানায়। তাদের কাছে দোয়া করে, তাদের সামনে পূজার অনুষ্ঠান করে, তাদের আস্তানায় নজর-নিয়ায পেশ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খোদায়ি বা কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব, যা জীবন-যাপনের জন্যে আইন-কানুন রচনার এবং আনুগত্য লাভের অধিকারী। দুনিয়ার সকল মুশরিক এ দ্বিতীয় ধরনের খোদায়িকে প্রায় প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ তাআলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অথবা তাঁর সাথে রাজপরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত ও সমাজের পূর্বাপর বড়দের মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছে। অধিকাংশ শাহী খান্দান এ দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ির দাবীদার হয়ে পড়েছে। তাদের খোদায়িকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা প্রথম অর্থসূচক খোদার সন্তান হওয়ার দাবী করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় শ্রেণী তাদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

নমরূদের খোদায়ির দাবীও দ্বিতীয় প্রকারের ছিল। সে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তার দাবী এ ছিল না যে, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা এবং সৃষ্টি জগতের পরিচালক সে নিজে। বরঞ্চ তার দাবী এই ছিল যে, এ ইরাক দেশের এবং তার অধিবাসীদের সে নিরংকুশ শাসনকর্তা। তার কথাই আইন, তার উপরে এমন কোনো উর্ধতন শক্তি ও সত্তা নেই যার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ দিক দিয়ে ইরাকের যে অধিবাসী তাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে না, এবং সে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু বলে মেনে নেবে সে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তাওহীদি দাওয়াতের আঘাত

যখন হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি এক রাব্বুল আলামীনকেই খোদা, মাবুদ ও রব মানি এবং তিনি ছাড়া আর সকল কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব একেবারেই অস্বীকার করি। তখন প্রশ্ন শুধু এটাই ছিল না যে, জাতীয় ধর্ম এবং ধর্মীয় দেব-দেবী সম্পর্কে তাঁর এ নতুন আকীদাহ বিশ্বাস কতদূর গ্রহণযোগ্য বরঞ্চ তার সাথে সাথে এ প্রশ্নও উঠলো যে, জাতীয় রাষ্ট্র এবং তার কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার উপরে এ আকীদা বিশ্বাস যে আঘাত হানছে, তা কি করে উপেক্ষা করা যায়। এ কারণেই বিদ্রোহের অভিযোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদের সামনে পেশ করা হলো।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অকাট্য যুক্তি

নমরূদকে যখন হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন যে, যে সত্তার হাতে জীবন ও মৃত্যু রয়েছে তিনিই তাঁর প্রভু। তখন নমরূদ বললেন, জীবন এবং মৃত্যু আমার হাতে।

ইবরাহীম (আ) বললেন—বেশ, আল্লাহ্ তো পূর্ব দিক দিয়ে সূর্য উদিত করেন, তুমি একবার পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও দেখি। এ কথা শুনে সত্য অস্বীকারকারী হতবাক হয়ে রইলো।

যদিও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম কথায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ রব বা প্রভু হতে পারে না, তথাপি নমরূদ ধৃষ্টতার সাথে তার জবাব দিয়ে ফেললো। দ্বিতীয় কথার পর অতিরিক্ত ধৃষ্টতার সাথে জবাব দেয়া তার জন্যে কঠিন ছিল। কারণ সে নিজেও জানতো যে, সূর্য এবং চন্দ্র সেই আল্লাহরই হুকুমের অধীন যাঁকে ইবরাহীম (আ) রব বলে মেনে নিয়েছেন। এখন এর জবাবে কিছু বলতে হলে সে কি বলবে ? কিন্তু এভাবে যে সত্য তার কাছে পরিস্ফুট হচ্ছিল তা স্বীকার করার অর্থ এই যে, নিজের নিরংকুশ প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব পরিহার করতে হয়, যার জন্যে তার মনের তাগুত প্রস্তুত ছিল না। অতএব সে শুধু হতবাক হয়েই রয়ে গেল। আত্মপূজার আঁধার থেকে বের হয়ে সে সত্যের আলোকে এলো না। যদি ঐ তাগুতের পরিবর্তে সে আল্লাহকে তার অলী ও মদদগার বলে মেনে নিতো তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ তবলিগের পর তার কাছে সত্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ড এবং খলীলের ফুলবাগিচা

তালমূদে উল্লেখ আছে যে, তারপর বাদশাহের হুকুমে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করা হয়, দশদিন তিনি জেলখানায় অতিবাহিত করেন। বাদশাহের পারিষদ তাঁকে জীবিত জ্বালিয়ে মারার সিদ্ধান্ত করে।২৯৬

কুরআনের দৃষ্টিতেও তারা তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। অগ্নিকুণ্ড তৈরী হওয়ার পর তারা তার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নিক্ষেপ করে।[১] তখন আল্লাহ্ তাআলা আগুনকে আদেশ করেন, ইবরাহীমের জন্যে শীতল এবং অক্ষতিকারক হয়ে যাও।[২]২৯৭

ইবরাহীম (আ)-এর জাতি দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যে, কোথাও তার কোনো নামনিশানা নেই। তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার সৌভাগ্য কারো হয়ে থাকলে, তা হয়েছে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর সৌভাগ্যবান পুত্রদ্বয়ের [হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)-এর] বংশধরদের।[৩] হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেশ ত্যাগের পর তাঁর জাতির উপর যে আযাব এসেছিল, তা যদিও কুরআনে বর্ণিত নেই, কিন্তু তাদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত জাতিগুলোর মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে।২৯৯

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে কুরআনের নিম্নস্থানগুলো দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৬৮-৭০, সূরা আনকাবূত ঃ ২৪, আস-সাফফাত ঃ ৯৭-৯৮।—সংকলকদ্বয়

২. এটাও সুস্পষ্টরূপে ঐসব মুজিযার মধ্যে একটি যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ এ সব মুজিযার এ জন্যে ব্যাখ্যা করে যে, তার মতে বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থাপনার কর্মধারা (Routine) পরিহার করে কোনো অসাধারণ কাজ করা আল্লাহর জন্যেও সম্ভব নয়, তাহলে সে আল্লাহকে মানার কষ্ট পরিহার করে কেন ? আর যদি সে এ ধরনের ব্যাখ্যা এ জন্যে করে যে, বর্তমান যুগের তথাকথিত যুক্তিবাদীগণ এ ধরনের কথা মানতে প্রস্তুত নয়, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, হে আল্লাহর বান্দাহ! তোমার উপর এ বোঝা কে চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাকে কোনো না কোনো প্রকারে এ কথা স্বীকার করতেই হবে ? কুরআন যেমন, ঠিক অবিকল তাকে মানতে যে প্রস্তুত নয়, তাকে তার অবস্থার উপরেই ছেড়ে দাও। তাকে স্বীকার করাবার জন্যে কুরআনকে তার মর্জি মুতাবেক রূপ দান করা কোন্ ধরনের ইসলাম প্রচার এবং কোন্ ধরনের বিবেকবান ব্যক্তিইবা তা ন্যায়সঙ্গত মনে করবে ?২৯৮

৩. আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সম্বোধন করে এ ঘোষণা করেন– انى جَاعِلُكَ لِلنَّاس امَامًا - البقرة : ١٢٤। –অর্থাৎ আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্বের পদে বরিত করছি। আজকাল দুনিয়াতে অহীভিত্তিক সকল ধর্মের অনুসারীগণ (মুসলিম, ইহুদী, নাসারা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে একইভাবে সংশ্লিষ্ট।–সংকলকবৃন্দ

বেবিলনের যেসব শাসক এবং পণ্ডিত পুরোহিত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল এবং যেসব মুশরিক অধিবাসী ঐসব যালিমের আনুগত্য করেছিল তারা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা কোথাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তারা আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে জ্বালিয়ে ভস্ম করতে চেয়েছিল এবং যাঁকে অবশেষে রিক্তহস্তে জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁকে আল্লাহ তাআলা এ অনুগ্রহ দান করেন যে, চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ায় তাঁর নাম সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলিম, ইহুদী ও ঈসায়ী রাব্বুল আলামীনের এ প্রিয় ব্যক্তিকে সর্বসম্মতভাবে ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করে। বিগত চল্লিশ শতকে দুনিয়ায় যতটুকু হেদায়াতের আলোকই এসেছে, ঐ এক ব্যক্তি এবং তাঁর পূতপবিত্র সন্তানদের বদৌলতেই এসেছে। আখেরাতে তাঁরা যে বিরাট প্রতিদান লাভ করবেন, তাতো করবেনই। কিন্তু এ দুনিয়ার বুকেও তাঁরা এমন সম্মান লাভ করেছেন, দুনিয়া হাসিল করার জন্যে ভ্রান্তিকর সংগ্রামকারীদের মধ্যে সে সম্মান লাভের সৌভাগ্য কারো হয়নি।৩০০

তালমূদের বয়ান

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোনো উল্লেখ বাইবেলে নেই। এমনকি তাঁর ইরাকী জীবনের কোনো ঘটনাও এ কিতাবে স্থান পায়নি। নমরূদের সাথে তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাত, পিতা ও জাতির সাথে তাঁর সংঘাত-সংঘর্ষ, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর চেষ্টা-চরিত্র, আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনা অবশেষে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ই ওল্ড টেস্টামেন্টের আদি পুস্তক প্রণেতার দৃষ্টিতে অনুল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি শুধু তাঁর হিজরতের উল্লেখ করেন। তা আবার এমনভাবে যেন একটি পরিবার জীবিকার সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে বসতিস্থাপন করছে। কুরআন এবং বাইবেলের মধ্যে এর চেয়ে বিরাট মতভেদ এই যে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মুশরিক পিতা তাঁর উপর যুলুম করার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিল। আর বাইবেল বলে যে, তাঁর পিতা স্বয়ং তার পুত্র-পৌত্র এবং পুত্র বধুদেরকে নিয়ে হারানে বসতিস্থাপন করে, ওল্ড টেস্টামেন্ট, আদিপুস্তক, অধ্যায় ১১ ঃ স্তোত্র ২৭-৩২। তারপর হঠাৎ খোদা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলছেন, তুমি হারান ছেড়ে কেনয়ানে গিয়ে বসবাস কর "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমরা নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব ; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (ঐ আদি পুস্তক, অধ্যায় ১২ ঃ স্তোত্র ২-৩)। বুঝতে পারা যায় না হঠাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর এ অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়লো কেন ?

তালমূদে অবশ্যি ইবরাহীম চরিতের ইরাকী যুগের ঐসব অধিকাংশ বিবরণ পাওয়া যায়, যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তুলনা করলে, কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশে শুধু পার্থক্যই দেখা যায় না, বরঞ্চ একজন ভালোভাবে অনুভব করতে পারে যে, তালমূদের বিবরণ অধিকাংশই অসংগত এবং অচিন্তনীয় কথার দ্বারা পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর

সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তার মধ্যে কোনো আজেবাজে কথা নেই। অবগতির জন্যে এখানে আমরা তালমুদে বর্ণিত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার উদ্ধৃত করছি। তাতে করে ঐসব লোকের ভ্রম সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যারা কুরআনকে বাইবেল এবং ইহুদী সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল মনে করে।

তালমুদ বলে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মের সময় জ্যোতিষীগণ আসমানে কিছু নিদর্শন দেখে নমরূদকে পরামর্শ দেয় যে, তারেহের ঘরে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাকে হত্যা করা হোক। নমরূদ তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হলো। কিন্তু তারেহ্ তার দাসের একটা শিশুকে তার আপন শিশুর পরিবর্তে পেশ করলো এবং এভাবে আপন শিশু রক্ষা করলো। তারপর তারেহ তার বিবি এবং শিশুপুত্রকে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। সেখানে তারা দশ বছর অতিবাহিত করে। একাদশ বছরে তারেহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হযরত নূহ (আ)-এর নিকটে পাঠিয়ে দিল। হযরত ইবরাহীম (আ) উনচল্লিশ বছর ধরে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পুত্র সামের অধীনে প্রশিক্ষণরত থাকেন। সে সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর আপন ভাতিজি সারাকে বিবাহ করেন—যে বয়সে তাঁর চেয়ে বিয়াল্লিশ বছরের ছোটো ছিল। সারা যে ইবরাহীম (আ)-এর ভাতিজি ছিল এ কথা বাইবেলে নেই। বাইবেল অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দশ বছর।-ওল্ড টেস্টামেন্ট, আদি পুস্তক, অধ্যায় ১১ ঃ স্তোত্র ২৯ এবং অধ্যায় ১৭ ঃ স্তোত্র ১৭।

অতপর তালমুদ বলে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পঞ্চাশ বছর বয়সে হযরত নূহ (আ)-এর গৃহত্যাগ করে পিতার নিকটে আসেন। তিনি দেখলেন যে, পিতা একজন পৌত্তলিক এবং তার ঘরে বছরে বারো মাসের হিসাবে বারোটি প্রতিমা রয়েছে। তিনি তাঁর পিতাকে বুঝাবার অনেক চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হলেন তখন একদিন সুযোগ বুঝে তাঁর পারিবারিক মন্দিরের সকল প্রতিমা ভেঙে ফেলেন। তারেহ তার দেব-দেবীর এ দুরবস্থা দেখে সোজা নমরূদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বললো, পঞ্চাশ বছর আগে আমার ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে আমার বাড়ীতে এ কাণ্ড করেছে। এখন আপনি বিচার করুন।

নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি কঠোর ভাষায় জবাব দেন। নমরূদ তৎক্ষণাৎ তাঁকে জেলে পাঠিয়ে বিষয়টি তার পরিষদের সামনে পেশ করে। পরিষদ আলোচনার পর তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। তদনুযায়ী এক বিরাট বহ্ন্যুৎসবের (Bonjire) ব্যবস্থা করা হয় এবং তার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর ভাই এবং শ্বশুর হারানকেও আগুনে ফেলা হয়। কারণ নমরূদ যখন তারেহকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ঐ শিশুপুত্রকে তো জন্মের দিনই হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তার পরিবর্তে অন্য শিশুকে হত্যার জন্যে কেন পেশ করেছো ?

তদুত্তরে তারেহ বলে, হারানের কথায় আমি এ কাজ করেছিলাম। এ কথার পর এ কাজ স্বয়ং যে ব্যক্তি করেছিল তাকে তো ছেড়ে দেয়া হলো, কিন্তু পরামর্শদাতাকে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে আগুনে ফেলে দেয়া হলো। আগুনে পড়া মাত্রই হারান জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু লোক দেখলো ইবরাহীম (আ) নিশ্চিন্ত মনে পায়চারি করছেন। নমরূদকে তা জানানো হলো। অতপর নমরূদ এসে যখন এ অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখতে পেলো,

তখন চিৎকার করে বললো, আসমানী খোদার বান্দাহ ! আগুন থেকে বেরিয়ে এসো। তারপর আমার সামনে দাঁড়াও। হযরত ইবরাহীম (আ) আগুন থেকে বেরিয়ে এলেন। নমরূদ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে বিদায় করলো।

তারপর, তালমূদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ) দু বছর সেখানে অবস্থান করলেন। এ দিকে নমরূদ এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলো। জ্যোতিষীগণ তার ব্যাখ্যা করে বল-লো যে, ইবরাহীম (আ) এ রাজ্যের অধঃপতনের কারণ হবেন। অতএব তাঁকে হত্যা করা হোক। তাঁকে হত্যা করার জন্যে লোক পাঠানো হলো। কিন্তু স্বয়ং নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে গোলাম উপঢৌকন দিয়েছিল, সেই গোলাম আলইয়াযর সময়ের পূর্বেই হত্যার পরিকল্পনা ফাস করে দিল। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ) পালিয়ে হযরত নূহ (আ)-এর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তারেহ্ গোপনে তাঁর সাথে দেখা করতে থাকে। তারপর পিতা-পুত্র মিলে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, দেশত্যাগ করাই উচিত। হযরত নূহ (আ) এবং সাম এ প্রস্তাব পসন্দ করেন। অতপর তারেহ্ তার পুত্র ইবরাহীম (আ), পৌত্র লূত (আ) এবং পুত্রবধু সারাকে নিয়ে 'উর' থেকে হারান চলে যায়।-তালমূদ থেকে নির্বাচিত এইচ পুলানেভ লণ্ডন পৃঃ ৩০-৪২)।[৩০১]

লূত জাতি

বাইবেলের মতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই ভাই ছিল নাহুর এবং হারান। হযরত লূত (আ) ছিলেন হারানের পুত্র (ওল্ডটেস্টামেন্ট আদি পুস্তক, অধ্যায় ১১ ঃ স্তোত্র ২৬)। সূরা আনকাবূতের ২৬ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে উল্লেখ আছে, তার থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, তাঁর জাতির মধ্যে একমাত্র লূত (আ) তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন।৩০২

হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাইপো ছিলেন। তিনি তাঁর চাচার সাথে ইরাক থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং কিছুকাল যাবত শাম, ফিলিস্তিন ও মিসরে ভ্রমণ করে দাওয়াত ও তাবলীগের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকনে। তারপর স্থায়ীভাবে নবুওয়াতের পদে বরিত হওয়ার পর পথভ্রষ্ট জাতির সংস্কার সংশোধনের কাজে আদিষ্ট হন। এ জাতি লূত জাতি নামে অভিহিত হয়। সাদুমবাসীদেরকে তাঁর জাতি এ জন্যে বলা হয় যে, সম্ভবত তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ঐ জাতির সাথে ছিল।

লূত জাতির অঞ্চল

এ জাতি ঐ অঞ্চলে বাস করত—যাকে বর্তমানে ট্রান্‌স্‌ জর্দান বলে। এটি ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বাইবেলে এ জাতির সদর স্থান 'সাদুম' (Sodom) বলা হয়েছে। এ লূত সাগরের (Dead sea) সন্নিকটে কোথাও অবস্থিত ছিল। তালমুদে আছে, যে সাদুম ছাড়াও এ অঞ্চলের আরও বড়ো বড়ো চারটি শহর ছিল। এসব শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলো এমন শোভামণ্ডিত ছিল যে, কয়েক মাইল ব্যাপী একটি মাত্র বাগান ছিল যার সৌন্দর্য দেখে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে পড়তো। কিন্তু আজকাল এ জাতির নাম ও অস্তিত্ব দুনিয়ার বুক থেকে একেবারে মুছে গেছে। এখন এটাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, তাদের অধিবাসগুলো ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল। এখন শুধু (Dead sea) তাদের একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে বিদ্যমান আছে যাকে আজকাল লূত সাগর বলা হয়।[১]৩০৩

হেজায থেকে শাম এবং ইরাক থেকে মিসর যাবার পথে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা দেখা যায়। সাধারণত ভ্রমণকারী দল এসব ধ্বংসাবশেষ দেখে থাকেন যা আজও সুস্পষ্ট রয়েছে। এ অঞ্চলটি লূত সাগরের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। বিশেষ করে এর দক্ষিণাংশ সম্পর্কে ভূগোলবেত্তাগণ বলেন যে, এ অঞ্চলে এমন পরিমাণে ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় যা দুনিয়ার অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।৩০৫

লূত জাতির অধঃপতন

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ

---

১. ইহুদীদের বিকৃত করা বাইবেলে হযরত লূত (আ)-এর জীবন চরিত্রের উপর যেসব কলংক আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে এও একটি যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে সাদূম (Sodom) অঞ্চলে চলে যান (ওল্ড টেস্টামেন্ট, আদি পুস্তক অধ্যায় ১৩, স্তোত্র ঃ ১-১২)। কিন্তু কুরআন এ উক্তি খণ্ডন করে বলছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী করে ঐ জাতির মধ্যে পাঠিয়ে দেন।৩০৪

এক ঃ তোমরা কি দুনিয়ায় সৃষ্টিজীবের মধ্যে পুরুষের নিকটে গমন কর এবং তোমাদের রব তোমাদের বিবিদের মধ্যে তোমাদের জন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা তোমরা পরিত্যাগ করছ ? বরঞ্চ তোমরা তো সীমা অতিক্রম করে গেছ।

–সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৬৫-১৬৬

اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - العنكبوت ٢٨

দুই ঃ "তোমরা কি সেই অশ্লীল কাজ করছো যা দুনিয়ার কোনো সৃষ্ট জীব তোমাদের আগে কোনো দিন করেনি ?"–সূরা আনকাবুত ঃ ২৮

اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ط - العنكبوت ٢٩

তিন ঃ "তোমাদের অবস্থা কি এই যে তোমরা পুরুষের কাছে যাও, রাহাজানি কর এবং নিজেদের বৈঠকাদিতে খারাপ কাজ কর ?–সূরা আনকাবুত ঃ ২৯

অর্থাৎ তাদের সাথে যৌন ক্রিয়া কর। যেমন সূরা আল আরাফে বলা হয়েছে–

اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ - "তোমরা যৌন লালসা পরিতৃপ্তি করার জন্যে নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কাছে যাও।" তারপর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এ অশ্লীল কাজ তোমরা গোপনে কর না বরঞ্চ প্রকাশ্যে নিজেদের আড্ডায় একে অপরের সামনে এ কুকর্ম কর। এ কথাই সূরা নামলে বলা হয়েছে– اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ - "তোমরা কি এতোটা অধঃপতিত হয়েছো যে, তোমরা এ অশ্লীল কাজ দর্শকদের সামনে কর ?"[৩০৬]

যে ঘৃণ্য কাজের জন্যে লূত জাতি চিরদিনের জন্যে কুখ্যাত হয়ে থাকবে, তা থেকে দুষ্কর্মকারী চরিত্রহীন লোক তো কখনো বিরত থাকেনি। কিন্তু এ গৌরবের (?) অধিকারী শুধু গ্রীক জাতি হয়ে পড়েছে যাদের দর্শন এ ঘৃণ্য অপরাধকে চারিত্রিক সৌন্দর্যের মর্যাদায় ভূষিত করার চেষ্টা করে। তারপর এ ব্যাপারে যতোটুকু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল তা আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা পূরণ করেছে। এর সপক্ষে প্রকাশ্যে বিরাট প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি জার্মানীর মতো একটি দেশের পার্লামেন্ট তাকে বৈধ ঘোষণা করে। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও একে আইনগত দিক দিয়ে বৈধ করা হয়েছে। অথচ এ এক সুস্পষ্ট সত্য যে, সমমৈথুন প্রাকৃতিক পদ্ধতির একেবারে পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা সকল জীবন সমমৈথুন প্রাকৃতিক পদ্ধতির একেবারে পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা সকল জীবন্ত সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির মধ্যে এর আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রী ও পুরুষজাতি মিলে একটা পরিবার গঠন করবে এবং তার থেকে একটা সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করবে। এ উদ্দেশ্যেই পুরুষ এবং নারী দুই পৃথক লিংগ তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের দৈহিক গঠন ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসকে পারস্পরিক ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যের জন্যে পুরোপুরি উপযোগী করা হয়েছে। তাদের আকর্ষণ ও পরিশোধনের মধ্যে এমন এক আস্বাদন রয়েছে যা প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে একই সাথে আহ্বায়ক ও ক্রিয়াশীল

এবং এ কাজের পুরস্কারও। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পদ্ধতির পরিপন্থী কাজ করে সমমৈথুনের দ্বারা যৌন সম্ভোগ করে, সে একই সাথে বিভিন্ন অপরাধ করে বসে। প্রথমতঃ সে তার নিজের এবং তার সার্বজনীন প্রাকৃতিক গঠন ও মনস্তাতাত্ত্বিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এভাবে সে তার মধ্যে বিরাট বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করে, যার ফলে উভয়ের দেহ, মন এবং চরিত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাতের অপরাধ করে বসে। কারণ প্রকৃতি যে যৌন আস্বাদনকে প্রজাতি ও সভ্যতার খেদমতের উপহার বানিয়েছিল, এবং যা লাভ করাকে কর্তব্য, দায়িত্ব এবং অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত করেছিল, তা সে কোনো খেদমত ব্যতিরেকেই এবং কোনো কর্তব্য, অধিকার এবং দায়িত্ব পালন ছাড়াই চোরা পথে অর্জন করলো। তৃতীয়তঃ সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্য স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফায়দা লাভ তো করে কিন্তু যখন তার নিজের পালা আসে তখন অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্বের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে তার আপন শক্তি-সামর্থ্য পুরোপুরি স্বার্থপরতার সাথে এমন পন্থায় ব্যবহার করে যা সমাজ, তামাদ্দুন ও নৈতিকতার জন্যে অলাভজনকই নয়, বরঞ্চ নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের খেদমতের জন্যে অযোগ্য বানায়। নিজের সাথে অন্তত পুরুষকে অস্বাভাবিক স্ত্রীসুলভ কাজে লিপ্ত করে, ফলে অন্তত দুজন নারীর জন্যে যৌন অনাচার ও নৈতিক অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।[৩০৭]

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ قَالَ يَا قَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ○ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ○ هود ٧٧-٧٩

চার ঃ "আমাদের ফেরেশতাগণ যখন লূতের নিকটে পৌছলো, তখন তাদের আগমনে লূত হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং মন সংকোচিত হলো। তখন সে বলতে লাগলো, আজ বড়ো বিপদের দিন। (এসব মেহমানদের আসা দেখে) তার জাতির লোকেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার বাড়ীর দিকে ছুটলো। আগে থেকেই তো তারা এ ধরনের দুষ্কর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো, ভাইসব, এই তো আমার মেয়েরা রয়েছে। এরা তোমাদের জন্য সবচেয়ে পাক-পবিত্র। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের নিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করো না। তোমাদের মধ্যে কি ভাল মানুষ নেই ? তারা এই বলে জবাব দিল, তুমি তো জানই যে, তোমার মেয়েদের নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই এবং তুমি এটাও জান যে, আমরা কি চাই।"–সূরা হুদ ঃ ৭৭-৭৯

এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে দেয়া হয়েছে, তার বর্ণনাভংগী থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ ফেরেশতাগণ সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর বাড়ী পৌছেছিলো। তাঁরা যে ফেরেশতা ছিলেন, তা তার জানা ছিল না। এ কারণেই এসব

মেহমানের আগমনে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং মনে দুশ্চিন্তার উদয় হয়। তিনি জানতেন যে, তাঁর জাতি কতখানি দুশ্চরিত্র ও নির্লজ্জ।

হতে পারে যে, হযরত লূত (আ) তাঁর জাতির কন্যা সম্প্রদায়ের প্রতিই ইংগিত করেন। কারণ নবী তাঁর জাতির পিতা সমতুল্য। আর জাতির কন্যা সম্প্রদায় তাঁর দৃষ্টিতে আপন কন্যার মতো। আবার এটাও হতে পারে যে, তাঁর ইংগিত আপন কন্যাদের প্রতি ছিল। যাহোক উভয় অবস্থাতেই এমন ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে, হযরত লূত (আ) তাদের সাথে ব্যভিচার করার জন্যে বলেছিলেন। "এ তোমাদের জন্যে সবচেয়ে পাক পবিত্র"—এ কথার কদর্থ করার কোনোই অবকাশ নেই। হযরত লূত (আ)-এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার এই ছিল যে, তারা তাদের যৌন প্রবৃত্তি ঐ স্বাভাবিক এবং জায়েয পদ্ধতিতে নিবৃত্ত করুক যা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং তার জন্যে মেয়েলোকের অভাব নেই।

وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ (এবং আমার মেহমানদের নিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করো না)-একথা তাদের মানসিকতার পূর্ণ চিত্র অংকিত করে যে, তারা লাম্পট্যে কতদূর নিমজ্জিত ছিল। কথা শুধু এতোটুকু নয় যে, তারা প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ পরিহার করে একটা অপ্রাকৃতিক অশ্লীল পথে ধাবিত হয়েছিল, বরঞ্চ তাদের অধঃপতন এতোটা চরমে পৌঁছেছিল যে, তাদের সকল প্রবণতা ও কামনা-বাসনা এখন এই একটি মাত্র অপবিত্র অশুচি পথের জন্যেই ছিল। এখন তাদের মনে ঐ অপবিত্রতা অশুচিতার আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গিয়েছিল এবং তারা প্রকৃতি এবং পবিত্রতার পথ সম্পর্কে একথা বলতে কোনো লজ্জাবোধ করতো না যে, এ পথ তো তাদের জন্যে নয়। এ নৈতিক এবং মানসিক অধঃপতনের এমন এক নিম্নতম অবস্থা, যার বেশী চিন্তা করা যায় না। এ ব্যক্তির ব্যাপার তো খুব লঘু, যে মানসিক দুর্বলতার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে হালালকে একটা চাওয়ার বস্তু মনে করে এবং হারামকে এমন বস্তু মনে করে যার থেকে বেঁচে থাকার দরকার। এমন ব্যক্তির কোনো সময়ে সংশোধনও হয়ে যেতে পারে। আর সংশোধন না হলেও বড়োজোর এতোটুকু বলা যায় যে, সে একজন পথভ্রষ্ট লোক। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির সকল প্রবণতা শুধুমাত্র হারাম কাজের জন্যে হয় এবং সে মনে করে যে হালাল তার জন্যে নয়, তখন তাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করা যায় না। সে প্রকৃতপক্ষে একটা ঘৃণ্য অপবিত্র কীট যে মলের মধ্যেই লালিত পালিত হয় এবং তার স্বভাব প্রকৃতির সাথে পবিত্রতার কোনো সামঞ্জস্যই থাকে না। এ ধরনের কীট যদি কোনো পরিচ্ছন্ন সুরুচিসম্পন্ন লোকের ঘরে জন্মে, তাহলে প্রথম সুযোগেই ফিনাইল ঢেলে তার অস্তিত্ব থেকে সে তার ঘর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখে। তাহলে আল্লাহই বা কতদিন তাঁর যমীনের উপরে এসব ঘৃণ্য অপবিত্র কীটের উপদ্রব সহ্য করতে পারেন ?৩০৮

وَجَاۤءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ○ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَلَا تُخْزُوْنِ ○ قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنٰتِيْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

الحجر : ٦٧-٧١

পাঁচ ঃ "ইত্যবসরে শহরের লোক আনন্দে আত্মহারা হয়ে হযরত লূতের বাড়ীতে উঠে পড়লো। লূত বললেন, ভাইসব, এরা আমার মেহমান। আমাকে কলংকিত করো না। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করো না। তারা বললো, আমরা কি তোমাকে বার বার নিষেধ করিনি যে, সারা দুনিয়ার ঠিকাদার সেজোনা। লূত অগত্যা বললেন, তোমাদের যদি কিছু করতেই হয় তাহলে এই তো আমার মেয়েরা রয়েছে।"–সূরা হিজর ঃ ৬৬–৭১

এর থেকে অনুমান করা যায় এ জাতির চরিত্রহীনতা কোন্ পর্যায়ে পৌছেছিল। বস্তির একজনের বাড়ীতে কয়েকজন সুদর্শন মেহমান আসলেই আর কথা নেই, তার বাড়ীতে লোকের ভিড় জমবে এবং তারা প্রকাশ্যে দাবী জানাবে, তোমার মেহমানদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আমরা তাদের সাথে কুকর্ম করবো।

তাদের গোটা জনপদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই যে, তাদের এ দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে। আর তাদের মধ্যে কোনো নৈতিক অনুভূতিও রয়ে যায়নি। যার কারণে প্রকাশ্যে এসব বাড়াবাড়ি দেখে তারা কোনোরূপ লজ্জাবোধ করতে পারে। হযরত লূত (আ)-এর মতো একজন মহান ব্যক্তি এবং নৈতিকতার শিক্ষাদাতার বাড়ীতেও যখন বদমায়েশরা নির্ভয়ে হামলা করতে পারে, তখন ঐ জনপদে সাধারণ মানুষের সাথে কোন্ আচরণ হয়ে থাকতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।[৩০৭]

তালমূদের বয়ান

তালমূদ এ জাতির যে অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছে তার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেয়া হচ্ছে। তার থেকে পরিষ্কার জানা যাবে যে, এ জাতি নৈতিক অরাজকতার কত নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। তালমূদে বলা হয়েছে যে, একবার একজন আয়লামী মুসাফির তাদের জনপদ অতিক্রম করছিল। পথে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় সাদুম (Sodom) শহরে তাকে অবস্থান করতে হয়। তার সাথে পাথেয় ছিল। কেউ তাকে আতিথেয়তার জন্যে ডাকলো না। সে একটা গাছের নীচে নেমে পড়লো। পরে একজন সাদুমী তাকে জিদ করে তার বাড়ী নিয়ে গেল। রাতে তাকে তার বাড়ীতে রাখলো। সকাল হবার আগেই তার মালপত্র সমেত তার গাধাকে উধাও করা হলো। সে চিৎকার করা শুরু করলো। কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না। বরঞ্চ তার কাছে আর যা কিছু ছিল বস্তির লোকজন তা কেড়ে নিয়ে তাকে শহর থেকে বের করে দিল।

একবার হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি হযরত সারা (আ) হযরত লূত (আ)-এর খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে তাঁর গোলাম আলী ইযরকে সাদুম পাঠালেন। আলী ইযর শহরে প্রবেশ করে দেখলো যে, একজন সাদুমী একজন আগন্তুককে ধরে মারছে। একজন অসহায় মুসাফিরকে কেন মারা হচ্ছে আলী ইযরের একথা বলাতে বাজারের সকলে মিলে তার মস্তক ছিন্ন করে দিল।

একবার একটি গরীব লোক সে শহরে এসেছিল। কোথাও সে কিছু খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় অধীর হয়ে একস্থানে পড়ে রইলো। তাকে দেখতে পেয়ে হযরত লূত (আ)-এর মেয়ে তাকে খানা এনে দিল। এজন্যে হযরত লূত (আ) এবং তাঁর মেয়েকে খুব ভর্ৎসনা

করা হলো এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বলা হলো যে, এমন কাজ করলে তাঁদেরকে বস্তিতে থাকতে দেয়া হবে না।

এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার পর তালমূদ প্রণেতা বলেন যে, দৈনন্দিন জীবনে এ লোকেরা বড়ো যালেম, ধোঁকাবাজ এবং লেনদেনে অসৎ ছিল। কোনো মুসাফির তাদের এলাকা থেকে নিরাপদে যেতে পারতো না। কোনো গরীব লোক তাদের কাছ থেকে এক টুকরা রুটি খেতে পেত না। এমনও অনেকবার হয়েছে যে, বাইর থেকে তাদের ওখানে এসে না খেয়ে মরে গেল। তখন তারা তার কাপড় খুলে নিয়ে উলংগ দাফন করে ফেললো। বাইরের কোনো ব্যবসায়ী দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ওখানে পৌঁছলে তার সর্বস্ব লুঠ করা হতো। তার কোনো ফরিয়াদ কেউ শুনতো না। তাদের উপত্যকায় তারা কয়েক মাইলব্যাপী বাগ-বাগিচা তৈরী করে রেখেছিল। এ বাগানের মধ্যে তারা প্রকাশ্যে চরম নির্লজ্জভাবে কুকর্ম করতো। একমাত্র লূত (আ)-এর কণ্ঠ ছাড়া অন্য কোনো কণ্ঠ তাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হতো না।

কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কুরআন মজিদে এ সমগ্র কানিহীকে শুধুমাত্র দুটি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে–وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَات তারা পূর্ব থেকেই বড়ো দুষ্কর্ম করে আসছিল। أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ- তোমরা পুরুষের দ্বারা যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত্ত কর, মুসাফিরদের রাহাজানি কর এবং নিজেদের বৈঠকে প্রকাশ্যে যৌন ক্রিয়া কর।[৩১০]

নবীর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

হযরত লূত (আ) যখন তাদেরকে সংশোধনের জন্যে আহ্বান জানালেন, তখন তাঁর জাতির লোকেরা রাগান্বিত হয়ে বললো,

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ○ الشعراء :١٦٧

"(হে লূত) এ সকল কথা থেকে যদি বিরত না হও তাহলে যাদেরকে এ বস্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তুমিও শামিল হবে।"-সূরা শুয়ারা ঃ ১৬৭

অর্থাৎ তোমার জানা আছে যে, এর পূর্বে যেই আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করেছে অথবা আমাদের মর্জির খেলাপ কাজ করেছে তাকে আমাদের বস্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন তুমি যদি এমন কর তাহলে তোমারও সেই পরিণাম হবে।

সূরা আল আ'রাফ এবং সূরা আন নামলে বলা হয়েছে যে, হযরত লূত (আ)-কে এ নোটিশ দেয়ার পূর্বে এ জাতির দুষ্ট লোকেরা সিদ্ধান্ত করেছিল যে– اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ- লূত এবং তার পরিবারের লোকজনকে তার বস্তি থেকে বের করে দাও। এরা বড়ো পাক-পবিত্র থাকতে চায়।[৩১১]

ফেরেশতাদের আগমন

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ العنكبوت : ٣١

"এবং যখন আমাদের ফেরেশতা সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট পৌঁছলো, তখন তাঁরা তাঁকে বললো, আমরা ঐ বস্তির লোকজন ধ্বংস করার জন্যে এসেছি। তারা বড়ো যালেম হয়ে পড়েছে।"–সূরা আনকাবূত ঃ ৩১

যে ফেরেশতাদেরকে লূত (আ)-এর জাতির উপর আযাব নাযিল করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হাজির হলো। তারা তাঁকে হযরত ইস-হাক (আ) এবং তারপর হযরত ইয়াকুব (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিল। তারপর বললো যে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে লূত জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে। কারণ তার জাতির লোকেরা সীমালংঘন করেছিল।[৩১২]

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ط ـ العنكبوت : ٣٢

"ইবরাহীম বললেন, সেখানে তো লূত রয়েছে।"–সূরা আনকাবূত ঃ ৩২

সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ ফেরেশতাদের এমন রূপ ধারণ করে আসার পেছনে কোনো ভয়ংকর অভিযান থাকে। অতপর যখন তাঁরা তাকে সুংসবাদ দিলেন তখন তাঁর আশংকা দূর হলো। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এ অভিযান লূত জাতির প্রতি পরিচালিত হবে, তখন সে জাতির জন্যে অনুকম্পার আবেদন জানালেন–فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ কিন্তু তাঁর আবেদন গ্রহণ করা হলো না। বলা হলো, এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না। আপনার রবের ফয়সালা হয়ে গেছে এবং এখন তা আর কিছুতেই পরিবর্তন হবে না– يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ এ কথায় যখন হযরত ইবরাহীমের (আ) আর কোনো আশা রইলো না, তখন তাঁর হযরত লূত (আ) সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হলো। তার জন্যে তিনি বললেন—সেখানে তো লূত রয়েছে। অর্থাৎ এ আযাব যদি হযরত লূত (আ)-এর উপস্থিতিতে হয় তাহলে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ তার থেকে বাঁচবেন কি করে?[৩১৩]

قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ز لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ العنكبوت : ٣٢

"তারা বললো, আমরা ভালোভাবে জানি সেখানে কে কে আছে। তার বিবিকে বাদ দিয়ে আমরা তাকে এবং তার পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে রক্ষা করবো। তার বিবি পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে একজন।"–সূরা আনকাবূত ঃ ৩২

হযরত লূত (আ)-এর বিবি সম্পর্কে সূরা তাহ্‌রীমের আয়াত ১০-এ বলা হয়েছে যে, সে হযরত লূত (আ)-এর অনুগত ছিল না। এ জন্যে তার সম্পর্কে ফায়সালা করা হয়েছিল

যে, একজন নবীর বিবি হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবে লিপ্ত করা হয়েছে। সম্ভবত হযরত লূত (আ) যখন হিজরত করে জর্দান অঞ্চলে গিয়ে বসতিস্থাপন করেন, তখন তিনি ঐ জাতির মধ্যে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে জীবনের দীর্ঘ সময় কাটাবার পরও সে ঈমান আনেনি এবং তার অনুরাগ তার জাতির প্রতিই ছিল। যেহেতু আল্লাহ তাআলার নিকটে আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের কোনো মূল্য নেই, সে জন্যে প্রত্যেকের সাথে তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতেই আচরণ করা হয়। এ জন্যে নবীর বিবি হওয়া তার জন্যে কোনো কাজে লাগলো না এবং তার পরিণাম তার স্বামীর সাথে না হয়ে হলো সেই জাতির সাথে যাদের সাথে সে দ্বীন ও আখলাক জড়িত রেখেছিল।[৩১৪]

হযরত লূত (আ)-এর দুশ্চিন্তা

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا - العنكبوت : ٣٣

"এবং যখন আমাদের ফেরেশতাগণ লূতের নিকটে পৌঁছলো, তখন তাদের আগমনে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মনমরা হয়ে পড়লো।"-সূরা আনকাবূত ঃ ৩৩

এ দুশ্চিন্তার কারণ এই ছিল যে, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন তরুণের আকৃতিতে এসেছিলেন। হযরত লূত (আ) তাঁর জাতির চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ জন্যে তাঁদের আসা মাত্রই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন যে, এসব মেহমানদেরকে রাখার ব্যবস্থা করলে, তাঁর পাপিষ্ট জাতির হাত থেকে তাঁদেরকে কিভাবে রক্ষা করবেন। আবার যদি তাদেরকে থাকতে দেয়া না হয় তাহলে হবে অত্যন্ত অভদ্রতা। উপরন্তু আশংকা এই যে, এসব মুসাফিরদেরকে আশ্রয় না দিলে স্বয়ং তাদেরকে নেকড়ে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করা হবে।[৩১৫]

সূরা হুদে বলা হয়েছে যে, যখন লোকেরা হযরত লূত (আ)-এর ঘরে ঢুকতে থাকে, তখন তিনি ভাবলেন যে, এখন আর কিছুতেই মেহমানদেরকে বাঁচানো যাবে না। তিনি তখন চিৎকার করে বললেন ঃ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ - "হায় তোমাদেরকে দুরস্ত করার শক্তি যদি থাকতো, অথবা কোনো শক্তিমানের সহযোগিতা যদি থাকতো" তখন ফেরেশতাগণ বললেন ঃ يٰلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا إِلَيْكَ - "হে লূত! আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কাছ পর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না।"[৩১৬]

وَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ - العنكبوت : ٣٣

"তারা বললো, ভয় নেই, কোনো চিন্তাও নেই।"-সূরা আনকাবূত ঃ ৩৩

অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে না এ বিষয়ে কোনো চিন্তা কর যে, তারা আমাদের কিছু করতে পারবে, আর না এ বিষয়ে যে কেমন করে তাদের থেকে আমাদেরকে রক্ষা করা যাবে। এ সুযোগেই ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-এর নিকটে এ রহস্য প্রকাশ করে দিলেন যে, তাঁরা মানুষ নন বরঞ্চ ফেরেশতা। এ জাতির উপর আযাব নাযিলের জন্যে তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে।[৩১৭]

বাইবেলে আযাবের বিবরণ

বাইবেলের বর্ণনা, গ্রীস ও ইতালীর প্রাচীন কাগজপত্রাদি, আধুনিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণে সে আযাবের বিবরণের উপরে যে আলোকপাত করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো।

লূত সাগরের (Dead sea) পূর্ব এবং দক্ষিণের যে অঞ্চলটি জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেখানে বহুসংখ্যক প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এটি কোনো এক কালে বসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল। আজও সেখানে শত শত ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন এ অঞ্চলটি এমন উর্বর নয় যে, এতোটা জনসংখ্যার বোঝা বহন করতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, এ অঞ্চলটির বসতি ও সাচ্ছল্য ২৩০০-১৯০০ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত ছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের ধারণা এই যে, তিনি যীশুখৃষ্টের দু' হাজার বছর পূর্বে জীবনযাপন করেন। এদিক দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সাক্ষ্য দেয় যে এ অঞ্চলটি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর ভাইপো হযরত লূত (আ)-এর যুগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অধিক বসতিপূর্ণ ও শস্যশ্যামল অংশকে বাইবেলে সাদ্দিম উপত্যকা বলা হয়েছে। এ খোদাওন্দের বাগান (আদন) এবং মিসরের মতো অতীব শস্যশ্যামল ছিল-(আদি পুস্তক ১৩ ঃ ১০)। আধুনিক যুগের বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সে উপত্যকাটি এখন লূত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ থেকে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে লূত সাগর দক্ষিণ দিকে এতোখানি প্রসারিত ছিল না যতোটা এখন রয়েছে। ট্রান্স্ জর্দানের বর্তমান শহর আল-কার্ক-এর সম্মুখে পশ্চিম দিকে এ সাগরে 'আল্ লিসান' নামে যে ছোটো একটি দ্বীপ ছিল প্রাচীনকালে এ ছিল পানির শেষ সীমান্ত। তার নিম্নাংশে যেখানে এখন পানি ছড়িয়ে আছে, পূর্বে একটা শস্যশ্যামল উপত্যকা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আর এটাই ছিল সাদ্দিম উপত্যকা যার মধ্যে লূত জাতির বড়ো বড়ো শহর, সাদুম, আমুরা, আদমা, সানবুয়েম এবং দুগার অবস্থিত ছিল। যীশুখৃষ্টের প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে এক ভয়ানক ভূমিকম্পে এ উপত্যকা ফেটে তলিয়ে যায় এবং লূত সাগরের পানি তার উপর এসে পড়ে। আজও এটি লূত সাগরের সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্বেলিত অংশ। কিন্তু রোমীয় শাসন কালে এ এতোটা উদ্বেলিত-উচ্ছলিত ছিল না যার ফলে লোক আল্ লিসান থেকে যাত্রা করে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পানির উপর দিয়ে পৌঁছে যেতো। সে সময় পর্যন্ত দক্ষিণ তীরের সাথে সাথে পানিতে নিমজ্জিত বনজংগল পরিষ্কার দেখা যেতো। এ সন্দেহও পোষণ করা হতো যে, পানিতে নিমজ্জিত কিছু দালান-কোঠাও রয়েছে।

বাইবেল এবং গ্রীক ইতালীর প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে পেট্রোল এবং Sphalerite -এর কূপ ছিল এবং কোনো কোনো স্থানে যমীন থেকে দাহ্য গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল এবং গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা অনুমান করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নের সাথে পেট্রোল, গ্যাস এবং Sphalerite যমীন থেকে বিস্ফোরিত হয় এবং সে বিস্ফোরণে গোটা অঞ্চল উড়ে যায়। বাইবেল বলে যে, এ ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন হিব্রন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে

যমীন থেকে এমনভাবে ধূম উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে যেমন ভাটা থেকে হয়।-(আদি পুস্তক অধ্যায় ১৯ ঃ স্তোত্র ২৮)।[৩২৪]

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً ـ

"আমরা এ জনপদে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।"

এ সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে লূত সাগর (Dead Sea) বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে মক্কায় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—এ যালেম জাতির কৃতকর্মের জন্যে যে শাস্তি এসেছিল তার এক নিদর্শন এখনো সাধারণ রাজপথে বিদ্যমান রয়েছে যা তোমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম যাবার পথে দিনরাত দেখতে পাও-

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ـ وَبِاللَّيْلِ ـ الصفت এবং وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ـ الحجر : ٧٦

সাম্প্রতিক আবিষ্কার

বর্তমান কালে এ কথা প্রায় নিশ্চয়তার সাথে স্বীকার করা হচ্ছে যে, লূত সাগরের দক্ষিণাংশ এক ভয়ানক ভূমিকম্পে ভূগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ফলে এরূপ ধারণ করেছে। আর এই তলিয়ে যাওয়া অংশেই লূত জাতির কেন্দ্রীয় শহর সাদুম (Sodom) অবস্থিত ছিল। এ অংশে পানির নীচে কিছু নিমজ্জিত জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সম্প্রতি আধুনিক ডুবারী যন্ত্রাদির সাহায্যে পানির নীচে গমন করে ধ্বংসাবশেষ সন্ধানের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টার কোনো সুফল জানা যায়নি।[৩২৫]

وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ الذاريات : ٣٧

"তারপর সেখানে আমরা এক নিদর্শন তাদের জন্যে রেখে দেই যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করে।"-সূরা আয যারিয়াত ঃ ৩৭

এ নিদর্শন হচ্ছে লূত সাগর (Dead sea), যার দক্ষিণাংশ এখনো এক বিরাট ধ্বংসের স্বাক্ষর বহন করছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা এই যে, লূত জাতির বড়ো শহর সম্ভবত ভয়ানক ভূমিকম্পে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে এবং তার উপর লূত সাগরের পানি ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ এ সাগরের সে অংশ যা আল্ লিসান নামীয় ছোট দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত তা পরবর্তীকালের সৃষ্টি বলে মনে হয় এবং প্রাচীন লূত সাগরের যেসব ধ্বংসাবশেষ ঐ দ্বীপটির ভিতরে দেখতে পাওয়া যায়, সেসব দক্ষিণ দিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে ভিন্ন ধরনের। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, দক্ষিণাংশ প্রথমে ঐ সাগরের উপরিভাগ থেকে উচ্চ ছিল। পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে নীচে তলিয়ে গেছে। আর এই তলিয়ে যাওয়ার সময়টাও যিশুখৃষ্টের দু'হাজার বছর আগে বলেই মনে হয়। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই হলো হযরত ইবরাহীম (আ) এবং লূত (আ)-এর যুগ। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকান দল আল্‌লেসানে এক বিরাট কবরস্থান দেখতে পায়, যার মধ্যে বিশ হাজারেরও অধিক কবর আছে। এর থেকে অনুমান হয় যে, নিকটে অবশ্যই কোনো বড়ো শহর অবস্থিত ছিল। কিন্তু আশেপাশে এমন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান নেই যার সন্নিকটে এতো বড়ো কবরস্থান হতে পারে। এর থেকে সন্দেহ প্রবল হয়

জর্দান নদী
আরীহা
বায়তুল মুকাদ্দাস
খুরবতে কামরান
মৃত সাগর (মৃতসাগর)
হিবরুণ
বনী নুয়াইম
ফিলিস্তিন
পূর্ব জর্দান
আল লিসান
আল কারক
মু'তাহ
আস সানী
লূত জাতির এলাকা
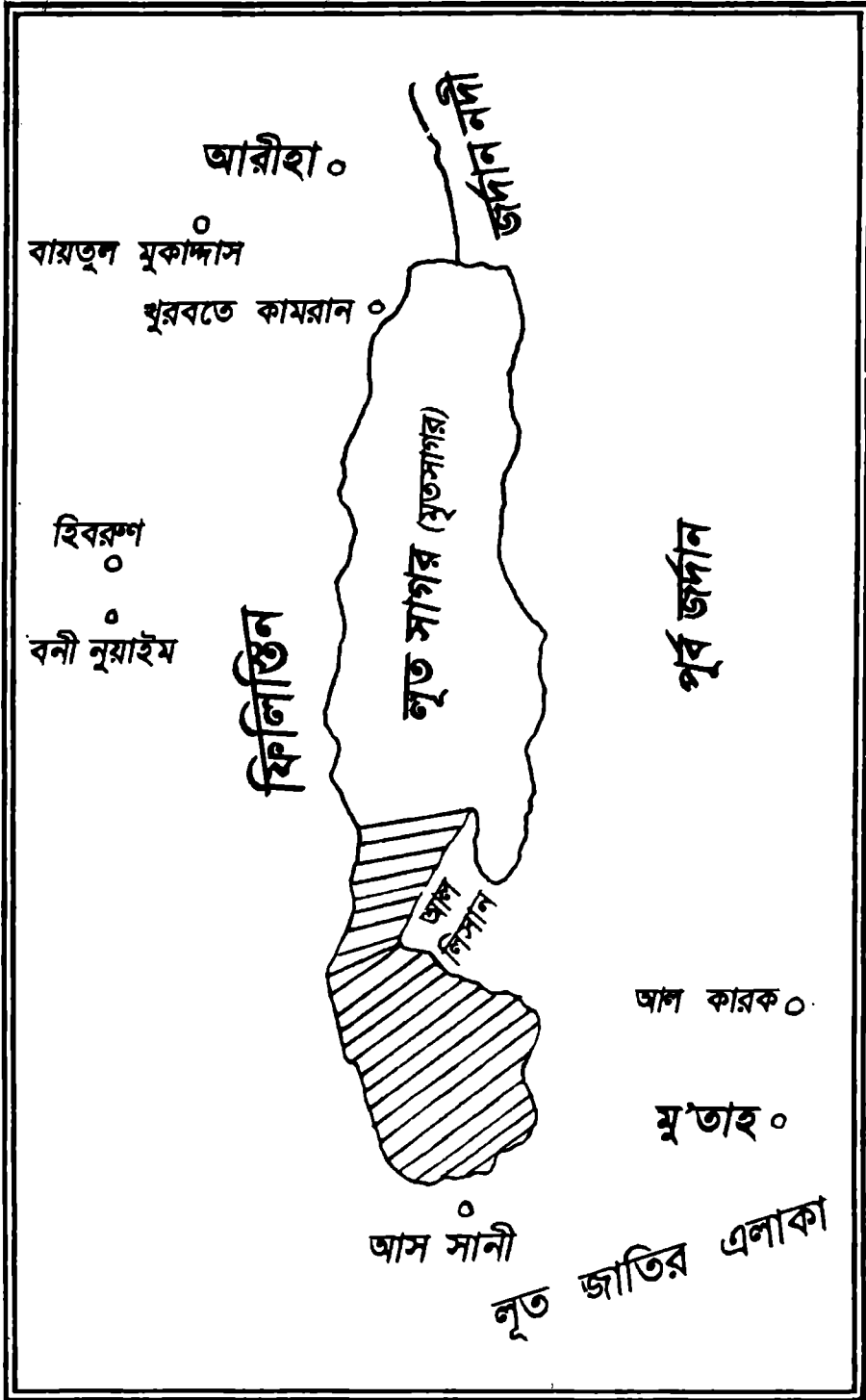
যে, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে অঞ্চলটি রয়েছে তারও চারদিকে ধ্বংসলীলা দেখা যায়। যমীনের মধ্যে গন্ধক, আলকাতরা, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি এতো পরিমাণে মজুদ দেখতে পাওয়া যায় যে, যা দেখলে মনে হয় কোনো এক সময়ে বিদ্যুৎ পতনে অথবা ভূমিকম্পে গলিত পদার্থ বিস্ফোরণে এখানে এক জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছিল।[৩২৬]

সাবা জাতি

সাবা জাতির অঞ্চল

সাবা দক্ষিণ আরবের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী 'মারেব' বর্তমান ইয়েমেনের রাজধানী সান্‌য়ার পঞ্চান্ন মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। মায়ীন রাজ্যের পতনের পর প্রায় ১১০০ খৃষ্টপূর্বে সাবা জাতির উন্নতির অগ্রগতি শুরু হয় এবং এক হাজার বছর পর্যন্ত আরবদেশে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি বিদ্যমান থাকে। তারপর ১১৫ খৃষ্টপূর্বে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ জাতি হিম্‌ইয়ার তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। পশ্চিমে ইয়েমেন ও হাজারামাওত এবং আফ্রিকায় আবিসিনীয় অঞ্চলের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বিরাট জাতি

পূর্ব আফ্রিকা, ভারত, দূরপ্রাচ্য এবং স্বয়ং আরব দেশের যত ব্যবসা-বাণিজ্য মিসর, শাম, গ্রীক ও রোমের সাথে হতো, তা অধিকাংশই সাবায়ীদের হাতে ছিল। এজন্যে এ জাতি প্রাচীনকালে তাদের ধনসম্পদের জন্যে বিখ্যাত ছিল। বরঞ্চ গ্রীক ঐতিহাসিক তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসা ছাড়াও তাদের সাচ্ছল্যের বড়ো কারণ এই ছিল যে, তারা দেশের স্থানে স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে সুন্দর সেচকার্যের ব্যবস্থা করেছিল। তার ফলে তাদের গোটা অঞ্চল শস্যশ্যামল ও ফলে ফুলে সুশোভিত ছিল। তাদের দেশের অসাধারণ উর্বরতা ও শস্যশ্যামলতার উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণও করেছেন। কুরআনে সূরা আস সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তেও এর ইংগিত করা হয়েছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে 'সাবা' দক্ষিণ আরবের এক অতি বিরাট জাতির নাম। এটি ছিল বড়ো বড়ো উপজাতীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। ইমাম আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবদুল বার্‌র এবং তিরমিযি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে; সাবা আরবের একটি লোকের নাম ছিল, যার বংশ থেকে নিম্নের গোত্রগুলো জন্মলাভ করে। যথা—কিন্দাহ, হিমইয়ার, আযদ্‌, আশয়ারিয়্যীন, মায্‌হিজ্‌, আন্‌-মার (এর দুটি শাখা-খাশ্‌উম ও বাযীলা), আমেলা, জুযাম, লাখম এবং গাস্‌সান।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে আরবের এ জাতির সুখ্যাতি ছিল। ২৪০০ খৃষ্টপূর্বে উরের শিলালিপি সাবুমের নামে এ জাতির উল্লেখ করে। তারপর বেবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং এভাবে বাইবেলেও বার বার তার উল্লেখ করা হয়েছে। (যেমন-গীতসংহিতা ৭২ ঃ ১৫, যিরমিয় ৬ ঃ ২০, যিহিষ্কেল ২৭ ঃ ২২, ৩৮ ঃ ১৩, ইয়োব ৬ ঃ ১৯)।

গ্রীস ও রোমের ঐতিহাসিকগণ এবং ভূগোলবেত্তা থিয়োফ্রাস্টিস্‌ (Theofrastes) ২৮৮ খৃষ্টপূর্ব থেকে যীশুখৃষ্টের পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত ক্রমাগত তার উল্লেখ করেন। তার আবাস ছিল আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এখন তা ইয়ামেন নামে অভিহিত। তার

স্বর্ণযুগ শুরু হয় ১১০০ খৃষ্টপূর্বে হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে একটা সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[৩২৭]

সাবার ধর্মীয় ইতিহাস

প্রথমে এ জাতি একটি সূর্য উপাসক জাতি ছিল।[১] তাদের রাণী যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর হাতে ঈমান আনে (৯৬৫–৯২৬ খৃষ্টপূর্ব)। তখন খুব সম্ভব তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে তাদের মধ্যে শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটে এবং তারা 'আল্‌মাকা' (চন্দ্রদেব), আশ্‌তার (জোহরা), যাতে-হামীম ও যাতে-বা'দন (সূর্যদেব), হোবিস্‌, হারসতম, অথবা হারিমত এবং এ ধরনের বহু দেবদেবীর পূজা শুরু করে। তাদের সবচেয়ে বড়ো দেবতা ছিল আল্‌মাকা। তাদের বাদশাহ সে দেবতার উকিল হিসাবে আনুগত্যের হকদার বলে নিজেকে মনে করতো। ইয়েমেনে বহুসংখ্যক এমন শিলালিপি পাওয়া গেছে যার থেকে জানা যায় যে গোটা দেশ এসব দেব-দেবীর বিশেষ করে আল্‌মাকার মন্দিরে ভরপুর থাকতো। প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।[২][৩২৮]

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আধুনিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে ইয়েমেন থেকে প্রায় তিন হাজার শিলালিপি সংগ্রহ করা হয়েছে যা ঐ জাতির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। তার সাথে যদি আরব, রোমীয় এবং গ্রীক ইতিহাসের বর্ণনা একত্র করা হয় তাহলে তাদের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করা যায়। এসব বর্ণনা মতে তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগসমূহ নিম্নরূপ ঃ

খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ সালের পূর্বেকার যুগ

এ সময়ে সাবারাজদের উপাধি ছিল মুকাররেব (مُكَرِّب) খুব সম্ভব এ শব্দটি (مُقَرِّب) শব্দেরই সমার্থবোধক। তার অর্থ এই যে, এ বাদশাহ মানুষ এবং খোদার মধ্যে নিজেকে মাধ্যম বলে মনে করতো অথবা অন্য কথায় তারা ছিল গণক রাজা (Priest Kings)। সে সময়ে তাদের রাজধানী ছিল সিরওয়াহ্‌ যার ধ্বংসাবশেষ আজও মারেব থেকে পশ্চিম দিকে

---

১. কুরআন মজিদের সূরা আন নামল, আয়াত ২৪ থেকে জানা যায় যে, হুদ্‌হুদ্‌ যখন হযরত সুলায়মান (আ)-কে সে জাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলো, সে সময়ে তারা সূর্যের পূজা করতো। আরবের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকেও জানা যায় যে, তাদের এই ধর্ম ছিল। ইবনে ইসহাক কুলাচার্যদের বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সাবা জাতির পূর্ব-পুরুষ ছিল 'আব্‌দে শামস্‌' (সূর্য পূজারী) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনী ইসরাঈলের ঐতিহ্য থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, হুদ্‌হুদ্‌ যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র নিয়ে সাবার রাণীর নিকটে গমন করে তখন সে সূর্য দেবতার পূজার জন্যে যাচ্ছিল। হুদ্‌হুদ্‌ পথিমধ্যে পত্রখানা রাণীর সামনে নিক্ষেপ করে।

২. ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে সাবা জাতির মধ্যে এমন এক দল লোক ছিল যারা দেব-দেবীর পরিবর্তে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতো। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপ থেকে যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে এ ক্ষুদ্র দলটির চিহ্ন পাওয়া যায়। ৬৫০ খৃষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ের কিছু শিলালিপি এ স্বাক্ষর বহন করে যে, সাবা রাজ্যের স্থানে স্থানে এমন কিছু উপাসনাগার নির্মিত ছিল যেগুলো আসমানের প্রভুর (রাব্বুস্‌ সামায়ে) ইবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কোনো কোনো স্থানে ঐ খোদার নাম ملكن ذسموى (এমন বাদশাহ যিনি আকাশের প্রভু) লিখিত পাওয়া গেছে। এ দলটি ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী যাবত ইয়েমেনে বিদ্যমান ছিল। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ শব্দগুলো লিখিত পাওয়া যায়– بنصر ورد الـهن بعد سمين وارضين অর্থাৎ ঐ খোদার সাহায্য সহযোগিতায় যিনি আসমান ও যমীনের মালিক। সে সময়ের আর একটা শিলালিপিতে (৪৫৮ খৃঃ) সেই খোদার জন্যে রহমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দগুলো হচ্ছে بردا رحمنن অর্থাৎ রহমানের সাহায্যে।[৩২৯]

এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে তার বক্তব্যের অন্তরনিহিত তাৎপর্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেরেশতারা সুন্দর ছেলেদের ছদ্মবেশে হযরত লূত (আ)-এর গৃহে এসেছিলেন। তারা যে ফেরেশতা একথা হযরত লূত (আ) জানতেন না। এ কারণে মেহমানদের আগমনে তিনি খুব বেশী মানসিক উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন এবং তাঁর মনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে জানতেন। তারা কেমন ব্যভিচারী এবং কী পর্যায়ের নির্লজ্জ হয়ে গেছে তা তাঁর জানা ছিল।

"(এ মেহমানদের আসার সাথে সাথে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললো ঃ ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আল্লাহর ভয়-ডর কিছু করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই। তারা জবাব দিল ঃ তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"–সূরা হূদ ঃ ৭৮-৭৮(৩১৮)

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ القمر : ٣٧

"তারপর তারা হযরত লূতকে তাঁর মেহমানের হেফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অবশেষে আমরা তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিলাম। (বললাম) এখন আমার আযাব এবং সর্তকবাণীর আস্বাদ গ্রহণ কর।"–সূরা আল ক্বামার ঃ ৩৭

হযরত লূত (আ) উন্মত্ত জনতার কাছে আকুল আবেদন জানালেন, যেন এ ঘৃণ্য পদক্ষেপ থেকে তারা বিরত থাকে। কিন্তু তারা মানলো না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বল-পূর্বক মেহমানদেরকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তারা অন্ধ হয়ে পড়ে। তারপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে পরিবার-পরিজনসহ ভোর হবার পূর্বেই ঐ বস্তি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তাঁদের বের হয়ে যাবার সাথে সাথেই এ জাতির উপর এক ভয়ংকর আযাব নাযিল হলো।

বাইবেলে এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"তখন তাহারা কহিল সরিয়া যা। আরও কহিল, এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল ; এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরও কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াউ হইয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন ; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন ; তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।"

–আদি পুস্তক–১৯ ঃ ৯–১১(৩১৯)

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ۝ الذاريات : ٣٢ـ٣٤

"তারা বললো, আমাদেরকে পাপিষ্ঠ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। আমরা তাদের উপরে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করবো। এসব তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।"-সূরা আয যারিয়াত ঃ ৩২-৩৪

অর্থাৎ এক একটি পাথরকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে তা কোন্টা কোন্ পাপিষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করা হবে।৩২০

আযাব অবতরণ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝ هود ٨٣-٨٢

"তারপর যখন আমাদের নির্ধারিত সময় এসে গেল তখন আমরা ঐ জনপদকে ওলট পালট করে দিলাম এবং তার উপর পাকা মাটির পাথর ক্রমাগত বর্ষণ করতে থাকলাম। এসব পাথরের প্রত্যেকটি তোমার রবের নিকটে চিহ্নিত করা ছিল এবং যালেমদের থেকে এ শাস্তি কিছু দূরে ছিল না।"-সূরা হূদ ঃ ৮২-৮৩

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝ الشعراء : ١٧٣

এবং আমরা তাদের উপর মুষলধারে বারিবর্ষণ করলাম। এ বর্ষণ তাদের উপর ছিল যাদেরকে আগে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল।-সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৭৩

সম্ভবত এ শাস্তি এসেছিল ভয়ানক ভূমিকম্প এবং অগ্নি উদ্গীরণকারী বিস্ফোরণের আকারে। ভূমিকম্প সে জনপদকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল এবং অগ্নি উদ্গীরণকারী পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করেছিল। পাকা মাটির পাথর সম্ভবত ঐসব মাটি যা অগ্নি উদ্গীরণকারী অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও গলিত পদার্থের সংমিশ্রণে পাথরের আকার ধারণ করে। লূত সাগরের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে প্রস্তর বর্ষণের ধ্বংসাবশেষ আজও চারদিকে দেখা যায়।৩২১

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ الذاريات : ٣٦

যেখানে আমরা একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো ঘর পাইনি।

গোটা জাতি এবং সমগ্র অঞ্চলে শুধু একটি মাত্র বাড়ী ছিল যার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের আলো পাওয়া যেতো। আর সে একটি মাত্র বাড়ী ছিল হযরত লূত (আ)-এর। অবশিষ্ট গোটা জাতি পাপাচারে লিপ্ত ছিল এবং তাদের দেশ পাপ-মলিনতায় পূর্ণ ছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা ঐ একটি বাড়ীর লোকজনকে জীবিত বের করে আনলেন। তারপর সেদেশে এমন ধ্বংস নেমে আসে যে, সে পাপিষ্ঠ জাতির কোনো একজনও বেঁচে থাকতে পারেনি।[১]৩২২

---

১. আল্লাহ্ তাআলার প্রতিদান বা শাস্তি প্রদানের আইন (Law of Retribution) হচ্ছে এই যে, কোনো জাতিকে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয় না যতোক্ষণ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মংগল অবশিষ্ট থাকে। অসৎলোকের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় যদি এমন একটি মুষ্টিমেয় দলও থাকে যে অনাচার প্রতিরোধ এবং সৎ পথে মানুষকে আহ্বান করার চেষ্টা চালায় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে কাজ করার সুযোগ দেন। কিন্তু অবস্থা যখন এই হয় যে, কোনো জাতির মধ্যে সামান্যতম পরিমাণে মংগলও দেখতে পাওয়া যায় না, তখন আল্লাহ্ তাআলার নীতি এই হয় যে, জনপদের মধ্যে অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে যারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের অল্পসংখ্যক লোককে তিনি তাঁর কুদরতে রক্ষা করেন এবং অবশিষ্ট লোকের প্রতি সেই আচরণই করেন যা একজন বুদ্ধিমান মালিক তার পঁচে যাওয়া ফলের সাথে করে থাকে।৩২৩

একদিনের পথে দেখতে পাওয়া যায় যা খারীবা নামে খ্যাত। এ সময়ে মারেবের প্রখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন সময় সাবার বাদশাহগণ তাকে প্রসারিত করেন।

খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ পর্যন্ত সময়কাল

এ যুগে সাবার বাদশাহগণ মুকাররেব উপাধি পরিহার করে মালিক (অর্থাৎ বাদশাহ) উপাধি ধারণ করেন। তার অর্থ এই যে, রাজ্য পরিচালনায় ধর্মের স্থানে রাজনীতি এবং ধর্মহীনতার প্রভাব বেড়ে যায়। সে সময়ে সাবার বাদশাহগণ 'সিরওয়ার' পরিবর্তে মারেবে তাদের রাজধানী স্থাপন করে এবং তার অসাধারণ উন্নতি সাধন করে। এ স্থানটি সমুদ্রের ৩৯০০ ফুট উচ্চে সান্‌য়া থেকে ষাট মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। আজ পর্যন্ত তার ধ্বংসাবশেষ সাক্ষ্য দেয় যে এ এককালে একটি সুসভ্য জাতি ছিল।

খৃষ্টপূর্ব ১১৫ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল

এ সময়ে সাবা রাজ্যে হিম্‌ইয়ার গোত্র বিজয়ী হয়—যা ছিল সাবা জাতিরই একটি গোত্র এবং সংখ্যায় তারা সকল গোত্র থেকে অধিক ছিল। এ সময়ে মারেবকে জনশূন্য করে রায়দানে রাজধানী স্থাপন করা হয়। এটি ছিল হিম্‌ইয়ার গোত্রের কেন্দ্রীয় আবাসভূমি। পরে এ শহরটি 'যাফার' নামে অভিহিত হয়। আজকাল বর্তমান শহর ইয়ারিমের নিকটবর্তী একটি গোলাকার পাহাড়ের উপর তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তার নিকটবর্তী অঞ্চলে হিমইয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র গোত্র বসবাস করে যাদেরকে দেখে এ ধারণাই করা যায় না যে, এ গোত্রটি তাদেরই স্মৃতি বহন করছে, এক সময়ে যাদের দুনিয়া জোড়া প্রতিপত্তি ছিল। এ সময়ে রাজ্যের একটা অংশ হিসাবে প্রথম يمنت اويمنات শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং ক্রমশ গোটা অঞ্চলের নাম ইয়েমেন হয়ে যায়। ইয়েমেন আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদিন পর্যন্ত এবং বাব-আলমান্দাব থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগেই সাবায়ীদের পতন শুরু হয়।

তিনশত খৃষ্টাব্দ থেকে ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কাল

এ যুগ ছিল সাবাজাতির ধ্বংসের যুগ। এ যুগে তাদের মধ্যে ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ চললে বাইরের জাতিগুলো হস্তক্ষেপ শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যে চরম অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সাবা জাতি তাদের স্বাধীনতাও হারিয়ে ফেলে। রায়দানা, হিম্‌ইয়ারী এবং হামদানীদের মধ্যে কলহ-বিবাদের সুযোগ নিয়ে ৩৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হাবশীগণ ইয়েমেন তাদের অধিকারভুক্ত করে রাখে, তারপর আযাদী পুর্নবহাল হলেও মারেবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল শুরু হয়। অবশেষে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে এক বিরাট বন্যা হয় যার উল্লেখ সূরা সাবাতে রয়েছে। যদিও তার পরে আবরাহার যুগ পর্যন্ত এ বাঁধের ক্রমাগত মেরামত হতে থাকে। তথাপি যে জনসংখ্যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা পুনরায় একত্র হতে পারেনি। সেচকার্য এবং কৃষির ব্যবস্থাপনা নষ্ট হবার পর তা আর পুনর্বহাল হতে পারেনি।[১] ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের

---

১. সাবা জাতি এমনভাবে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, তা একটা প্রবাদে পরিণত হয়। আজও যদি কোনো আরববাসী কারো বিচ্ছিন্ন হওয়ার উল্লেখ করে তাহলে বলে যে, সাবা জাতির মতো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দে ভাটা পড়া শুরু হলো, তখন তাদের বিভিন্ন গোত্র নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যায়। আওস এবং খায্‌রাজ গোত্র দুটি ইয়াসরিবে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। খুযায়া গোত্র জিদ্দার নিকটবর্তী তিহামা অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। আযদ গোত্র ওমানে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। লাখম্‌, জুযাম এবং কিন্দাহ্ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত সাবা বলে কোনো জাতির নামই দুনিয়াতে রইলো না। তার উল্লেখ শুধু গল্পকাহিনীর মধ্যেই রয়ে গেল।[৩৩০]

ইহুদী বাদশাহ যু-নোয়াস নাজরানের খৃষ্টানদের উপর চরম অত্যাচার উৎপীড়ন করে, যার উল্লেখ কুরআন মজিদে 'আসহাবুল উখ্‌দুদ' নামে করা হয়েছে। তারপর আবিসিনিয়ার খৃস্টান সরকার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ইয়েমেন আক্রমণ করে সমগ্র দেশ জয় করে। তারপর ইয়েমেনের হাবশী ভাইসরয় আবরাহা কা'বা ঘরের কেন্দ্রীয় মর্যাদা নষ্ট করার জন্যে এবং মারেবের গোটা পশ্চিমাঞ্চল রোমীর হাবশী প্রভাবাধীন করার জন্যে ৫৭০ অথবা ৫৭১ খৃস্টাব্দে [নবী (সা)-এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে] মক্কা আক্রমণ করে। কিন্তু তার গোটা সেনাবাহিনীর উপর এমন ধ্বংসলীলা নেমে আসে যা কুরআন মজিদে 'আসহাবে ফীল' নামে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে ৫৭৫ খৃস্টাব্দে ইরানীগণ ইয়েমেন অধিকার করে এবং ৬২৮ খৃস্টাব্দে ইরানী গভর্নর বাযান-ইসলাম গ্রহণ করার পর ইয়েমেনে ইরানী অধিকার শেষ হয়ে যায়।

সাবা জাতির বৈষয়িক উন্নতি

সাবা জাতির উন্নতি আসলে দুটি কারণে হয়েছে, এক-কৃষি এবং দ্বিতীয়-ব্যবসা-বাণিজ্য। সেচের সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির এমন উন্নতি সাধন করা হয়েছিল যে, অতীত কালে এ ধরনের সেচ ব্যবস্থা বেবিলন ছাড়া আর কোথাও ছিল না। তাদের দেশে স্বাভাবিক কোনো নদ-নদী ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে নালা বয়ে পানি আসতো। স্থানে স্থানে এসব নালায় বাঁধ নির্মাণ করেও জলাধার তৈরী করে তার থেকে খাল কেটে কেটে গোটা দেশে এমনভাবে পানি পৌঁছে দেয়া হতো যে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী চারদিকে শুধু বাগ-বাগিচাই নজরে পড়তো। এ সেচ ব্যবস্থাপনার সর্ববৃহৎ জলাধার ছিল মারেব শহরের নিকটবর্তী বালক্ পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় যা বাঁধ নির্মাণ করে তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু যখন তাদের থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, তখন খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, মধ্যবর্তী সময়ে এ বিরাট বাঁধ ভেঙে যায় এবং তার থেকে যে প্রবল বেগের ন্যার স্রোত প্রবাহিত হয় তার ফলে একটির পর একটি করে সকল বাঁধ ভেঙে যায়, এভাবে সমগ্র সেচ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায়। এ ব্যবস্থাপনা আর বহাল করা সম্ভব হয়নি।[১]

ব্যবসার জন্যে আল্লাহ এ জাতিকে সর্বোত্তম ভৌগলিক ভূখণ্ড দান করেছিলেন যার প্রভূত সুযোগ তারা গ্রহণ করেছে। এক হাজার বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবসার মাধ্যম হিসাবে কাজ করতো। একদিকে তাদের বন্দরগুলোতে চীনের রেশম, ইন্দোনেশীয়া এবং মালাবারের গরম মশলা, ভারতের কাপড় ও তরকারী, পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীতদাস, বানর, উটপাখীর পালক এবং হাতীর দাঁত পৌঁছতো এবং অন্যদিকে তারা এসব পণ্যদ্রব্যাদি মিসর ও শামের বাজারে পাঠিয়ে দিত এবং সেখান থেকে রোম, গ্রীক প্রভৃতি দেশে পৌঁছে যেতো। উপরন্তু তাদের দেশে লোবান, চন্দনকাঠ, মৃগনাভি এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্যাদি ও নির্যাস পাওয়া যেতো। এসব দ্রব্যাদি মিসর, শাম, রোম ও গ্রীসের লোক হাতে হাতে নিয়ে যেতো।

এ বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের দুটি পথ ছিল। একটি জলপথ এবং অন্যটি স্থলপথ। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ঠিকাদারি এক হাজার বছর পর্যন্ত সাবায়ীদের হাতে ছিল।

১. কুরআন মজীদে এ ধ্বংসাত্মক শাস্তির সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

কারণ লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু, সাগর গর্ভের পাহাড়-পর্বত এবং জাহাজ নোংগরবদ্ধ করার স্থানসমূহের রহস্য একমাত্র তাদেরই জানা ছিল। অন্য কোনো জাতি এ ভয়ানক সাগরে জাহাজ চালাতে সাহস করতো না। এ সমুদ্র পথে তারা তাদের পণ্যদ্রব্য জর্দান ও মিসরের বন্দরগুলোতে পৌছিয়ে দিত। স্থলপথ আদন এবং হাজরামওত থেকে মারেব-এ গিয়ে মিলিত হতো। তারপর সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসরেব, আল্ উলা, তাবুক এবং আয়লা হয়ে পেট্রা পর্যন্ত পৌছতো। তারপর একটি পথ মিসরের দিকে এবং অন্যটি শামের দিকে যেতো এ স্থলপথে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে। ইয়েমেন থেকে শাম সীমান্ত পর্যন্ত তাদের উপনিবেশগুলো একটানা বিস্তার লাভ করেছিল এবং দিনরাত এ পথ দিয়েই তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা চলাচল করতো। এ অঞ্চলে আজও তাদের অনেক উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে এবং এখানে সাবায়ী এবং হুমায়রী ভাষায় শিলালিপি পাওয়া যায়।

বাণিজ্যিক পতনের সূচনা

প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দী নাগাদ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে যখন গ্রীক এবং পরে রোমীয়দের শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উঠতে থাকলো যে, যেহেতু আরব ব্যবসায়ীগণ ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্যের খুশীমতো মূল্য আদায় করছে, সেজন্যে এখন প্রয়োজন হলো, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমরাই এ ব্যবসা হস্তগত করব। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মিসরের গ্রীক বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমুস্ (২৮৫-২৪৬ খৃঃ পূঃ) সে পুরাতন খাল নতুন করে উন্মুক্ত করে যা সতেরো 'শ বছর পূর্বে ফেরাউন সেসুসিতরিকস নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে মিলিত করার জন্যে কেটেছিল। এ খালের মধ্য দিয়েই প্রথম মিসরীয় রণতরী লোহিত সাগরে প্রবেশ করে। কিন্তু সাবায়ীদের মুকাবিলায় এ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় না। অতপর রোমীয়গণ মিসরের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। তখন রোমীয়গণ অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্যপোত লোহিত সাগরে প্রেরণ করে এবং তার পেছনে একটা যুদ্ধ জাহাজও পাঠায়। এ শক্তির মুকাবেলা করা সাবায়ীদের সাধ্যের অতীত ছিল। রোমীয়গণ স্থানে স্থানে পোতাশ্রয়গুলোতে তাদের বাণিজ্যিক উপনিবেশ কায়েম করে। এগুলোতে জাহাজের সকল প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে। তারপর যেখানে তারা প্রয়োজন মনে করে সেখানে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে। অবশেষে আদনে তাদের সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে রোমীয় এবং হাবশী শাসকগণ একজোট হয়ে সাবায়ীদের স্বাধীনতা হরণ করে।

সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য হাত ছাড়া হওয়ার পর শুধু স্থলপথের বাণিজ্যই সাবায়ীদের হাতে রয়ে যায়। কিন্তু এমন বহু কারণ ছিল যার ফলে ক্রমশ তাদের শক্তি চূর্ণ হয়। প্রথমতঃ নাবতীগণ পেট্রা থেকে আলউলা পর্যন্ত হেজাজের মালভূমি এবং জর্দানের যাবতীয় উপনিবেশ থেকে সাবায়ীদের বহিষ্কৃত করে। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমীয়গণ সাবায়ী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায় এবং হেজাজের সীমান্ত বরাবর শাম ও জর্দানের সমস্ত অঞ্চল তাদের হস্তগত করে। তারপর আবিসিনিয়া এবং রোমের যুগ্ম প্রচেষ্টা ছিল সাবায়ীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করা। এ জন্যে বার বার আবিসিনিয়া ইয়েমেনের উপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে। অবশেষে তারা গোটা দেশটিকে তাদের অধিকারভুক্ত করে ফেলে।

আযাব নাযিলের পূর্বে তাদের বিলাসবহুল সভ্যতা

এভাবে আল্লাহ্ তাআলার গজব এ জাতিকে উন্নতির শিখর থেকে এমন এক ধ্বংস-গহ্বরে নিক্ষেপ করে যে, সেখান থেকে কোনো অভিশপ্ত জাতি আর মস্তক উত্তোলন করতে পারেনি। এমন এক সময় ছিল যখন তাদের ধন-দৌলতের গল্প শুনে শুনে গ্রীক এবং রোমীয়দের জিহ্বায় পানি আসতো। স্ট্রাবো বলেন যে, তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র ব্যবহার করতো। তাদের বাড়ীর ছাদ, দেওয়াল ও দরজা হাতীর দাঁত, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মাণিক্য খচিত ছিল। প্লিনি বলেন, রোম ও পারস্যের ধন-সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত হতো। এ জাতি তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী ছিল এবং তাদের সুজলা-সুফলা দেশ, বাগ-বাগিচা, শস্যক্ষেত্র ও গৃহপালিত পশুতে পরিপূর্ণ ছিল। আর. টি. মিডোরাস বলেন, তারা ভোগবিলাসে বিভোর থাকতো এবং জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে দারুচিনি, চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধ কাঠ জ্বালাতো। এমনিভাবে অন্যান্য রোমীয় ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, তাদের অঞ্চলের নিকটস্থ সমুদ্রতীর ধরে বাণিজ্য জাহাজগুলো চলার সময় সে সব সুগন্ধ কাঠের ঘ্রাণ পাওয়া যেতো। ইতিহাসে তারাই প্রথম সান্আর উচ্চ মালভূমিতে গগণচুম্বী অট্টালিকা (Sky Scrapers) নির্মাণ করে যা কাস্রে গুমদান (গুমদান প্রাসাদ) নামে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, অট্টালিকাটি ছিল বিশতলা বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট।

যতোদিন আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ছিল ততোদিনই তাদের এ সুখের দিন ছিল। তারা যখন আল্লাহর দেয়া সম্পদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্নতা ও নিমকহারামির সীমালংঘন করে তখন শক্তিমান প্রভু আল্লাহ্ তাআলার কৃপাদৃষ্টি তাদের থেকে চিরদিনের জন্যে উঠে যায় এবং তাদের নাম-নিশানাও মিটে যায়।[৩৩১]
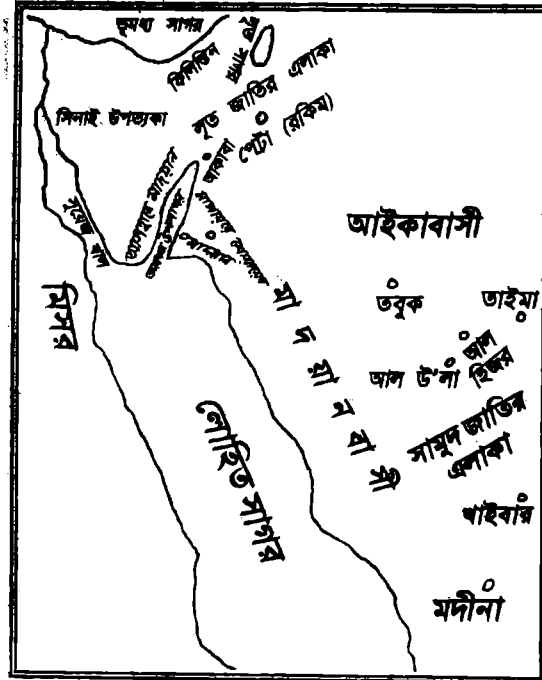
সামুদ জাতির এলাকা

আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ্

তাফসীরকারগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, আহলে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কাহ কি দুটি পৃথক জাতি, না একই জাতির দুটি পৃথক পৃথক নাম। একদলের অভিমত এই যে, এ দুটি আলাদা আলাদা জাতি এবং তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, সূরা আল আরাফে হযরত শুয়াইব (আ)-কে আহলে মাদইয়ানের ভাই বলা হয়েছে (وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا) এবং এখানে আসহাবে আয়কাহ-এর উল্লেখ প্রসংগে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ যখন শুয়াইব তাদেরকে বললেন। তাদের ভাই কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কতিপয় তাফসীরকার উভয়কে একই জাতি বলে অভিহিত করেন। কারণ সূরা আল আ'রাফে এবং হূদে আসহাবে মাদইয়ানের যেসব দোষত্রুটি ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাই এখানে আসহাবে আয়কাহ্-এর বেলায়ও বলা হচ্ছে। হযরত শুয়াইব (আ)-এর দাওয়াত ও নসীহত একই ধরনের এবং অবশেষে তাদের পরিণামেও কোনো পার্থক্য নেই।

ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান

তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে, উভয় উক্তিই ঠিক। আসহাবে মাদইয়ান এবং আসহাবে আয়কাহ্ নিঃসন্দেহে দুটি পৃথক গোত্র। কিন্তু একই বংশের দুটি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর দাসী কাতুরার গর্ভজাত ছিলেন, তারা আরব ও ইসরাইলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে অভিহিত হন। তাঁদের মধ্যে একটি অতিপ্রসিদ্ধ গোত্র মাদইয়ান বিন ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত বিধায় মিদইয়ানী অথবা আসহাবে মাদইয়ান বলে অভিহিত হয়। তাদের জনসংখ্যা উত্তর হেজাজ থেকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই উপত্যকার শেষাংশ পর্যন্ত আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগরের তটভূমির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। মাদইয়ান শহর ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং আবুল ফেদার মতে তা অবস্থিত ছিল আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীর আয়লা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচদিনের পথে। বনী কাতুরার বাকী অংশ উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক এবং আল্ উলার মধ্যবর্তীস্থানে বসতিস্থাপন করে। তাদের মধ্যে বনী দেদান (Dedanites) অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। তাবুক ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল, যাকে প্রচীনকালে আয়কাহ্ বলা হতো। (মু'জামুল বুলদানে আয়কাহ্ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ ছিল তবুকের প্রাচীন নাম এবং তবুকবাসীদের মধ্যে এ কথা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, কোনো এক সময়ে এ স্থানেই আয়কাহ্ বসবাস করতো।)

উভয় গোত্রের জন্যে একই নবী কেন ?

আসহাবে মাদইয়ান এবং আসহাবে আয়কার জন্যে একই নবী প্রেরণের কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, উভয়ে একই বংশোদ্ভূত ছিল। তারা একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের বসবাসের অঞ্চলগুলো পরস্পর মিলিত ছিল। এটাও হতে পারে যে, কোনো কোনো অঞ্চলে তারা একত্রেই বসবাস করতো এবং বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে তারা একই সমাজভুক্ত হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু বনী কাতুরার এসব শাখার লোকদের পেশা ছিল ব্যবসা এবং উভয়ের মধ্যে একই ধরনের দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে। একই ধরনের ধর্মীয় ও

নৈতিক ব্যাধিও তাদের মধ্যে ছিল। বাইবেলের আদি পুস্তকগুলোর স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে যে, তারা 'বা'লে ফাগুরের' পূজা করতো এবং বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে তাদের অঞ্চলে এলো তখন এদের মধ্যেও তারা শিরক ও ব্যভিচারের মহামারী ছড়িয়ে দেয়–(গণনাপুস্তক অধ্যায় ২৫ ঃ স্তোত্র ১-৫)। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের দুটি বড়ো রাজপথে তাদের বসতি ছিল। এ দুটি পথ চলে গিয়েছে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসর পর্যন্ত। এ দুটি রাজপথের উপরে তাদের বসতি অবস্থিত হওয়ার কারণে তারা ব্যাপক আকারে রাহাজানি ও লুটতরাজ করতো। ভিন্ন জাতির ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর নিকট থেকে মোটা অংকের খাজনা না নিয়ে যেতে দিত না। আন্তর্জাতিক ব্যবসার উপরে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তারা এ দুটি পথে নিরাপত্তা বিপন্ন করে রেখেছিল। কুরআন মজিদে তাদের অবস্থা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ এ দুটি জাতি (লূত ও আয়কাহ্‌বাসী) উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থান করতো। তাদের রাহাজানির উল্লেখ সূরা আল আ'রাফে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ প্রতিটি পথে-ঘাটে মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে বসে থেকো না। এসব কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এ দুগোত্রের জন্যে একই নবী পাঠান এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষাদান করেন।৩৩২

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ[১]

মাদইয়ানের প্রকৃত আবাসস্থল হেজাজের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর এবং আকাবা উপসাগরের তটভূমিতে অবস্থিত ছিল, যদিও সিনাই উপত্যকার পূর্ব তীরেও তাদের কিছু বসতি ছড়িয়ে ছিল। তারা ছিল একটি ব্যবসাজীবী জাতি। প্রাচীনকালে যে বাণিজ্যিক রাজপথ লোহিত সাগরের তীরে তীরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত যেতো এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক রাজপথ ইরাক থেকে মিসর যেতো, এ দুটি রাজপথের মোহনায় এ জাতির বসতি ছিল। এর ভিত্তিতেই আরবের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাদের সম্পর্কে অবগত ছিল। তারা নির্মূল হওয়ার পরও তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিল। কারণ আরববাসীদের বাণিজ্য কাফেলা মিসর ও সিরিয়া যাবার পথে রাতদিন তাদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করেই যেতো।

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা যা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তাহলো এই যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তৃতীয়া বিবি কাতুরার গর্ভজাত পুত্র মিদ্‌ইয়ানের বংশধর ছিল। প্রাচীনকালের প্রথা অনুযায়ী যারা কোনো মহান লোকের সাথে বংশীয় সম্পর্ক রাখতো তাদেরকে বনী অমকু বলা হতো। এ প্রথা অনুযায়ী আরবের অধিকসংখ্যক অধিবাসীকে বনী ইসমাঈল বলা হতো। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী সকলে বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়। এভাবে মাদ্‌ইয়ান অঞ্চলের সকল অধিবাসী যারা মিদ্‌ইয়ান বিন ইবরাহীম (আ)-এর প্রভাবাধীন ছিল বনী মিদ্‌ইয়ান নামে অভিহিত এবং তাদের দেশের নাম মাদ্‌ইয়ান অথবা মিদইয়ান হয়ে পড়ে।

---

১. যেহেতু এটি ছিল একটি বৃহত্তর গোত্র এবং কুরআন হযরত শুয়াইব (আ)-কে তাদের অতি নিকট সম্পর্কের লোক বলে উল্লেখ করেছে, সে জন্যে তাদের সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।–সংকলকদ্বয়

এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানার পর এ ধারণা করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না যে, এ জাতিকে দীনে হকের দাওয়াত সর্বপ্রথম হযরত শুয়াইব (আ) পৌছিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বনী ইসরাইলের মতো সূচনাতে তারাও মুসলমান ছিল এবং হযরত শুয়াইব (আ)-এর আবির্ভাবের সময় তাদের অবস্থা ছিল একটা অধঃপতিত জাতির ন্যায়, যেমন হযরত মূসা (আ)-এর আবির্ভাবের সময় বনী ইসরাঈলের অবস্থা ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর ছ' সাতশ' বছর পর্যন্ত মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতির মধ্যে বসবাস করতে করতে তারা শিরকের রোগে আক্রান্ত হয় এবং চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত হয়। এর পরেও ঈমানের দাবী ও তার উপর তাদের গর্ব অক্ষুণ্ন ছিল।[৩৩৩]

সংস্কার সংশোধনের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝ الاعراف : ٩٠

"জাতির সরদারগণ যারা তাঁর [শুয়াইব (আ)] কথা মানতে অস্বীকার করেছিল— পরস্পর বলাবলি করতো, তোমরা যদি শুয়াইবের আনুগত্য কর, তাহলে বরবাদ হয়ে যাবে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৯০

হযরত শুয়াইব (আ) সংস্কার সংশোধনের যে দাওয়াত পেশ করেছিলেন তার জবাবে মাদ্ইয়ানের সরদার ও নেতাগণ বলতো এবং জাতিকে এ কথার নিশ্চয়তা দান করতো, শুয়াইব (আ) যে ধরনের ঈমানদারি ও সততার দাওয়াত দিচ্ছেন এবং চরিত্র ও বিশ্বস্ততার যে শাশ্বত নীতি মেনে চলতে বলছেন তা যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চলবে যদি আমরা সততার অনুসরণ করি ও খাঁটিভাবে কেনা-বেচা করি ? আমরা দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যবসার রাজপথের মোহনায় বাস করি এবং মিসর ও ইরাকের মতো দুটি বিরাট সভ্যতামণ্ডিত রাজ্যের সীমান্তে অবস্থান করি। যদি আমরা বাণিজ্য কাফেলাগুলোকে বেকায়দায় ফেলা বন্ধ করে দেই এবং নিজেরা ভালো মানুষের মতো শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই তাহলে বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমরা যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করছি তা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোর উপর আমাদের যে প্রতিপত্তি রয়েছে তাও থাকবে না।

একথা ও দৃষ্টিভংগী শুধু শুয়াইব (আ)-এর জাতির সরদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক যুগেই পথভ্রষ্ট লোকেরা হক, সততা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে এ ধরনেরই আশংকা অনুভব করেছে। প্রত্যেক যুগের দুষ্কৃতিকারীগণের এ ধারণাই ছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য দুনিয়াবী ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ড বেঈমানী ও দুর্নীতি ছাড়া চলতে পারে না। প্রত্যেক স্থানেই দাওয়াতে হকের মুকাবিলায় যে ওযর আপত্তি পেশ করা হয়েছে সে সবের মধ্যে এও একটি যে, দুনিয়ার প্রচলিত পথ ও পন্থা থেকে সরে গিয়ে যদি দাওয়াতে হকের অনুসরণ করা হয় তাহলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৩৪]

মাদইয়ানবাসীর উপর আযাব

মাদইয়ানবাসীর উপর ভয়ানক বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের (رجفه) আকারে শাস্তি নেমে এসেছিল। তাদের এ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল ধরে পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। গীতসংহিতার এক স্থানে আছে, হে খোদা! অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে

শপথ গ্রহণ করেছে। অতএব তুমি তাদের সাথে সেই আচরণই কর যা তুমি মিদইয়ানের সাথে করেছো-(৮৩ ঃ ৫-৯)। ইয়াহ্ইয়া নবী এক স্থানে ইসরাঈলীদেরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, আশিরিয়দেরকে ভয় করো না। যদিও তারা তোমাদের জন্যে মিসরীদের মতোই জালেম হয়ে পড়ছে, কিন্তু সত্বরই সকল সৈন্যের প্রভু তাদের উপর তাঁর চাবুক মারবেন এবং তাদের পরিণতি তাই হবে, যা হয়েছিল মিদইয়ানদের।

-যিশাইয় ১০ ঃ ২১-২৬)[৩৩৫]

আয়কাহ্ বাসীদের উপর আযাব

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ الشعراء : ١٨٩

"তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছিল। অবশেষে ছাতা বিশিষ্ট দিনের আযাব তাদের উপর এসে পড়লো। আর সে ছিল এক ভয়ংকর দিনের আযাব।"-সূরা শুয়ারা ঃ ১৮৯

তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার কোনো বিবরণ কুরআনে অথবা সহীহ্ হাদীসে পাওয়া যায় না। বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে যা বুঝতে পারা যায় তাহলো এই যে, যেহেতু তারা আসমানী আযাব চেয়েছিল, সে সেজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপরে একটি মেঘ পাঠিয়ে দেন যে, তাদের উপর ছাতার মতো ছায়া দান করতে থাকে—যতোক্ষণ না আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কুরআন থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় যে, মাদইয়ানবাসীদের আযাবের ধরন আয়কাহ্বাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিল। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে ছাতাওয়ালা আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হয় এবং তাদের উপর আযাব এসেছিল বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের আকারে। এজন্যে এ দুটিকে মিলিয়ে একটি কাহিনী রচনা করার প্রচেষ্টা সঠিক নয়। কোনো কোনো তাফসীরকার 'ছাতাওয়ালা দিনের আযাবের' কিছু ব্যাখ্যা দান করেছেন। কিন্তু আমরা জানি না তাঁদের এ জ্ঞানের উৎস কি। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন–

من حدثك من العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذبه ـ

ছাতাওয়ালা দিনের আযাব কি ছিল, তা যদি আলেমদের মধ্যে কেউ বলে, তাহলে তাকে সঠিক মনে করো না।[৩৩৬]

হযরত ইউনুস (আ)-এর জাতি

হযরত ইউনুস (আ)-এর জীবনকাহিনী

বাইবেলে হযরত ইউনুস (আ)-কে ইউনাহ্ বলা হয়েছে এবং তাঁর জীবনকাল ৮৬০-৭৮৪ খৃষ্টপূর্ব।

হযরত ইউনুস (আ)[১] যদিও ইসরাঈলী ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আশিরিয়দের হেদায়াতের জন্যে ইরাকে পাঠানো হয়। সে জন্যে আশিরিয়দেরকে ইউনুসের জাতি বলা হয়েছে। সে কালে এ জাতির কেন্দ্রীয় আবাসস্থল ছিল বিখ্যাত শহর নিম্‌ওয়া। যার বহু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায় দাজলা নদীর পূর্বতীরস্থ মুসেল নগরের ঠিক বিপরীত দিকে। এ অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থানও বিদ্যমান আছে। এ জাতি কতখানি সমৃদ্ধ ছিল তা এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তাদের রাজধানী নিম্‌ওয়া প্রায় ষাট বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

কুরআন ও বাইবেলে ইউনুস (আ)-এর উল্লেখ

কুরআনে শুধু চার স্থানে এ কাহিনীর ইংগিত করা হয়েছে। কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। এ জন্যে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, কোন্ বিশেষ কারণে এ জাতিকে আল্লাহর এ আইনের উর্ধে রাখা হয়েছিল যে, আযাব নাযিলের সিদ্ধান্তের পর কারো ঈমান তার জন্যে ফলপ্রদ হয় না। বাইবেলে 'ইউনাহ্' নামে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা (আসমানী পুস্তক) রয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ তাকে আসমানী গ্রন্থ বলা যায় না এবং তা ইউনুস (আ)-এর স্বহস্তে লিখিতও নয়। বরঞ্চ তাঁর চার পাঁচশত বছর পরে কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস বলে তা লিপিবদ্ধ করে বাইবেলে সন্নিবেশিত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এমন কিছু আজে-বাজে কথা রয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তথাপি কুরআনের ইংগিতসমূহ এবং 'সহীফায়ে ইউনুসে'র বিবরণ থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয় যা তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন। তাহলো এই যে হযরত ইউনুস (আ) যেহেতু আযাবের সংবাদ প্রাপ্তির পর আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে আপন কর্মস্থল পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।[২] সে জন্যে আযাব দেখার পর যখন আশিরিয়গণ তওবা-ইস্তেগ্‌ফার করলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন।[৩]

কুরআন পাকে খোদার আইনের যে মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্থায়ী ধারা এই যে, আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ততোক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেন না

---

১. কুরআনে কোথাও নাম নেয়া হয়েছে এবং কোথাও 'যুন্নুন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হুত্' বা মাছওয়ালা বলা হয়েছে। মাছওয়ালা এ জন্যে বলা হয়নি যে, তিনি মাছ ধরতেন বা মাছের ব্যবসা করতেন, বরঞ্চ এ জন্যে যে, আল্লাহর নির্দেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল।–সূরা আস সাফ্ফাত ৪২ আয়াত দ্রঃ

২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরত করার নির্দেশ আশার পূর্বেই তিনি তাঁর জাতির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। নির্দেশ আসার পর কর্মস্থল ত্যাগ করলে তা জায়েয হতো।৩৩৭

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে তাফ্হীমুল কুরআন, সূরা আস সাফ্ফাত টীকা ৮৫ দ্রষ্টব্য। এতে অনেক অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে।

যতোক্ষণ না তাঁর শর্ত পূরণ হয়েছে। অতএব নবী যখন সে জাতিকে প্রদত্ত অবকাশের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর উপদেশদানের ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখলেন না এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন ইচ্ছামত হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার সুবিচার সে জাতিকে শাস্তি দেয়া পছন্দ করলো না। কারণ সে জাতির উপর 'ইত্মামে হুজ্জত বা আইনগত শর্তগুলো পূরণ হয়েছিল না।

হযরত ইউনুস (আ)-এর জাতির সর্বশেষ ধ্বংস

এ জাতি ঈমান আনার পর তাদের জীবন অবকাশ বর্ধিত করা হয়। অতপর চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে তারা পুনরায় গোমরাহিতে লিপ্ত হয়। নাহুম নবী-(৭২০-৬৯৮) খৃষ্টপূর্বে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। তারপর সাফ্নিয়া নবী-(৬৪০-৬০৯ খৃষ্টপূর্ব) তাদেরকে শেষবারের মতো সাবধান করে দেন। তাও নিষ্ফল হয়। অবশেষে ৬০২ খৃষ্টপূর্ব নাগাদ আল্লাহ্ তাআলা মিডিয়াবাসীদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন। মিডিয়ার বাদশাহ্ বেবিলনবাসীদের সহায়তায় আশিরিয়দের উপর আক্রমণ চালায়। আশিরিয় সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে নিম্ওয়াতে অবরুদ্ধ হয়। কিছুকাল যাবত তারা মুকাবেলা করতে থাকে। তারপর দাজলার জলোচ্ছ্বাসে নগর প্রাচীর ভেঙে যায় এবং আক্রমণকারীরা ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর আগুন জ্বালিয়ে গোটা শহর ধ্বংস করা হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। আশিরিয়দের বাদশাহ্ আপন রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার সাথে সাথে আশিরিয় রাজ্য ও সভ্যতা চিরদিনের জন্যে নির্মূল হয়ে যায়। বর্তমানকালে সে অঞ্চলে যে প্রত্নতাত্তিক খোদাই কার্য করা হয় তাতে বহু অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত নিদর্শন পাওয়া যায়।৩৩৮

বনী ইসরাঈল

ইবরাহীম (আ)-এর বংশের দুটি শাখা

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকে দুটি বৃহৎ শাখা উদ্ভূত হয়। একটি শাখায় জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ। যারা আরবে বসতিস্থাপন করে। কুরাইশ এবং আরবের কিছু অন্যান্য উপজাতি ছিল এ শাখাসম্ভূত। যে সকল আরব উপজাতি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ছিল না, তারাও যেহেতু তাঁর প্রচারিত দ্বীনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সে জন্যে তারাও নিজেদেরকে তাঁর সাথেই সম্পর্ক যুক্ত করতো।

দ্বিতীয় শাখাটি হযরত ইসহাক (আ) থেকে উদ্ভূত। এ শাখায় জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইয়াকুব (আ), ইউসুফ (আ), মূসা (আ), দাউদ (আ), সুলায়মান (আ), এহিয়া (আ), ঈসা (আ) এবং অন্যান্য বহু নবী। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নাম যেহেতু ইসরাঈল ছিল, সেজন্যে এ বংশটি বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়। তাঁর তাবলীগের ফলে অন্যান্য যেসব জাতি তাঁর দ্বীন কবুল করে তারা হয়তো স্বকীয়তা তাদের মধ্যে একাকার করে ফেলে, অথবা বংশের দিক দিয়ে পৃথক হলেও ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের অনুগত হয়ে পড়ে। এ শাখাটি যখন লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের শিকার হয় তখন তাদের মধ্যে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ জন্মগ্রহণ করে।[৩৩৯]

সূরা আল মায়েদার ২০ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলের অতীত প্রভাব প্রতিপত্তির দিকে ইংগিত করেন। তাদের এ প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ছিল হযরত মূসা (আ)-এর বহু পূর্বে। একদিকে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ)-এর মতো মহান নবীগণ এ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপরদিকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে এবং তাঁর পরে মিসরে তাদের বিরাট শাসন কর্তৃত্ব লাভের সৌভাগ্য হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা তৎকালীন সভ্যতামণ্ডিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিল। চারপাশে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজ করতো। সাধারণত মানুষ বনী ইসরাঈলের উন্নতির ইতিহাস হযরত মূসা (আ) থেকে শুরু করে। কিন্তু কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে যে, বনী ইসরাঈলের উন্নতির যুগ হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেই অতীত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) তাকেই অপন জাতির অতীত ঐতিহ্য হিসেবে পেশ করতেন।[৩৪০]

ফিলিস্তিনে নিকৃষ্ট ধরনের শিরকের যুগ

হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করতো। যেমন হাত্তা, আম্মোরী, কেন্আনী, বিউসী, ফিলিস্তী প্রভৃতি। তাদের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ধরনের শির্ক প্রচলিত ছিল। তাদের সর্ববৃহৎ দেবতার নাম ছিল 'ঈল্' যাকে দেবতাদের পিতা বলা হতো। তাকে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করা হতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল 'আশীরা', তাদের থেকে দেব-দেবীর এক বিরাট বংশ বিস্তার লাভ করে, যাদের সংখ্যা সত্তর পর্যন্ত পৌঁছে। তাদের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল 'বা'ল' (بعل) যাকে বৃষ্টির ও তৃণশস্যের পুষ্টিসাধনকারী খোদা এবং আসমান-যমীনের

হযরত মূসার (আ) পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইস্রাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইস্রাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামঊন, বনু দান, বনু বিন্‌ইয়ামিন, বনু আফরায়াম, বনু রূবন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাস্‌সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের—এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল। আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দূরার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, আরমক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হইত—যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।

হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন

মালিক মনে করা হতো। উত্তরাঞ্চলে তার স্ত্রী উনাস নামে অভিহিত ছিল এবং ফিলিস্তিনে তাকে বলা হতো গেস্তারাতা। এ দুটি নামের স্ত্রী লোক প্রেমপ্রণয় ও বংশবৃদ্ধির খোদা ছিল। তাছাড়া কোনো দেবতা ছিল মৃত্যুর মালিক। কারো হাতে স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব ছিল। কোনো দেবতাকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এভাবে সমগ্র খোদায়ী বহু খোদার মধ্যে বন্টন করা ছিল। এসব দেব-দেবীর প্রতি এমন সব ঘৃণ্য বিশেষণ ও কর্মকাণ্ড আরোপ করা হতো যে, নৈতিক দিক থেকে অতি চরিত্রহীন লোকও তাদের সথে পরিচিত হতে পছন্দ করতো না। এখন একথা পরিষ্কার যে, যারা এ ধরনের অশ্লীল ও ইতর সত্তাগুলোকে খোদা বানিয়ে তাদের পূজা করে তারা নৈতিকতার ঘৃণ্যতম স্তরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে কি করে বাঁচতে পারে ? এই হলো কারণ যে তাদের যে অবস্থা প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা চরম চারিত্রিক অধঃপতনের সাক্ষ্যদান করে। তাদের সমাজে শিশু কুরবানি করার প্রথা ছিল। তাদের উপাসনাগারগুলো ব্যভিচারের আড্ডা ছিল। নারীদেরকে দেবদাসী (Religious Prostitutes) বানিয়ে উপাসনালয়ে রাখা এবং তাদের সাথে ব্যভিচার করা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করা হতো। এ ধরনের আরও বহু প্রকারের চরিত্রহীনতা তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল।

বনী ইসরাঈলের নৈতিক অধঃপতনের কারণ

তাওরাতে মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে যে হেদায়েত দেয়া হয়েছিল তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, এ পৌত্তলিক জাতিগুলোর হাত থেকে ফিলিস্তিন কেড়ে নিতে হবে, তাদের সাথে একত্রে বসবাস ও মেলামেশা করা থেকে এবং তাদের নৈতিক ও ধারণা বিশ্বাসের অমংগলকারিতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন তারা উপরোক্ত হেদায়াত ভুলে যায়। তারা তাদের কোনো অখণ্ড রাজ্য কায়েম করেনি। তারা ছিল উপজাতীয় গোঁড়ামিতে লিপ্ত। তাদের প্রত্যেক গোত্র বিজিত অঞ্চলের একটা করে অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়াটাই পছন্দ করে। এভাবে পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের কোনো গোত্রই এতোটা শক্তিশালী হতে পারেনি যে. নিজেদের এলাকা মুশরিকদের থেকে পুরোপুরি পবিত্র করে ফেলবে। অবশেষে তাদের সাথে মুশরিকদের বসবাস করাকে তারা মেনে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের বিজিত অঞ্চলগুলোর স্থানে স্থানে এসব মুশরিক জাতির ছোটো ছোটো নগর রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল ইসরাঈলীরা যাদেরকে আয়ত্তে আনতে পারেনি। এ অভিযোগই যবুর গ্রন্থে করা হয়েছে।*

---

* হযরত দাউদ (আ)-এর মুখে এরূপ অভিযোগ করা হয় ঃ

খোদার নির্দেশ অনুযায়ী তারা ঐসব জাতিকে ধ্বংস করেনি বরঞ্চ তাদের সাথে মিশে গেল, তাদের কুকর্ম শিক্ষা করলো, তাদের দেবতার পূজা করতে লাগলো–যা তাদের গলার ফাঁস হয়ে গেল। তারা তাদের কন্যাদেরকে শয়তানের জন্যে কুরবানি করলো। আর তারা তাদের নিষ্পাপ পুত্র-কন্যার রক্ত প্রবাহিত করলো .... এ জন্যে খোদার গযব তাদের উপর পড়লো, নিজেদের উত্তরাধিকারের প্রতি ঘৃণা হলো এবং তারা তা ঐসব জাতির অধিকারে ছেড়ে দিল এবং তাদের শত্রু তাদের শাসক হলো।–যবুর, অধ্যায় ১০৬, স্তোত্র ৩৪-৪১।

প্রায়শ্চিত্ত

এর প্রথম প্রায়শ্চিত্ত যা ইসরাঈলীদেরকে ভোগ করতে হয়, তাহলো এই যে, এসব জাতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করে এবং তার সাথে অন্যান্য নৈতিক ব্যধিগুলোরও পথ পরিষ্কার হয়। বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এভাবে অভিযোগ করা হয়েছে এবং বনী ইসরাঈল খোদার সামনে পাপ করে এবং বা'লীমের পূজা করতে শুরু করে এবং তাদের বাপ-দাদার যে খোদা তাদেরকে মিসর থেকে বের করে আনেন, তাঁকে তারা পরিত্যাগ করে এবং তাদের পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোর দেবতাদেরকে সেজদা করতে থাকে এবং খোদাকে রাগান্বিত করে। তারা খোদাকে পরিত্যাগ করে বা'ল ও গেস্তারিয়াতের পূজা করতে থাকে এবং খোদার রোষবহ্নি বনী ইসরাঈলের উপর পড়ে।-অধ্যায় ২ ঃ স্তোত্র ১১-১৩

দ্বিতীয় যে প্রায়শ্চিত্ত তাদের ভোগ করতে হয় তাহলো এই যে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্রকে তারা স্বাধীন থাকতে দিয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তিনীগণ—যাদের গোটা অঞ্চল বিজিত ছিল না—একত্রে মিলিত হয়ে ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে একটা জোট গঠন করে। তারপর তারা বার বার আক্রমণ চালিয়ে ফিলিস্তিনের বৃহৎ অংশ থেকে তাদেরকে বেদখল করে দেয়। এমন কি তাদের কাছ থেকে খোদার শপথনামার সিন্দুকও (তাবুত) কেড়ে নেয়। অবশেষে ইসরাঈলীগণ একজন শাসকের অধীনে একটা যুক্তরাজ্য কায়েমের প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের আবেদনে সামুয়েল নবী (১০২০-খৃঃ পূঃ) তালুতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দেন। (এর বিবরণ সূরা বাকারায় ৩২ রুকূ'তে দেয়া হয়েছে।)

মংগল ও কল্যাণের যুগ

এ যুক্তরাজ্যের তিনজন শাসক ছিলেন। তালূত (১০২০-১০০৪ খৃস্ট পূর্ব), হযরত দাউদ (আ) (১০০৪-৯৬৫ খৃস্ট পূর্ব) এবং হযরত সুলাইমান (আ) (৯৬৫-৯২৬ খৃস্ট পূর্ব)। এ শাসকগণ সেসব কাজ সম্পন্ন করেন যা বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-এর পরে অসম্পন্ন রেখেছিল। শুধু উত্তরে সমুদ্র তীরে ফিনিকীয়দের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র তীরে ফিলিস্তিদের রাজ্য অক্ষুণ্ন ছিল। এগুলো জয় করা যায়নি, তাদেরকে করদমিত্রে পরিণত করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল।

অরাজকতা ও সংকট যুগ

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পর বনী ইসরাঈল পুনরায় দুনিয়ার লোভ লালসায় মগ্ন হয়ে পড়ে। পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ করে দুটি পৃথক রাজ্য কায়েম করে। উত্তর ফিলিস্তিন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈলীদের যে রাজ্য হলো—তার রাজধানী সামিরিয়া এবং দক্ষিণ ফিলিস্তিন ও আদুমে প্রতিষ্ঠিত ইয়াহুদিয়া রাজ্যের রাজধানী হলো জেরুশালেম। এ দুটি রাজ্যের মধ্যে প্রথম দিন থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চলে। ইসরাঈলী রাজ্যের শাসক ও অধিবাসীবৃন্দ সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ে প্রতিবেশী জাতিসমূহের মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক অনাচার দ্বারা। এ অবস্থা চরমে পৌছে যখন শাসক আখিআব সাইদার মুশরিক শাহজাদী ইজবেলকে বিবাহ করে। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও তার যাবতীয় উপায় উপাদানের সাহায্যে শিরক ও চরিত্রহীনতা ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রবল বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হযরত ইলিয়াস (আ) এবং হযরত আল ইয়াসা (আ) এ বন্যা প্রতিরোধে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এ জাতি যে অধঃপতনের দিকে ছুটেছিল, তা থেকে নিবৃত্ত হলো না। অবশেষে আল্লাহর গজব আশিরিয়দের আকারে ইসরাঈলী রাজ্যের উপর পড়ে এবং খৃস্ট পূর্ব নবম শতাব্দী থেকে
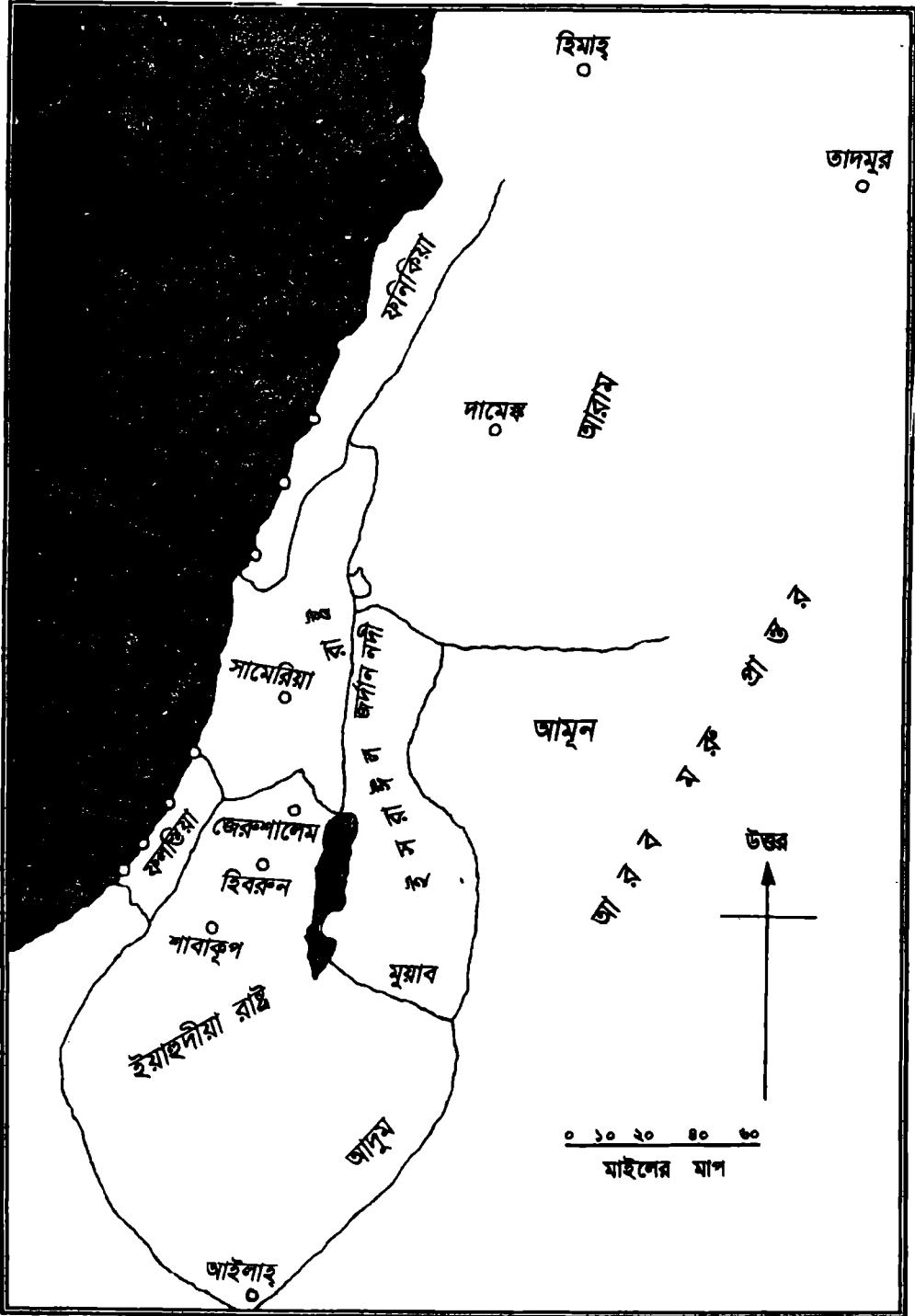
বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃষ্টপূর্ব ৮৬০)
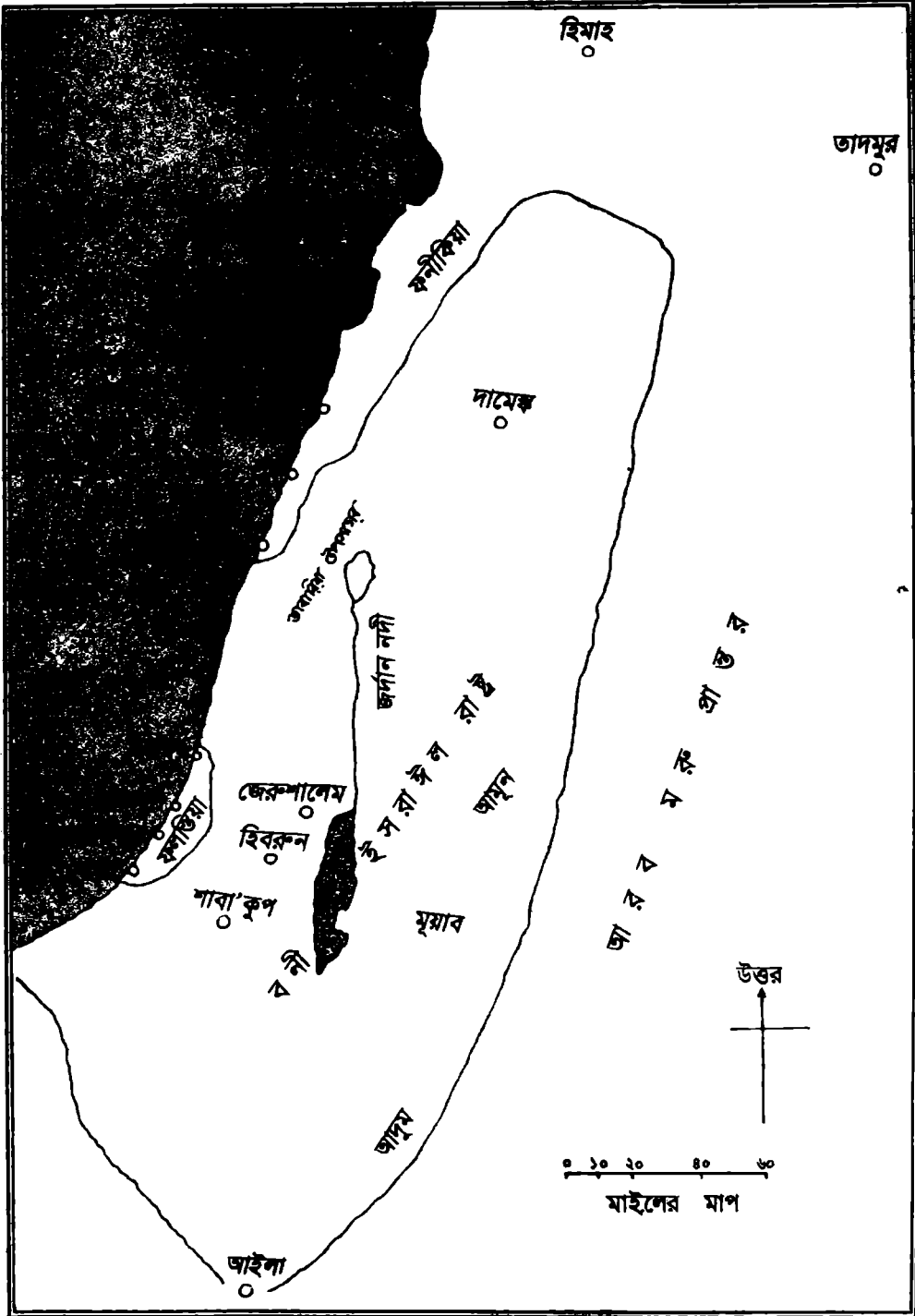
হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সাম্রাজ্য (১০০০–৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)

ক্রমাগত আশিরিয়দের আক্রমণ চলতে থাকে। এ যুগে আমুস নবী (৭৮৭-৭৪৭ খৃঃ পূঃ) এবং তারপর হোসি নবী (৭৪৭-৭৩৫ খৃঃ পূঃ) ইসরাঈলীদেরকে বার বার সাবধান করে দেন। কিন্তু তারা এমন অবহেলা-অমনোযোগিতায় মগ্ন ছিল যে, সতর্কবাণীর উল্টো ফল হলো। অবশেষে ইসরাঈলী শাসক আমুস নবীকে দেশ থেকে বের হয়ে যাবার এবং সামেরিয়া রাজ্যের মধ্যে নবুওয়তের কাজ বন্ধ করে দেয়ার নোটিশ দান করে। তারপর বেশীদিন যেতে না যেতেই ইসরাঈলী রাজ্য এবং তার অধিবাসীদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে। ৭২১ খৃস্ট পূর্বে আশিরিয়দের দুর্দান্ত শাসক সারগুণ সামেরিয়া জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের অবসান ঘটায়, হাজার হাজার ইসরাঈলীকে হত্যা করা হয়। সাতাশ হাজারেরও অধিক প্রভাবশালী ইসরাঈলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে আশিরিয় রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। অন্য জাতীয় লোককে বাইরে থেকে এনে ইসরাঈলী অঞ্চলে পুনর্বাসিত করে। ইসরাঈলীদের মুষ্টিমেয় যারা রয়ে গিয়েছিল, তারা নবাগতদের সাথে একত্রে বসবাস করতে করতে আপন জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ভুলে গেল।

বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় রাষ্ট্র যা ইয়াহুদিয়া নামে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে কায়েম হয়েছিল তাও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পরে অতিসত্বর শির্‌ক ও চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের অধঃপতনের গতি ইসরাঈলী রাজ্য থেকে মন্থর ছিল। এ জন্যে তাদেরকে কিছু অধিক অবকাশ দেয়া হয়। যদিও ইসরাঈলী রাজ্যের ন্যায় আশিরিয়গণ বার বার তাদের উপরও আক্রমণ চালায়, তাদের শহরগুলো ধ্বংস করে, তাদের রাজধানী অবরোধ করে, কিন্তু তথাপি এ রাষ্ট্র আশিরিয়দের হাতে ধ্বংস হয়নি। শুধু করদমিত্র হিসেবে টিকে থাকে। অতপর যখন হযরত ইয়াসইয়া এবং হযরত ইয়ারমিয়ার ক্রমাগত চেষ্টার পরেও ইয়াহুদিয়ার অধিবাসী প্রতিমা পূজা এবং চরিত্রহীনতা থেকে নিবৃত্ত হলো না, তখন ৫৯৮ খৃস্টপূর্বে বেবিলনের বাদশাহ বখত্ নসর জেরুশালেম সহ গোটা ইয়াহুদিয়া রাজ্য অধিকার করে নেয় এবং ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ বন্দী হয়। এতে করেও তাদের দুষ্কর্ম শেষ হয় না। হযরত ইয়ারমিয়ার নসিহত সত্ত্বেও তারা তাদের চরিত্রের সংশোধন করার পরিবর্তে বেবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অবশেষে ৫৮৭ খৃস্ট পূর্বে বখত নসর অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোট বড়ো সকল শহর ধ্বংস করে দেয়। জেরুশালেম এবং হায়কালে সুলায়মানী এমনভাবে ধূলিসাৎ করে দেয় যে, তার কোনো একটি দেওয়ালও অবশিষ্ট থাকেনি। বহুসংখ্যক ইহুদীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যারা রয়ে গেল তারাও প্রতিবেশী জাতিসমূহের হাতে লাঞ্ছিত ও পদানত হয়ে থাকলো।[৩৪১]

বেবিলনের অধীনে বন্দী জীবন যাপনকালে বনী ইসরাঈলের ভূমিকা

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَاهُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"এবং শয়তান সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে যেসব পেশ করছিল, সেসব তারা মানতে লাগলো। অথচ সুলায়মান কখনো কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরী করছিল এ শয়তানরা যারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিচ্ছিল। বাবেলের (বেবিলন) হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছিল, তারা তার প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিস শিক্ষা দিত তখন তারা স্পষ্ট করে সতর্ক করে দিত যে, দেখ আমরা কিন্তু নিছক একটা পরীক্ষামাত্র। তোমরা কুফরীতে মগ্ন হয়ো না। তা সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদের নিকট থেকে সে জিনিসই শিখছিল যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এ উপায়ে তারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু তথাপি তারা এমন জিনিস শিক্ষা করতো যা তাদের জন্যে কল্যাণকর ছিল না, বরঞ্চ ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালোভাবেই জানতো যে, যারা এ জিনিসের খরিদ্দার হবে তার জন্যে আখেরাতে কল্যাণের কোনো অংশ নেই। তারা যে জিনেসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রি করছে, তা কত নিকৃষ্ট। হায়! তারা যদি এটা জানতে পারতো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০২

শয়তান বলতে জ্বিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান উভয়কেই বুঝায়। এখানে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। যখন ইসরাঈলীদের নৈতিক এবং বৈষয়িক অধঃপতনের যুগ এলো, গোলামি, অজ্ঞতা, দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদের মধ্যে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প অবশিষ্ট রাখলো না। তখন তাদের মনোযোগ যাদু-টোনা, তেলেস্মাৎ, আমালিয়াত ও তাবিজ-তুমারের দিকে আকৃষ্ট হলো। তারা এমন সব পন্থা-পদ্ধতি তালাশ করতে লাগলো যার দ্বারা কোনো পরিশ্রম অথবা চেষ্টা চরিত্র ব্যতিরেকে শুধু ফুঁক এবং মন্ত্রতন্ত্রের বলে সকল কাজ সমাধা করা যেতে পারে। সে সময় শয়তান তাদেরকে এভাবে প্রতারিত করতে থাকে যে, সুলায়মান (আ)-এর বিরাট বিশাল রাজ্য ও তাঁর বিস্ময়কর শক্তিমত্তা তো সবই কিছু নক্শা ও মন্ত্রেরই ফল ছিল। আর সেসব আমরা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তারা এসবকে অপ্রত্যাশিত নিয়ামত মনে করে এসবের প্রতি উন্মত্ত হয়ে পড়ে। অতপর না আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ অনুরাগ রইলো, আর না সত্যের আহ্বানকারীর কোনো আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছলো।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি করা হয়েছে। কিন্তু আমি যা বুঝতে পেরেছি, তাহলো এই যে, যে সময়ে ইসরাঈলীদের গোটা জাতি বেবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের পরীক্ষার জন্যে দুজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। যেভাবে লূত জাতির নিকটে ফেরেশতারা সুদর্শন বালকের আকৃতিতে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এসব ইসরাঈলীদের নিকটে এ দুজন ফেরেশতা পীর-ফকীরের আকৃতিতে গিয়ে থাকবেন। ওখানে একদিকে তাঁরা যাদুর বাজার খুলে বসলেন এবং অন্যদিকে চূড়ান্ত দলীল প্রমাণস্বরূপ তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলতেন, দেখ, আমরা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্যে এসেছি। তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদের পেশ করা আমালিয়াত ও তাবিজ তুমার গ্রহণ করার জন্যে পাগল হয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতি ধারণ করে কাজ করাতে কারো আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। তাঁরা আল্লাহ তাআলার বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যে সময়ে যে পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় তা তাঁরা করতে পারেন। এ

সময়ে আমাদের চার পাশে কত ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে কাজ করে যাচ্ছেন, তার কতটা খবরই বা আমরা রাখি। তবে হাঁ, ফেরেশতাদের এমন এক জিনিস শিক্ষা দেয়া যা মূলতই খারাপ, তার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ধরুন, পুলিশের উর্দি না পরা কোনো সিপাই কোনো ঘুষখোর কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা নোট ঘুষ হিসাবে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো–এ অপরাধ করার সময় তাকে হাতেনাতে ধরা হবে এবং তারপর তার নির্দোষিতার কোনো সাফাই পেশ করার আর কোনো অবকাশই থাকবে না।

তখনকার দিনে লোকের মধ্যে যে জিনিসের সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল তাহলো আমালিয়াত ও তাবিজ-তুমার, যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য কারো স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি প্রণয়াসক্ত করে ফেলতো। এ ছিল নৈতিক অধঃপতনের নিম্নতম স্তর, যেখানে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। একটি জাতির লোকের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস যদি এই হয় যে, তারা পরস্ত্রীকে ভুলাবার চেষ্টা করবে, কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং এ কাজকেই তারা তাদের জন্যে বিরাট বিজয় মনে করবে, তাহলে এর চেয়ে অধিকতর নৈতিক অধঃপতন আর কি হতে পারে ?

দাম্পত্য সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার ভিত্তি। নারী পুরুষের সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সঠিক হলে মানব সভ্যতা সুষ্ঠু ও সঠিক হবে। পক্ষান্তরে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে ফাটল ধরলে মানব সভ্যতাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম দুষ্কৃতিকারী ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী যে এমন বৃক্ষের উপর কুঠারাঘাত করে, যার সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার উপরে তাঁর নিজের এবং গোটা সমাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। হাদীসে আছে, ইবলিস তার কেন্দ্রীয় কর্মস্থল থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের জন্যে তার প্রতিনিধি পাঠায়। তারপর সেসব প্রতিনিধি ফিরে গিয়ে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। কেউ বলে, আমি অমুক ফেৎনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে, আমি অমুক পাপাচার চালু করেছি। কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককেই বলে, তুমি কিছুই করনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। একথা শুনে ইবলিস তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে বলে, তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ।

এ হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়, বনী ইসরাঈলের পরীক্ষার জন্যে যে ফেরেশতা পাঠানো হয় তাদেরকে কেন এ আদেশ করা হয়েছিল যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির আমল যেন তারা তাদেরকে শিক্ষা দেয়।[৩৪২]

পুনর্জাগরণের যুগ

সামেরীয় এবং ইসরাঈলীগণ নৈতিক ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যে অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছিল সেখান থেকে তারা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়াবাসীদের মধ্যে যারা টিকে ছিল তাদের মধ্যে এমন একজন ছিল যে কল্যাণের উপরে কায়েম থেকে কল্যাণের আহ্বানকারী ছিল। অবশিষ্ট ইয়াহুদিয়াদের মধ্যে সে সংস্কার সংশোধনের কাজ করতে থাকে। বেবিলন এবং অন্যান্য অঞ্চলে যারা নির্বাসিত হয়েছিল তাদেরকেও সে তওবা করার প্রেরণা দান করে। অবশেষে আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের সহায়ক হয়। বেবিলন রাজ্যের পতন ঘটে। ৫৩৯ খৃস্টপূর্বে ইরানী দিগ্‌বিজয়ী সাইরাস (অথবা খসরু) বেবিলন জয় করে। তার পরের বছর সে এই বলে ফরমান জারী করে যে, ইসরাঈলীদেরকে নিজস্ব আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার এবং সেখানে পুনর্বাসিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। তারপর দলে দলে ইহুদীরা ইয়াহুদিয়ায় যেতে থাকে। এ কাজ অনেকদিন ধরে চলে। সাইরাস ইহুদীদেরকে পুনরায় হায়কালে সুলায়মানী নির্মাণের অনুমতি দেয়। কিন্তু কিছু কাল যাবত যেসব প্রতিবেশী জাতি সেখানে

বসতিস্থাপন করেছিল তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অবশেষে প্রথম দারিউস্ (দারা) ৫২২ খৃস্ট পূর্বে ইয়াহুদিয়ার শেষ বাদশাহের পৌত্র যারুবাবেলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী নবী, যাকারিয়া নবী এবং ইয়াশুর তত্ত্বাবধানে নতুন করে পবিত্র হায়কাল নির্মাণ করে। তারপর ৪৫০ খৃস্ট পূর্বে নির্বাসিত একটি দলের সাথে হযরত ওযায়ের নবী ইয়াহুদিয়া এসে পৌছেন। ইরান সম্রাট ইর্দশীর এক ফরমান বলে তাঁকে নিম্নের অধিকার দান করেন ঃ

"তুমি তোমার খোদার দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে শাসক এবং বিচারক নিযুক্ত কর যেন সমুদ্র পারের যারা খোদার শরীয়ত জানে তাদের সকলের প্রতি ইনসাফ কায়েম হয়। যারা জানে না তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং যারা তোমার খোদার শরীয়ত এবং বাদশাহের ফরমান অমান্য করবে তাদেরকে অবিলম্বে আইনগত শাস্তি দেবে, তা মৃত্যুদণ্ড হোক, নির্বাসন হোক, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অথবা কারাদণ্ড হোক।"–এয্রা অধ্যায় ৮ ঃ স্তোত্র ২৫-২৬।

এ ফরমানের সুযোগে হযরত ওযায়ের মূসা (আ)-এর দীন পুনর্জীবিত করার বিরাট কাজ করেন। তিনি ইহুদী জাতির সৎ ব্যক্তিদেরকে চারদিক থেকে একত্র করে একটা মজবুত সংগঠন কায়েম করেন। বাইবেলের পঞ্চম পুস্তক, যার মধ্যে তাওরাত সন্নিবেশিত আছে, তিনি সম্পাদনার পর প্রকাশ করেন। ইহুদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকীদা ও নৈতিকতার দিক দিয়ে যে দোষ-ত্রুটি অন্য জাতির প্রভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, শরীয়াতের আইন জারী করে তিনি তা দূর করার চেষ্টা করেন। যেসব মুশরিক নারীদেরকে ইহুদীরা বিবাহ করেছিল তাদেরকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন। বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে আল্লাহর বন্দেগী এবং তার আইন মেনে চলার নতুন শপথ গ্রহণ করেন।

খৃস্ট পূর্ব ৪৪৫ সালে নাহ্মিয়ার নেতৃত্বে আর একটি নির্বাসিত দল ইয়াহুদিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। ইরান সম্রাট নাহ্মিয়াকে জেরুশালেমের শাসক নিযুক্ত করে এবং বসবাসের জন্য শহর নির্মাণের অনুমতি দেয়। এভাবে দেড়শ' বছর পর বায়তুল মাক্দিস্ আবার বসতিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু উত্তর ফিলিস্তিন এবং সামেরিয়া ইসরাঈলীরা হযরত ওযায়েরের সংস্কার ও পুনর্জাগরণ কাজের কোনোই সুফল লাভ করেনি। বরঞ্চ বায়তুল্ মাকদিসের বিরুদ্ধে জায্রিম পাহাড়ের ওপর নিজেদের একটা ধর্মীয় কেন্দ্র নির্মাণ করে এবং তাকে আহলে কিতাবদের কেবলা বানাবার চেষ্টা করে। এভাবে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে দূরত্ব আরও বেড়ে যায়।

গ্রীক আধিপত্য ও তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম

ইরানী সাম্রাজ্যের পতন, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় এবং পুনরায় ইরানীদের উত্থানের ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। তার মধ্যে সিরিয়ার অঞ্চল এ সালুকী রাজ্যের ভাগে পড়ে যার রাজধানী এন্তাকিয়া ছিল। তার শাসক তৃতীয় এন্টিউকাস্ খৃস্ট পূর্ব ১৯৮ সালে ফিলিস্তিন অধিকার করে। সে ধর্মের দিক দিয়ে মুশরিক ছিল এবং ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা সে বরদাশ্ত করতে পারতো না। সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে গ্রীক সভ্যতার বিস্তার শুরু করে। স্বয়ং ইহুদীদের মধ্য থেকেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তার হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। এই বাইরের হস্তক্ষেপ ইহুদী জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। একদল গ্রীক পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, জীবন পদ্ধতি এবং গ্রীক খেলাধুলা রপ্ত করে। দ্বিতীয় দল, আপন সভ্যতার উপরে অটল থাকে। খৃস্ট পূর্ব ১৭৫ সালে চতুর্থ এন্টিউকাস্, (যার উপাধি ছিল এপি ফানিস্ অর্থাৎ খোদার বহিঃপ্রকাশ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন সে

তার স্বৈরাচারী শক্তি দিয়ে ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতার মূলোৎপাটনের চেষ্টা করে। সে বায়তুল মাকদিসের হায়কালে (ইবাদাতখানা) এক বিরাট প্রতিমাস্থাপন করায় এবং তাকে সিজদা করার জন্যে ইহুদীদেরকে বাধ্য করে। সে কুরবানীগাহে কুরবানী বন্ধ করে দেয়। তার পরিবর্তে মুশরিকদের কুরবানীগাহে কুরবানী করার জন্যে ইহুদীদেরকে আদেশ করে। যারা তাদের ঘরে তাওরাত গ্রন্থ রাখবে, সাব্তের হুকুমাবলী পালন করবে অথবা শিশুদের খাৎনা করাবে, তাদের সকলের জন্যে মৃত্যুদণ্ড প্রস্তাব করে। কিন্তু ইহুদীরা এ স্বৈরাচারের নিকট নতি স্বীকার করে না। তাদের মধ্যে এক বিরাট আন্দোলন শুরু হয় যা ইতিহাসে মাক্কাবী বিদ্রোহ বলে অভিহিত হয়। যদিও এ দ্বন্দ্বে গ্রীক মনোভাবাপন্ন ইহুদীরা গ্রীকদের প্রতি তাদের সকল প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং কার্যত মাক্কাবী বিদ্রোহ বানচাল করার জন্যে এন্তাকিয়ার যালেমদের সাহায্য করে, কিন্তু সাধারণ ইহুদীদের অন্তরে হযরত ওযায়ের যে দীনদারীর প্রাণশক্তি সঞ্চার করেন তার প্রভাব এতো বিরাট ছিল যে, সকলে মাক্কাবীদের দলে যোগদান করে এবং অবশেষে গ্রীকদের বিতাড়িত করে নিজেদের একটি স্বাধীন দীনী রাষ্ট্র কায়েম করে যা খৃষ্ট পূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। এ রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তার লাভ করে ঐ গোটা ভূখণ্ডকে তার আওতাভুক্ত করে, যা এককালে ইয়াহুদিয়া এবং ইসরাঈলী রাষ্ট্রগুলোর অধীন ছিল। বরঞ্চ ফিলিস্তিয়ার একটা বিরাট অংশও তার আওতায় আসে যা হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগেও অধীনতার স্বীকার করেনি।[৩৪৩]

দ্বিতীয় বিপর্যয়ের যুগ

মাক্কাবী আন্দোলন যে নৈতিক ও দ্বীনী প্রণশক্তি নিয়ে শুরু হয়েছিল, তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তারপর দুনিয়াপুরস্তি তাদেরকে পেয়ে বসে। অবশেষে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং তারা স্বয়ং রোমীয় দিগবিজয়ী পাম্পীকে ফিলিস্তিন অধিকারের আমন্ত্রণ জানায়। অতএব খৃষ্ট পূর্ব ৬৩ সালে পাম্পী বায়তুল মাকদিস্ অধিকার করে ইহুদীদের স্বাধীনতা হরণ করে। রোমীয় বিজয়ীদের এ স্থায়ী পলিসি ছিল যে, বিজিত অঞ্চলগুলোতে সরাসরি আইন-শৃংখলা কায়েম করার পরিবর্তে স্থানীয় শাসকদের দ্বারা আপন কার্যসিদ্ধি করা পছন্দ করতো। এজন্যে তারা ফিলিস্তিনে নিজের তত্ত্বাবধানে এক দেশীয় রাষ্ট্র কায়েম করে যা খৃষ্টপূর্ব ৪০ সালে হিরোদ নামে এক সুচতুর ইহুদীর অধিকারে আসে। সে হিরোদ দি গ্রেট্ নামে খ্যাত। তার শাসনকর্তৃত্ব গোটা ফিলিস্তিন এবং পূর্ব জর্দানের উপরে খৃষ্টপূর্ব ৪০ সাল থেকে খৃষ্ট পূর্ব ৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সে একদিকে ধর্মীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট রাখে এবং অপরদিকে রোমীয় সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে রোমীয় সাম্রাজ্যের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সে রোম সম্রাট কায়সারের সন্তুষ্টি অর্জন করে। এ সময়ে ইহুদীদের দ্বীনী ও নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছে।

হিরোদের পর তার রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হয় ঃ

তার এক পুত্র আরখেলাউস্ সামেরিয়া, ইয়াহুদিয়া এবং উত্তর আদুমিয়ার শাসক হয়। কিন্তু ৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট আগাস্টাস তাকে পদচ্যুত করে তার সমগ্র রাষ্ট্র আপন গভর্নরের অধীনে দিয়ে দেয় এবং এ ব্যবস্থাপনা ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল থাকে। এ সময়েই বনী ইসরাঈলের সংস্কার সংশোধনের জন্যে হযরত ঈসা (আ) আবির্ভূত হন। ইহুদীদের সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করে এবং রোমীয় গভর্নর পন্টিস্ পিলাটিস্ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার চেষ্টা করে।
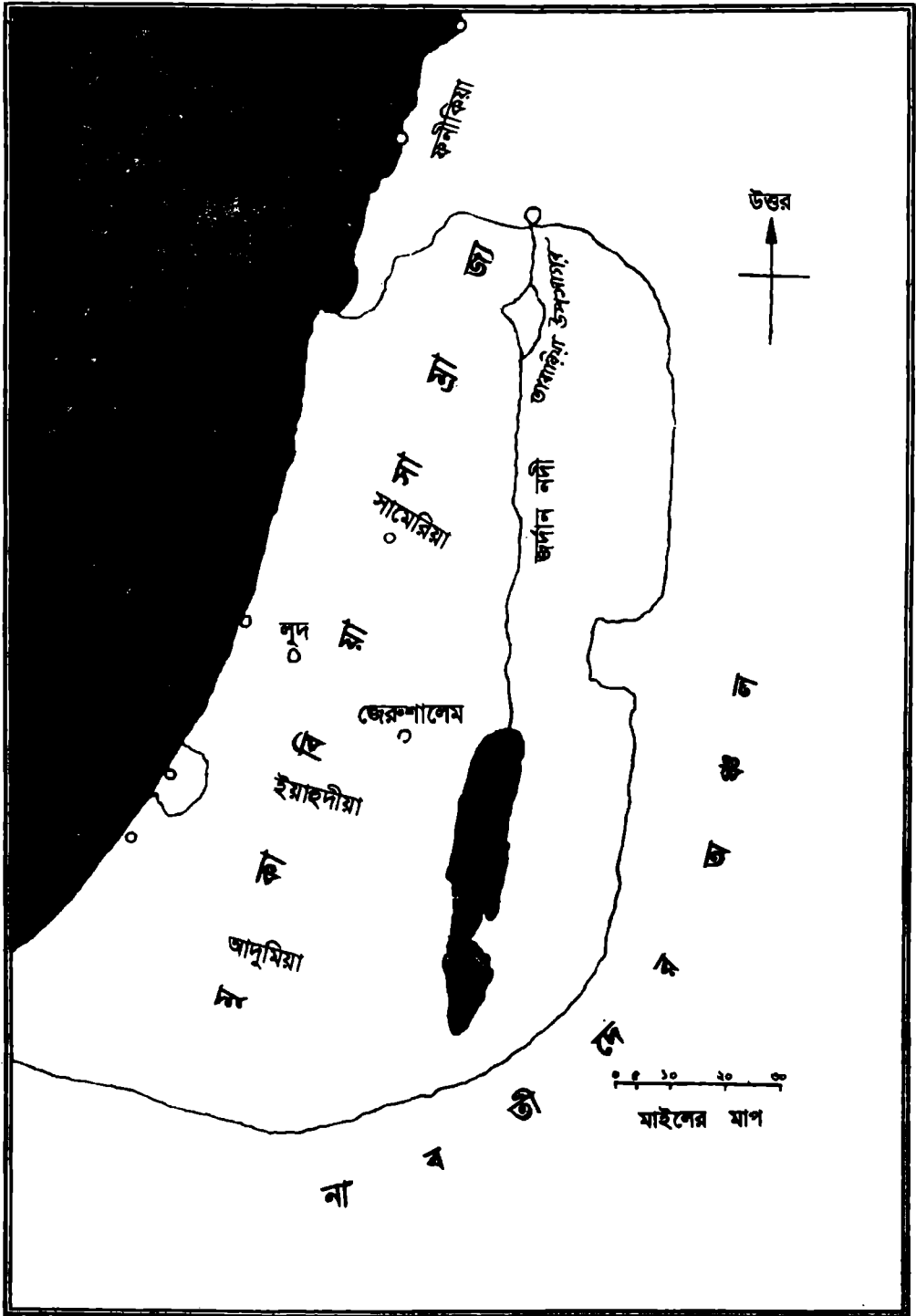
মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন (৯ নং টীকা) (খৃষ্টপূর্ব ১৬৮—৬২)
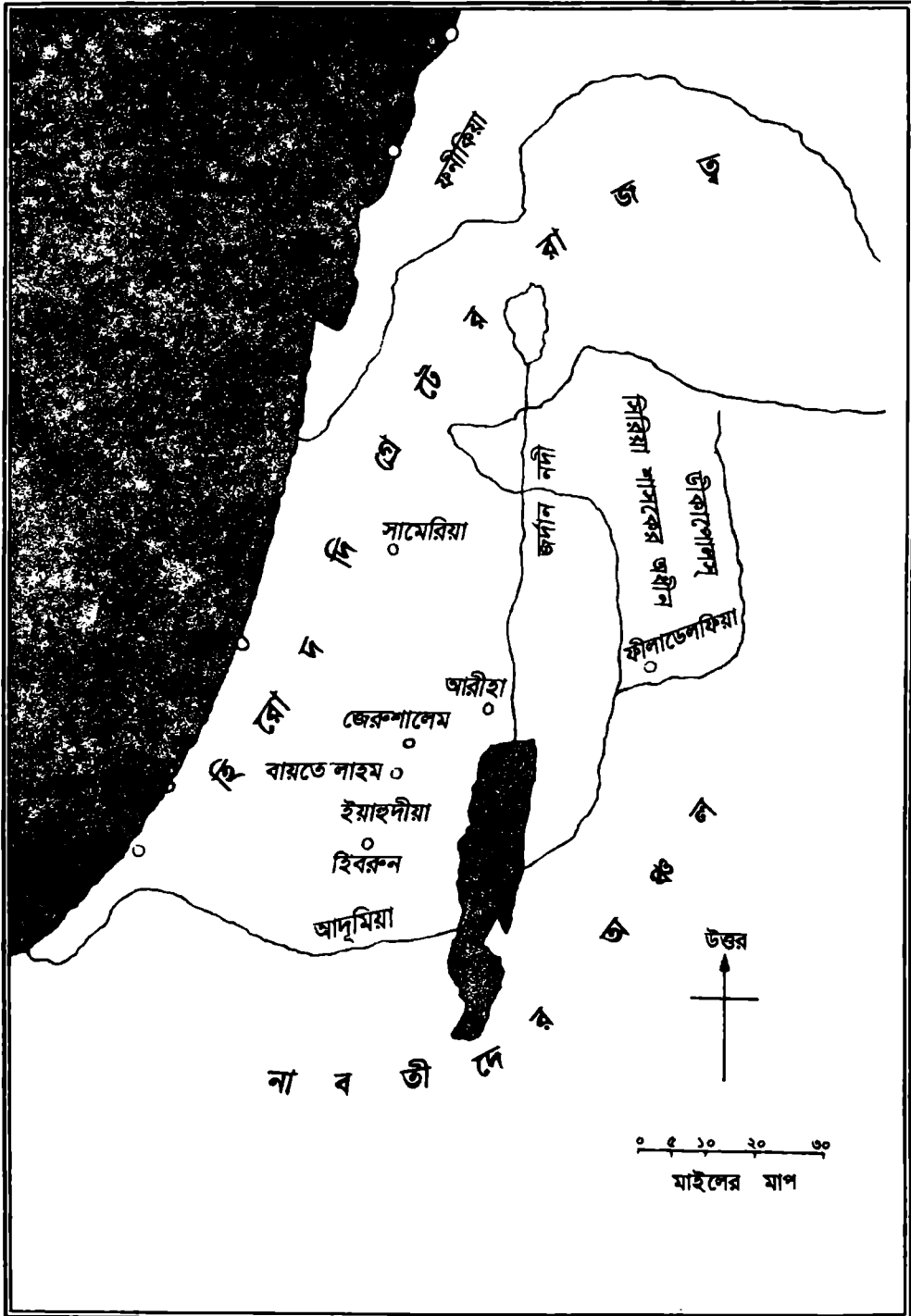
মহান হিরোদ সাম্রাজ্য (খৃষ্টপূর্ব ৪০–৪০)

হিরোদের দ্বিতীয় পুত্র হিরোদ এন্টিপাস উত্তর ফিলিস্তিনে গালীল অঞ্চল এবং পূর্ব জর্দানের শাসক হয়ে পড়ে। এ ছিল সেই ব্যক্তি যে একজন নর্তকীর নির্দেশে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মস্তক ছিন্ন করে তাকে উপঢৌকন দেয়।

তার তৃতীয় পুত্র ফিলিপ হরমুন পর্বত থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বাদশাহ হয়। সে তার পিতা এবং ভাইদের অপেক্ষা রোমীয় ও গ্রীস সভ্যতার অধিককতর ভক্ত অনুরক্ত ছিল। ফিলিস্তিনের অন্যান্য অঞ্চলে কোনো কল্যাণময় বাণী প্রচারের যতোটুকু অবকাশ ছিল, ততোটুকুও ছিল না তার অঞ্চলে।

একচল্লিশ খৃস্টাব্দে হিরোদ দি গ্রেট-এর পৌত্র হিরোদ এগ্রিপ্পাকে রোমীয়গণ ঐসব অঞ্চলের শাসনকর্তা বানায়, যেসব অঞ্চলের শাসক ছিল হিরোদ দি গ্রেট। সে ক্ষমতা লাভের পর হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন শুরু করে এবং হাওয়ারীদের নেতৃত্বে যে আল্লাহ্ভীরুতা ও চারিত্রিক সংশোধনের আন্দোলন চলছিল তা নির্মূল করার জন্যে তার সকল শক্তি নিয়োজিত করে।

এ যুগে সাধারণ ইহুদী এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের যে অবস্থা ছিল তার সঠিক আন্দাজ করতে হলে হযরত ঈসা (আ)-এর ঐসব সমালোচনা পাঠ করা দরকার যা তিনি তাঁর প্রদত্ত ভাষণে করেছিলেন। এসব ভাষণ ইঞ্জিল চতুষ্টয়ে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্যি তা আন্দাজ করার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, যখন সে জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মতো একজন পবিত্র ও পুণ্যবান মনীষীর মস্তক ছিন্ন করা হলো, তখন এ চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি টু শব্দও হলো না। শুধু তাই নয় গোটা জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সত্যনিষ্ঠ লোক ছাড়া এ দুর্ভাগ্যের জন্যে বিলাপ করার কেউ ছিল না। চরম দুর্ভাগ্য এই যে, পন্টিস্ পিলাটিস্ যখন ঐসব ভাগ্য বিড়ম্বিত লোকদের জিজ্ঞেস করলো, আজ তোমাদের খুশীর দিন, নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড যোগ্য লোকদের মধ্যে একজন মুক্তি দেয়ার অধিকার আমার আছে। বল, ঈসাকে ছেড়ে দেব, না ডাকাত বরাব্বাকে ? জনতা সমস্বরে বলে, বরাব্বাকে ছেড়ে দিন। এ যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্য গ্রহণ করার সর্বশেষ সুযোগ যা এ জাতিকে দেয়া হয়েছিল।

বিপর্যয়ের শাস্তি

তার অল্পকাল পরে ইহুদী এবং রোমীয়দের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। ৬৪-৬৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় হিরোদ এগ্রেপ্পা এবং রোমীয় প্রকিউরেটর ফ্লোরাস্ উভয়ে এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। অবশেষে রোম সাম্রাজ্য এক কঠোর সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিদ্রোহ নির্মূল করে এবং টিটাস্ ৭০ খৃস্টাব্দে তরবারীর সাহায্যে জেরুশালেম জয় করে। তারপর যে গণহত্যা চলে তাতে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার লোক নিহত হয়। ৬৭ হাজার লোককে বন্দী করে গোলামে পরিণত করা হয়। হাজার হাজার মানুষকে ধরে ধরে মিসরের খনিতে কাজ করার জন্যে পাঠানো হয়। হাজার হাজার মানুষকে ধরে ধরে বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয়, এম্পিথিয়েটার ও কলোসিয়ামে হিংস্র বন্য পশুর সামনে তাদেরকে ঠেলে দিয়ে অথবা তরবারীর খেলায় লাগিয়ে দিয়ে আনন্দ উৎসব করা হয়। দীর্ঘাকৃতি ও সুন্দরী সকল বালিকাকে বিজয়ীদের উপভোগের জন্যে বেছে নেয়া হয়। জেরুশালেম শহর এবং হায়কাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তারপর ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে, দু' হাজার বছর পর্যন্ত তাদের আর মাথা উঁচু করার সুযোগ হয়নি। জেরুশালেমের পবিত্র হায়কালও আর পুনঃনির্মিত হতে পারেনি। পরে কাইসার হিড্রিয়ান শহরটি পুনরায় বসতিপূর্ণ করে এবং তখন তার নাম দেয়া হয় ইলিয়া। তারপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।[৩৪৪]

সর্বশেষ সুযোগদান

যেহেতু ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বনী ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত ছিল, সেজন্যে বার বার সতর্ক ও ভর্ৎসনা করার পরও তাদের জাতীয় আচার-আচরণের অবনতি ঘটছিল। তারা পর পর কয়েকজন নবীকে হত্যা করে এবং যে মহৎ ব্যক্তিই তাদের সৎ কাজ এবং সত্য-সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানাতো তারই রক্তপিপাসু তারা হয়ে পড়তো। এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর হুজ্জাত পূরণের ও তাদের সামনে সত্যকে চূড়ান্তভাবে পেশ করার জন্যে হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মতো দুজন মহান নবীকে একই সাথে প্রেরণ করেন। তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যা অস্বীকার শুধু ঐসব লোকই করতে পারতো সত্যের প্রতি যাদের অন্ধ আক্রোশ ছিল এবং সত্যের বিরুদ্ধে যাদের স্পর্ধা চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ সর্বশেষ সুযোগটিও হারিয়ে ফেলে। শুধু তারা তাই করেনি যে, এ দুজন নবীর দাওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, বরঞ্চ তাদের একজন প্রধান ব্যক্তি হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মতো একজন মনীষীকে এক নর্তকীর আদেশে দ্বিখণ্ডিত করে। তারপর বনী ইসরাঈলের ভর্ৎসনা তিরস্কারের জন্যে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করা ছিল অর্থহীন। এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে তাঁর সান্নিধানে ডেকে পাঠান এবং কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের জীবন ললাটে লাঞ্ছনার অভিশাপ লিখে দেন।[৩৪৫]

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) এবং তাঁর সাথে বনী ইসরাঈলের আচরণ

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর যেসব অবস্থা বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে তা একত্র করে তাঁর পবিত্র জীবনের একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

লিউকের বর্ণনা মতে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) বয়সে হযরত ঈসা (আ)-এর ছ'মাসের বড়ো ছিলেন। উভয়ের মা পরস্পর নিকট আত্মীয়া ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইউহান্নার (জোন) বর্ণনা মতে, তিনি পূর্ব জর্দানের এলাকায় আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন, আমি মরু অঞ্চলে একজন আহ্বানকারীর কণ্ঠ। তোমরা খোদার পথ সরল-সহজ কর।-জোন ১ ঃ ২৩

মার্ক বলেন, তিনি মানুষকে গোনাহ্ থেকে তওবা করাতেন এবং তওবাকারীদেরকে ব্যাপ্টাইজ (Baptize ধর্মীয়দীক্ষা দান) করতেন অর্থাৎ তওবার পর গোসল করাতেন যেন আত্মা ও দেহ পাক হয়ে যায়। ইয়াহুদিয়া এবং জেরুশালেমের (Jeruzalem) বহু সংখ্যক লোক তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। তারা তাঁর কাছে গিয়ে ব্যাপ্টাইজ করিয়ে নিত (মার্ক ১ ঃ ৪-৫)। এজন্যে ব্যাপ্টাইজকারী ইউহান্না (John the Baptist) বলে তিনি খ্যাতি লাভ করে। সাধারণত বনী ইসরাঈল তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছিল [মথি (Mathew) ২১-২৬]। ঈসা (আ)-এর উক্তি ঃ নারী গর্ভজাত লোকের মধ্যে ব্যাপ্টাইজকারী ইউহান্না বা জোন থেকে মহান আর কেউ হয়নি (মথি ১১ ঃ ১১)।
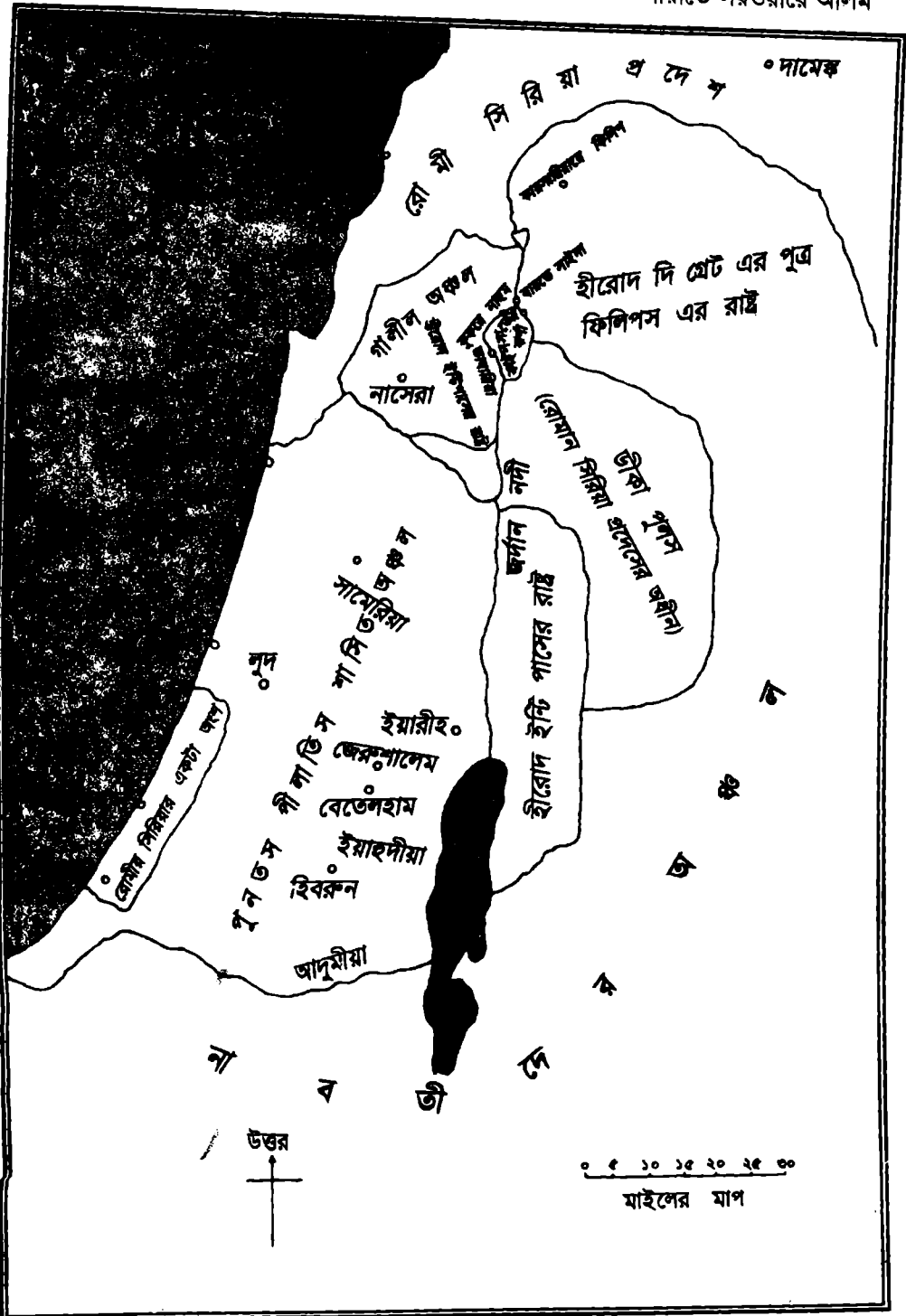
হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন

তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন এবং কোমরে বাঁধা থাকতো কটি বন্ধ। তাঁর আহার ছিল পংগপাল ও বনের মধু (মথি ৩ ঃ ৪)। তিনি তাঁর এ ফকীরী জীবন-যাপনের সাথে ঘোষণা করে বেড়াতেন, তওবা কর। কারণ আসমানের বাদশাহী আসন্ন (মথি ৩ ঃ ২)। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের সূচনা আসন্ন। এ কারণেই তাঁকে হযরত মসীহ্‌র (ঈসা) 'আরহাস্' (সত্যায়নকারী) বলা হতো। এ কথাই তাঁর সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ - ال عمران : ٣٩) [আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের (হযরত ঈসার আ) সত্যতা প্রমাণকারী]।

তিনি মানুষকে নামায-রোযার উপদেশ দিতেন।–মথি ৯ ঃ ১৪, লিউক ৫ ঃ ৩৩, লিউক ১১ ঃ ১।

তিনি মানুষকে বলতেন, যার কাছে দুটি জামা আছে, যার নেই তার কাছে সে তা বণ্টন করবে। যার কাছে খাদ্য আছে সেও তেমন করবে। মাশুল আদায়কারীগণ জিজ্ঞেস করলো, হুজুর! আমরা কি করব ? তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে যা নির্ধারিত তার বেশী নিও না। সিপাইরা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের জন্যে কি হুকুম ? তিনি বললেন, না কারো উপর যুলুম করবে, আর না অন্যায়ভাবে কারো কাছ থেকে কিছু নেবে। নিজের বেতনের উপরেই সন্তুষ্ট থেকো।–লিউক ৩ ঃ ১০-১৪।

বনী ইসরাঈলের বিকৃত আলেমগণ, ফারিসী এবং সাদুকীগণ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্যে এলে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, সাপের বাচ্চারা! কে তোমাদের মনে করিয়ে দিল যে, আসন্ন গযব থেকে পালাবে ? ইবরাহীম আমাদের বাপ-এ কথা মনে করার চিন্তাই করো না। .... এখন বৃক্ষমূলে কুঠার রাখা আছে। যে বৃক্ষে ভালো ফল আসবে না তা কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে [মথি (Mathew) ৩ ঃ ৭-১০]।

তাঁর যুগের ইহুদী শাসক হিরোদ এন্টিপাস্-এর রাজ্যে তিনি হকের দাওয়াত পেশ করার খেদমত করছিলেন। হিরোদ এন্টিপাস পুরোপুরি রোমীয় সভ্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। তার কারণে সমগ্র দেশে পাপাচার-অনাচার বিস্তার লাভ করছিল। সে স্বয়ং তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী হিরোদ ইয়াসকে তার আপন গৃহে এনে শয্যা-সংগিনী করে রেখেছিল। তার জন্যে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) হিরোদকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার পাপাচারের সমালোচনা করেন। এ অপরাধে হিরোদ তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। তথাপি তাঁকে একজন পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ মনে করে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতো এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বিপুল প্রভাব দেখে ভীত সন্ত্রস্তও থাকতো। কিন্তু হিরোদইয়াস্ মনে করতো হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) জাতির মধ্যে যে নৈতিক প্রাণশক্তি সঞ্চার করছেন তা তার মতো একজন নারীকে মানুষের চোখে অতীব হেয় ও ইতর প্রতিপন্ন করছে। সে জন্যে সে তাঁর প্রাণনাশের জন্যে বদ্ধপরিকর হলো। অবশেষে হিরোদের জন্মবার্ষিকী উৎসবে সে তার সুযোগ গ্রহণ করলো। উৎসব অনুষ্ঠানে তার মেয়ে খুব নাচ দেখালো। হিরোদ তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে বললো, তুমি কি চাও বল। মেয়ে ব্যভিচারিণী মাকে জিজ্ঞেস করলো সে কি চাইবে। মা বললো, ইয়াহ্‌ইয়ার ছিন্ন মস্তক দাবী কর। অতএব সে হাত জোড় করে হিরোদকে বললো, এক্ষণি ইয়াহ্‌ইয়ার ছিন্ন মস্তক একটা থালায় করে আমার সামনে রাখতে বলুন। হিরোদ চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিন্তু প্রণয়িনী কন্যার দাবী কি করে

প্রত্যাখান করা যায় ? সে তৎক্ষণাৎ ইয়াহ্ইয়া নবীর ছিন্ন মস্তক একটা থালায় করে নর্তকীর সামনে উপঢৌকন পেশ করলো।–মথি ১৪ ঃ ৩-১২, মার্ক ৬ ঃ ১৭-২৯, লিউক ৩ ঃ ১৯-২০।৩৪৬

হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথে বনী ইসরাঈলের আচরণ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ م اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ـ

"এবং (হে মুহাম্মাদ) এ কিতাবে মারইয়ামের অবস্থা স্মরণ কর, যখন সে নিজেদের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নিরালা নিঃসংগ হয়ে রইলো এবং পর্দা লটকিয়ে তাদের থেকে নিজকে লুকিয়ে রাখলো।"–সূরা মারইয়াম ঃ ১৬

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে যে, হযরত মারইয়ামের মা তাঁর মানত অনুযায়ী মারইয়ামকে বায়তুল মাকদিসে ইবাদাতের জন্যে বসিয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দেখা-শুনা ও ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছিলেন। ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে মেহরাবে হযরত মারইয়াম এতেকাফ করেছিলেন তা ছিল বায়তুল মাকদিসের পূর্বাংশ। তিনি সাধারণ রীতি অনুযায়ী একটা পর্দা লটকিয়ে লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। যারা শুধু বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে مَكَانًا شَرْقِيًّا-এর অর্থ 'নাসেরা' করেছে, তারা ভুল করেছে। কারণ নাসেরা জেরুশালেম থেকে উত্তরদিকে, পূর্বদিকে নয়।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ج وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○ مريم : ١٧-٢١

"এ অবস্থায় আমি তার কাছে আমার রুহ্ (ফেরেশতা) পাঠালাম। সে তার সামনে একজন পরিপূর্ণ মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হলো। মারইয়াম হঠাৎ বলে উঠলো, তুমি যদি কোনো আল্লাহভীরু মানুষ হও তাহলে তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় চাই। সে বললো, আমি তো তোমার রবের ফেরেশতা। আমাকে এজন্যে পাঠানো হয়েছে যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবো। মারইয়াম বললো, আমার থেকে কি করে পুত্র সন্তান হবে—যখন আমাকে কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি কোনো বদকার মেয়েলোকও নই ? ফেরেশতা বললো, এমনি করেই হবে। তোমার রব বলেছেন, এমন করা আমার জন্যে খুবই সহজ এবং এটা এজন্যে করছি যে, এ ছেলেটিকে আমি লোকের জন্যে একটা নিদর্শন বানিয়ে রাখবো এবং আমার পক্ষ থেকে একটা রহমত। আর এটা হবেই।"–সূরা মারইয়াম ঃ ১৭-২১

হযরত মারইয়ামের বিস্মিত হওয়াতে ফেরেশতা বলেন, 'এমনই হবে'। এটা কখনো এ অর্থে হতে পারে না যে, 'মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তার থেকে তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান পয়দা হবে।' বরঞ্চ এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, "কোনো মানুষ তোমাকে স্পর্শ

না করা সত্ত্বেও তোমার পুত্র সন্তান হবে।" এরূপ ভাষায় হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানেও ফেরেশতা এ জবাবই দিয়েছেন। এটা পরিষ্কার কথা যে, যে অর্থ সেখানে করা হয়েছে, তাই এখানেও হবে। এভাবে সূরা আয যারিয়াতে (আয়াত ২৮-৩০) যখন ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন তখন হযরত সারা বলেন, আমার মতো বন্ধ্যা-বৃদ্ধার আবার পুত্র কি করে হবে? তখন ফেরেশতা তাঁকে এ জবাবই দেন كذالك এমনিই হবে। তার অর্থ হলো, বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তান হবে। তাছাড়া যদি كذالك এর অর্থ এরূপ করা হয় যে, "মানুষ তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তোমার থেকে সেভাবেই পুত্র পয়দা হবে যেমনভাবে সারা দুনিয়ার নারীদের হয়ে থাকে" তাহলে পরবর্তী দুটি বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাহলে এ কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল যে, "তোমার রব বলছেন, এমনটি করা আমার পক্ষে বড়ো সহজ" এবং "এ ছেলেটিকে আমি একটি নিদর্শন বানাতে চাই?" নিদর্শন শব্দটি এখানে সুস্পষ্ট মোযেজার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ অর্থের দিকেই এ বাক্যটি ইংগিত করে "এমনটি করা আমার পক্ষে খুবই সহজ।" অতএব আল্লাহ তাআলার এ এরশাদের অর্থ এ ছাড়া আর কিছু না যে, "এ ছেলেটিকেই আমি একটি মুজিযা হিসেবে বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করতে চাই।" পরবর্তী বিবরণ স্বয়ং একথা সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর সত্তাকে কিভাবে মুজিযা হিসেবে পেশ করা হচ্ছে।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○ وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○ فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○ مريم ٢٢-٢٨

"মারইয়াম ঐ বাচ্চা গর্ভে ধারণ করলো এবং সে গর্ভাবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলায় পৌঁছিয়ে দিল। সে বলতে লাগলো, হায়! এর আগেই আমি যদি মরে যেতাম এবং আমার নাম চিহ্ন পর্যন্ত না থাকতো। ফেরেশতা তার পাদদেশ থেকে ডেকে বললো, চিন্তা করো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর তুমি এ খেজুর গাছটির কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দাও, তোমার উপর তাজা তাজা খেজুর টপ্‌টপ্ করে পড়বে। তুমি (খেজুর) খাও আর (ঝর্ণার) পানি পান কর। আর চোখ ঠাণ্ডা কর। তারপর যদি কোনো মানুষ তুমি দেখতে পাও, তাহলে তাকে বল, আমি রহমানের জন্যে রোযার মানত করেছি। এজন্যে আজ আমি কারো সাথে কথা বলবো না। তারপর সে তার সন্তানকে নিয়ে তার জাতির লোকের কাছে গেল। তারা বলতে লাগলো, হে মারইয়াম! তুমি তো বড়ই পাপের কাজ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন! তোমার

পিতা তো কোনো খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাও চরিত্রহীনা ছিল না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ২২-২৮

দূরবর্তী স্থান অর্থ বায়তে লাহম্। হযরত মারইয়ামের এ'তেকাফ থেকে বের হয়ে এখানে যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। বনী ইসরাঈলের অতি পবিত্র পরিবার বনী হারুনের কন্যা বায়তুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে বসে ছিলেন। তিনি হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তিনি যদি তাঁর এ'তিকাফের স্থানেই বসে থাকতেন এবং তাঁর গর্ভ মানুষ জানতে পারতো, তাহলে শুধু পরিবারের লোকজনই নয়, বরঞ্চ সমাজের অন্যান্য লোকও তাঁর বেঁচে থাকা কঠিন করে দিত। এজন্যে বেচারী এ কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ার পর চুপচাপ তাঁর এ'তিকাফের কুঠরি ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন। তারপর যতোক্ষণ আল্লাহর মর্জি হবে, তিনি জাতির তিরস্কার-ভর্ৎসনা এবং সাধারণ দুর্নাম থেকে রক্ষা পাবেন। এ ঘটনা স্বয়ং এ কথার বড়ো প্রমাণ যে, হযরত ঈসা (আ) বিনা বাপে পয়দা হয় যদি হযরত মারইয়াম বিবাহিতা হতেন এবং স্বামীর ঔরসে যদি তাঁর গর্ভে সন্তান পয়দা হতো, তাহলে বাপের বাড়ী অথবা শ্বশুর বাড়ী না গিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে প্রসবের জন্যে একাকিনী এক দূরবর্তী স্থানে তিনি চলে যাবেন এর কোনোই কারণ থাকতে পারে না।

এসব থেকে সেই পেরেশানি অনুমান করা যায় যাতে তিনি ভুগছিলেন। পরিস্থিতির নাজুকতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, তাঁর মুখ থেকে এ কথাগুলো গর্ভবেদনার জন্যে বের হয়নি। বরঞ্চ এ চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে মারাত্মক পরীক্ষায় ফেলেছেন, তার থেকে কি করে তিনি ভালোভাবে পরিত্রাণ পাবেন। গর্ভ তো তিনি এখনো কোনো না কোনো প্রকারে গোপন রাখলেন। কিন্তু এখন এ শিশুকে নিয়ে কোথায় যাবেন ? হযরত মারইয়াম ও কথাগুলো কেন বলেছিলেন, ফেরেশতার পরবর্তী "চিন্তা করো না" এ কথাটি তা সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে। বিবাহিতা মেয়ের যখন প্রথম বাচ্চা হয়, তখন সে গর্ভবেদনায় যতোই ছটফট্ করুক না কেন, তার কোনো দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়।

'চিন্তা করো না' কথার অর্থ এই যে, বাচ্চার ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তার জন্ম সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাহলে তার জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। (প্রকাশ থাকে যে, বনী ইসরাঈলের সমাজে কথা না বলে চুপ থাকার রোযা রাখার প্রথা ছিল)। এ কথাগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মারইয়ামের আসল দুশ্চিন্তার কারণ কি ছিল। উল্লেখ যে, বিবাহিতা মেয়ের প্রথম বাচ্চা যদি দুনিয়ার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী হয় তাহলে চুপ থাকার রোযা রাখার প্রয়োজনটা কি ছিল ?

يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ (হে হারুনের বোন)-এর দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, এর বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হবে এবং মনে করা হবে যে, হারুন নামে মারইয়ামের কোনো ভাই ছিল। দ্বিতীয় এই যে, আরবী ভাষার ব্যবহার পদ্ধতি অনুযায়ী 'হারুনের বোন'-এর অর্থ 'হারুন পরিবারের মেয়ে' গ্রহণ করতে হবে। কারণ আরবী ভাষায় এ ধরনের বর্ণনাভংগী প্রচলিত আছে। যেমন 'মুদার' গোত্রের লোককে يا اخا مضر (হে মুদারের ভাই) এবং হামদান গোত্রের লোককে يا اخا همدن (হে হামদানের ভাই) বলে ডাকা

হতো। প্রথম অর্থ গ্রহণের সাক্ষ-প্রমাণ এই যে, নবী (স) থেকেও এরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনে দলিল এই যে, পরিস্থিতি ও পরিবেশ এ অর্থ গ্রহণের দাবী রাখতো। কারণ এ ঘটনার ফলে জাতির জনগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাহ্যত তার কারণ এটা মনে হয় না যে, হারুন নামে এক অজ্ঞাতনামা লোকের কুমারী বোন কোলে বাচ্চা নিয়ে এসেছে। বরঞ্চ যে কারণে মারইয়ামের চারদিকে লোকের ভিড় জমেছিল তা এটাই হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের এক পবিত্রতম পরিবারে হারুন বংশের একটি মেয়েকে এ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও একটি 'মরফূ' হাদীস বর্তমান থাকতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা নীতিগতভাবে মেনে নেয়া যায় না, কিন্তু মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযি প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে এ হাদীস যে ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে, তার অর্থ এ করা যায় না যে, এ শব্দগুলোর অর্থ 'হারুনের বোন'-ই হবে। হযরত মুগীরা বিন শু'বার বর্ণনায় যা কিছু বলা হয়েছে তাহলো এই যে, নাজরানের খৃস্টানরা হযরত মুগীরাকে প্রশ্ন করেছিল, কুরআনে হযরত মারইয়ামকে 'হারুনের বোন' বলা হয়েছে। অথচ হারুন তাঁর কয়েকশ' বছর পূর্বে অতীত হয়েছেন। কুরআনের এ কথার অর্থ কি ?

হযরত মুগীরা (রা) এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। পরে তিনি ব্যাপারটি নবী (স)-এর নিকটে পেশ করেন। নবী (স) বলেন, তুমি কেন জবাবে এ কথা বললে না যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নবী ও নেক লোকের নাম অনুসারে নিজেদের নাম রাখতো। নবী (স)-এর এ উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নিরুত্তর হওয়ার পরিবর্তে এ ধরনের জবাব দিয়ে প্রশ্নের মুকাবিলা করা যেতে পারে।

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ط قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ○ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ○ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ وَّبَرًّا ۢ بِوَالِدَتِىْ ز وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مريم : ٢٩-٣٤

"মারইয়াম, বাচ্চার দিকে ইংগিত করলো। লোকেরা বললো, তার সাথে কি কথা বলবো ? সে তো দোলনায় শায়িত একটা শিশুমাত্র। শিশুটি তখন বলে উঠলো —আমি 'আল্লাহর বান্দাহ্। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতওয়ালা করেছেন। তিনি নামায ও যাকাত নিয়মিত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন যতোদিন আমি জীবিত থাকবো। আমাকে মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন। আমাকে স্বৈরাচারী ও চরিত্রহীন করে বানাননি। আমার প্রতি সালাম যখন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যখন আমি মরব এবং যখন পুনরুজ্জীবিত হবো।' এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আর এ হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে সত্য কথা যে সম্পর্কে লোক সন্দেহ পোষণ করে।"–সূরা মারইয়াম ঃ ২৯–৩৪

এ হচ্ছে সেই নিদর্শন যা হযরত ঈসা রূপে বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাদের ক্রমাগত দুষ্কৃতি ও অনাচার-পাপাচারের জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার পূর্বে মূল সত্যকে তাদের সামনে চূড়ান্তভাবে পেশ করে

সংশোধনের সর্বশেষ সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। সে জন্যে তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যে, বনী হারুনের যে সতীসাধ্বী ও ইবাদাতকারীনী মেয়েটি বায়তুল মাকদিসে এ'তেকাফে নিমগ্ন ছিল এবং হযরত যাকারিয়া (আ)-এর লালন-পালনাধীন ছিল। তাকে অবিবাহিতা অবস্থায় গর্ভবতী করে দিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে সে যখন নবপ্রসূত শিশুকে নিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসবে তখন সমগ্র জাতির মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যাবে এবং সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হবে। অতপর এ ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী যখন হযরত মারইয়ামের সামনে জনতার ভিড় জমতে লাগলো, তখন নবপ্রসূত সন্তানের মুখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা কথা বলালেন। এজন্যে যে, এ সন্তান বড়ো হয়ে যখন নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হবে, তখন যেন জাতির মধ্যে অসংখ্য লোক এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বর্তমান থাকে যে, তারা এ ব্যক্তির মধ্যে শৈশবেই এক বিস্ময়কর মুজিযা দেখতে পেয়েছে। তারপরও যদি এ জাতি তাঁর নবুওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার পরিবর্তে তাঁকে অপরাধী সাজিয়ে শূলে বিদ্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে এমন কঠোর শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হবে যা দুনিয়ার কোনো জাতিকে দেয়া হয়নি।[৩৪৭]

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে তাফহীমুল কুরআন প্রথম খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ৪৪, ৫৩, সূরা আন নিসা, টীকা ২১২, ২১৩ তৃতীয় খণ্ড, আম্বিয়া, টীকা ৮৮-৯০, সূরা আল মুমিনূন, টীকা ৪৩ দ্রষ্টব্য।)

আসহাবুর রাস্

এদের উল্লেখ প্রথমে সূরা আল ফুরকান ৩৮ আয়াতে করা হয়েছে। তারপর সূরা কাফ্-এর ১২ আয়াতে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উভয়স্থানেই যারা নবীগণকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তাদের সাথে এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি।[১]

আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী 'রাস্' নামে দুটি স্থান প্রসিদ্ধ আছে। একটি নজদে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর হেজাজে। এখন এটা নির্ণয় করা কঠিন যে, 'আস্হাবুর রাস্' এ দুটি স্থানের মধ্যে কোন্‌টির অধিবাসী ছিল। তাদের কাহিনীর কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না। বড়ো জোর এতোটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এটি এমন এক জাতি ছিল যে, তাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে তাদের দিকে একটি ইংগিত মাত্র করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাতে করে এ ধারণা করা যায় যে, কুরআন নাযিলের সময় আরববাসী সাধারণত এ জাতি সম্পর্কে অবহিত ছিল। পরবর্তীকালে তাদের বর্ণনা ইতিহাসে সংরক্ষিত করা যায়নি।[৩৪৮]

১. 'আসহাবুর রাস্' সম্পর্কে কোনো তত্ত্বানুসন্ধান করা যায়নি যে, তারা কে ছিল। তাফসীরকারগণ বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করেছেন কিন্তু তার কোনোটাই নিশ্চিত রূপে গ্রহণযোগ্য নয়। বড়ো জোর যা কিছু বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, এ এমন এক জাতি ছিল যে, তাদের নবীকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে অথবা লট্‌কিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। 'রাস্' আরবী ভাষায় পুরাতন কূপকে বলা হয়।–তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, আল ফুরকান, টীকা ৫২।

নবুওয়াত পূর্ব পরিবেশ

প্রচলিত ধর্মসমূহ

মুশরিকগণ

গোটা মানবজগতের উপর সামগ্রিক দৃষ্টি

নবী মুহাম্মাদ (স) যখন ইসলামী দাওয়াতের জন্যে আদিষ্ট হন, তখন দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকারের নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের দাবী রাখতো। সে সময়ে রোম ও ইরান সাম্রাজ্যও বিদ্যমান ছিল। শ্রেণীভেদও ছিল, অন্যায় অর্থনৈতিক শোষণ (Econmic Exploitation) চলছিল। নৈতিক অনাচারও ছড়িয়ে ছিল। স্বয়ং নবীর আপন দেশেও বহু জটিল সমস্যা বিদ্যমান ছির। গোটা জাতি অজ্ঞতা, নৈতিক অধঃপতন, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইরাকের উর্বর প্রদেশ সহ ইয়েমেন পর্যন্ত আরবের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল ইরানের শাসনাধীন ছিল। উত্তরে হেজাজ সীমান্ত পর্যন্ত রোমীয় শাসন বিস্তার লাভ করেছিল। স্বয়ং হেজাজে ইহুদী পুঁজিপতিদের বড়ো বড়ো দুর্গ স্থাপিত ছিল। তারা আরববাসীকে সুদের জালে ফাঁসিয়ে রেখেছিল। পশ্চিম তীরের ঠিক বিপরীত দিকে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, যারা মাত্র কবছর পূর্বেই মক্কার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তাদের স্বধর্মাবলম্বী এবং তাদের সাথে এক প্রকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ একটা গোষ্ঠী হেজাজ ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী নাজরানে বাস করতো।[৩৪৯]

রোম, গ্রীস্ ও ভারত

রোমের কলোসিয়ামের (Coloseum) গল্পকাহিনী আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংরক্ষিত আছে। হাজার হাজার হতভাগ্য মানুষ তরবারীর মল্লযুদ্ধের (Gladiatory) এবং রোমীয় আমীর ওমরাহদের ক্রীড়া উপভোগের শিকার হতো। আমন্ত্রিতগণের চিত্তবিনোদন অথবা বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়নের জন্যে গোলামদেরকে হিংস্র পশুর মুখে ঠেলা দেয়া অথবা তাদেরকে পশুর মতো যবেহ্ করে দেয়া অথবা তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে তামাশা দেখা ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশে কোনো দূষণীয় কাজ ছিল না। কয়েদী এবং গোলামদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলা সে যুগের সাধারণ প্রথা ছিল। অজ্ঞ ও রক্তপিপাসু আমীর ওমরাহ্ কেন, গ্রীক ও রোমের বড়ো বড়ো মনীষী ও দার্শনিকদের চিন্তা-গবেষণায় নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার বহু পাশবিক পন্থাও বৈধ ছিল। এরিস্টটল এবং প্ল্যাটোর মতো নৈতিক শিক্ষাদাতাগণ মাকে তার দেহের একটা অংশকে (ভ্রুণ বা গর্ভস্থ সন্তান) আলাদা করে দেয়ার অধিকার দান করাকে দূষণীয় মনে করতেন না। অতএব গ্রীক ও রোমে ভ্রুণ হত্যা কোনো অবৈধ কাজ ছিল না। পুত্রকে হত্যা করার অধিকার পিতার ছিল এবং রোমীয় আইন-প্রণেতাগণ আইনের এ বৈশিষ্ট্যের জন্যে গর্ববোধ করতেন যে, সন্তানদের উপর পিতার অধিকার এতোটা সীমাহীন ছিল। সুখ-দুঃখে উদাসীন জেনোর শিষ্যবৃন্দের (Stoics) নিকটে আত্মহত্যায় কোনো দোষ ছিল না বরঞ্চ এ ছিল একটা সম্মানজনক কাজ যে, সভা আহ্বান করে তার মধ্যে আত্মহত্যা করা হতো। এমনকি প্ল্যাটোর মতো মনীষীও একে কোনো অপরাধ মনে করতেন না। স্ত্রীকে স্বামীর জবাই করাটা ঠিক তেমনি ছিল যেমন সে তার পালিত পশু জবাই করতে পারতো। গ্রীক আইনে তার জন্যে কোনো শাস্তি ছিল না। 'জীব রক্ষার' দোলনা ভারত সকলের চেয়ে এদিক দিয়ে অগ্রসর ছিল। এখানে স্বামীর মৃতদেহের সাথে তার জীবিত বিধবাকে জ্বালিয়ে মারা একটা বৈধ কাজ ছিল। (প্রশ্ন হতে পারে যে, স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জ্বালানো হতো না, বরঞ্চ সে

নিজেই নিজেকে জ্বালিয়ে মারতো। কিন্তু ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন প্রকারে সমাজের চাপই তাকে এ ভয়াবহ আত্মহত্যা করতে বাধ্য করতো এবং তার জন্যে ধর্মেরও তাকীদ ছিল)। শূদ্রদের জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না। এ হতভাগারা ব্রহ্মার পা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে এ কারণেই তার খুন ব্রাহ্মণদের জন্যে হালাল ছিল, বেদ-বাণী শ্রবণ করা শূদ্রদের জন্যে এতো বড়ো পাপ যে, তার কানে গলিত ধাতু ঢেলে দিয়ে হত্যা করা শুধু বৈধই ছিল না, বরঞ্চ অপরিহার্য ছিল। 'জলপর্ব' প্রথা ছিল চিরাচরিত এবং সে প্রথা অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রথম শিশুকে গংগায় বিসর্জন দিত। এ নিষ্ঠুরতাকে তারা সৌভাগ্যের কারণ মনে করতো।[৩৫০]

শিরকের বিশ্বজনীন ব্যাধি

যখন রাসূলুল্লাহ (স) তাওহীদের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন দুনিয়ার ধর্মীয় ধারণা কি ছিল ? পৌত্তলিক মুশরিকগণ ঐসব খোদা বা দেব-দেবীর পূজা করতো যারা কাঠ, পাথর, সোনা, চাঁদি প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু থেকে নির্মিত ছিল। তারা আকার-আকৃতি ও দেহ বিশিষ্ট ছিল। দেব-দেবীর রীতিমতো বংশবৃদ্ধি হতো। কোনো দেবী স্বামীহীনা এবং দেবতা স্ত্রীবিহীন ছিল না। তাদের পানাহারেরও প্রয়োজন হতো। তাদের পূজারীগণ তার ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের বহু সংখ্যক লোক বিশ্বাস করতো যে, খোদা মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হন এবং কিছু লোক তাঁর অবতার হয়। ঈসায়ীগণ যদিও এক আল্লাহ স্বীকার করার দাবিদার ছিল কিন্তু তাদের আল্লাহরও অন্তত পক্ষে একজন পুত্র ছিল। পিতা-পুত্রের সাথে রুহুলকুদসেরও খোদায়ীতে অংশীদার হওয়ার গৌরব ছিল। এমন কি খোদার মা এবং শাশুড়িও হতো। ইহুদীরাও এক খোদা স্বীকার করার দাবী করতো। কিন্তু তাদের খোদাও পার্থিব, দৈহিক ও অন্যান্য মানবীয় গুণাবলী বিহীন ছিল না। সে চলাফেরা করতো, মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোনো বান্দাহর সাথে কুস্তিও লড়তো। তার এক পুত্রও (ওযায়ের) ছিল। এসব ধর্মীয় দল ছাড়াও মাজুসীগণ অগ্নিউপাসক ছিল এবং সায়েবীগণ নক্ষত্র পূজা করতো।[৩৫১]

মানবতার ভ্রান্ত জাতিভেদের ফেৎনা

অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগেই মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের চারপাশে একটা বৃত্ত অংকন করতো, তার ভেতরে যারা জন্মগ্রহণ করতো তাদেরকে আপন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদেরকে পর ভাবতো। এ বৃত্ত কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর অংকন করা হতো না বরঞ্চ আকস্মিক জন্মের ভিত্তিতে। কোথাও একটি পরিবার, গোত্র অথবা বংশে জন্মগ্রহণ ছিল তার ভিত্তি এবং কোথাও এক ভৌগলিক অঞ্চলে, অথবা এক বিশিষ্ট বর্ণের বা বিশিষ্ট ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হতো। অতপর এ বুনিয়াদের উপর আপন-পরের যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হলো, তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রইলো না যে, যাকে এ দিক দিয়ে আপন গণ্য করা হলো তার সাথে অন্যের তুলনায় শুধু অধিকতর ভালোবাসা ও সাহায্য সহানুভূতি হতো তাই না বরঞ্চ এ পার্থক্য অপরের সাথে ঘৃণ্য, শত্রুতা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকরণ এবং অত্যাচার উৎপীড়নের এক নিকৃষ্টতম রূপ ধারণ করলো। এর জন্যে দর্শন রচনা করা হলো, ধর্ম আবিষ্কার করা হলো, আইন তৈরী করা হলো, নৈতিক মূলনীতি বানানো হলো। জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ তাকে স্থায়ী মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকে কার্যকর করলো। এরই

ভিত্তিতে ইহুদীরা বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর নির্বাচিত সৃষ্টি মনে করে এবং নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশনামতে পর্যন্ত অ-ইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদাকে ইসরাঈলীদের থেকে নিম্নে স্থান দেয়া হয়েছে। এ শ্রেণীভেদ হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার জন্ম দেয়, যার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের উচ্চমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উচ্চ জাতির লোকের তুলনায় সকল মানুষকে নীচ ও অপবিত্র গণ্য করা হয়। শুদ্রদেরকে চরম লাঞ্ছনার গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। সাদা ও কালোর ভেদাভেদ আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগ লোকদের উপর যে অত্যাচার-অবিচার করে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যেকেই তার আপন চোখে দেখতে পাচ্ছে। ইউরোপের লোক আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড্ ইণ্ডিয়ান বংশীয় লোকদের সাথে যে আচরণ করে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের সাথে যে আচরণ করে তার পশ্চাতে এ দৃষ্টিভংগীই কাজ করছিল যে, আপন দেশ ও জাতির সীমারেখার বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও ইজ্জত আবরু তাদের জন্যে বৈধ এবং লুঠ করার, দাসে পরিণত করার এবং প্রয়োজন হলে দুনিয়ার বুক থেকে নির্মূল করার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজা একটি জাতিকে অন্যান্য জাতির জন্যে যেভাবে হিংস্র বানিয়ে রেখেছে তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের যুদ্ধগুলোতে দেখা গেছে এবং আজও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে নাজী জার্মানীর বংশবাদী দর্শন এবং নার্ডুক বংশের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে বিস্ময় সৃষ্টি করে তা লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তা কত বিরাট ও ধ্বংসকর গোমরাহি যার সংশোধন সংস্কারের জন্যে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○ الحجرت ١٣

"হে মানবজাতি! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি। তারপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু-নীতিবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুই জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩

আরব মুশরিকদের ধর্ম ও সামাজিক রীতি পদ্ধতি

এক নজরে আরবের মুশরিক সমাজ

ঐ অন্ধকার যুগে পৃথিবীর এক প্রান্ত এমন ছিল যেখানে অন্ধকার অধিকতর ঘনিভূত হয়েছিল। সেকালের সভ্যতার নিরিখে যেসব দেশ সভ্যতামণ্ডিত ছিল, তাদের মধ্যে আরব দেশ নিভৃত্তে পড়েছিল। তার আশেপাশে ইরান, রোম ও মিসর দেশগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সভ্যতা ও ভদ্রতার কিছু আলোক রেখা পাওয়া যেতো। কিন্তু বড়ো বড়ো বালুর সমুদ্র আরবদেরকে তাদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। আরব বনিকগণ উটের পিঠে চড়ে কয়েক মাসের পথ অতিক্রম করে ওসব দেশে ব্যবসার জন্যে যেতো এবং শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান করে চলে আসতো। জ্ঞান ও সভ্যতার কোনো আলো তাদের সাথে আসতো না। তাদের দেশে না কোনো শিক্ষক ছিল, আর না কোনো পুস্তাকালয়। মানুষের মধ্যে না কোনো শিক্ষার চর্চা ছিল, আর না জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতি কোনো অনুরাগ। সারা দেশে গণনার যোগ্য কিছু লোক ছিল যারা লেখা-পড়া করতে পারতো। তাদের অবশ্যি এক উচ্চাংগের ভাষা ছিল যার ভেতর দিয়ে তাদের উচ্চ ধারণা প্রকাশ করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। তাদের মধ্যে অতি সুন্দর সাহিত্যিক রুচিবোধও ছিল। কিন্তু তাদের সাহিত্যের যা কিছু অবশিষ্ট জিনিস আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা দেখে জানা যায় যে, তাদের জ্ঞান কত সীমিত ছিল, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তাদের স্থান কত নীচে ছিল, তারা কতখানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের চিন্তাধারা ও স্বভাব প্রকৃতিতে কত অজ্ঞতা ও পাশবিকতার ছাপ এবং তাদের নৈতিক ধ্যান-ধারণা কত কুৎসিত ছিল।

সেখানে যথারীতি কোনো সরকার ছিল না ও কোনো আইন-কানুন ছিল না। প্রত্যেক গোত্র আপন স্থানে স্বাধীন ছিল। শুধুমাত্র 'বন্য আইন' (Law of Jungle) চলতো। যে ব্যক্তির যার উপর ক্ষমতা চলতো সে তাকে হত্যা করতো এবং তার সম্পদ হস্তগত করতো। একজন আরব বেদুইন এ কথা বুঝতেই পারতো না যে, যে ব্যক্তি তার গোত্রের নয় তাকে কেন সে মেরে ফেলবে না এবং তার সম্পদেরই বা কেন অধিকারী হবে না।

নৈতিকতা, সভ্যতা ও ভদ্রতার যা কিছু ধারণা তাদের মধ্যে ছিল তা ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং অসংলগ্ন। পাক-নাপাক, জায়েয-নাজায়েয এবং ভদ্রতা-অভদ্রতার পার্থক্য তাদের প্রায় অজানা ছিল। তাদের জীবনধারা ছিল অত্যন্ত নোংরা। তাদের রীতি-পদ্ধতি পাশবিক ছিল। ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি, রাহাজানি, হত্যা ও রক্তপাত তাদের জীবনের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তারা একে অপরের সামনে বিনা দ্বিধায় উলংগ হতো। তাদের নারীরা পর্যন্ত উলংগ হয়ে কা'বাঘরের তাওয়াফ করতো। তারা তাদের আপন কন্যা সন্তানকে আপন হাতে জীবিত দাফন করতো শুধু এ অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণায় যে, কেউ যেন তার জামাই হতে না পারে। বাপের মৃত্যুর পর তারা তাদের সৎ মাকে বিয়ে করতো। আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাহারাত বা পবিত্রতা সম্পর্কে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও তাদের ছিল না।

ধর্মের ব্যাপারে তারা ঐসব অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার অংশিদার ছিল যার মধ্যে সেকালের দুনিয়া নিমজ্জিত ছিল।[১] প্রতিমা পূজা, প্রেতাত্মার পূজা, গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা, মোটকথা এক খোদার ইবাদাত আনুগত্যের পরিবর্তে সে সময়ে দুনিয়ায় যত প্রকারের পূজা উপাসনা ছিল তা সবই তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অতীতের নবীগণ এবং তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে তাদের কোনো সঠিক জ্ঞান ছিল না। তারা শুধু এতোটুকু জানতো যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তারা জানতো না যে, এ দুই পিতা পুত্রের 'দ্বীন' কি ছিল এবং তাঁরা কার ইবাদাত করতেন। আদ এবং সামুদের কাহিনীও তাদের ভালোভাবে জানা ছিল। কিন্তু তাদের যে বিবরণ আরব ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়লে দেখা যাবে যে, তার মধ্যে কোথাও হযরত সালেহ (আ) এবং হযরত হুদ (আ)-এর শিক্ষার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ইহুদী এবং ঈসায়ীদের মাধ্যমে তাদের নিকটে বনী ইসরাঈলের নবীগণের জীবন কাহিনীও পৌঁছেছিল। তাঁরা কেমন ছিলেন তা অনুমান করার জন্যে যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা ইসলামের তফসীকারগণ উদ্ধৃত করেছেন, তা এক নজর দেখলেই যথেষ্ট হবে। তাতে জানতে পারা যাবে যে, আরববাসী এবং স্বয়ং বনী ইসরাঈল যে সকল নবী সম্পর্কে অবহিত ছিল তাঁরা কোন্ ধরনের মানুষ ছিলেন এবং নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা কতখানি নিকৃষ্ট ধরনের ছিল।[৩৫৩]

হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আনুগত্যের গর্ব

জাহিলী যুগের আরববাসী নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুসারী মনে করতো। এ জন্যে তাদের ধারণা ছিল যে, যে ধর্ম তারা মেনে চলছে তা ছিল আল্লাহর মনোপূত ধর্ম। কিন্তু তারা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর নিকট থেকে যে দীনের শিক্ষা পেয়েছিল তার মধ্যে পরবর্তী শতাব্দীগলোতে ধর্মীয় নেতাগণ, গোত্রীয় সরদারগণ, পরিবারের মুরুব্বীগণ এবং অন্যান্য লোক বিভিন্ন ধরনের আকীদা-বিশ্বাস, আমল, রসম ও রেওয়াজ সংযোজিত করেছে। পরবর্তী বংশধরগণ তাঁকে প্রকৃত ধর্মেরই অংশ মনে করে ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে তা মেনে চলেছে। যেহেতু বর্ণনাগুলোতে ইতিহাসে অথবা কোনো বইপুস্তকে এমন কোনো রেকর্ড সংরক্ষিত ছিল না যার দ্বারা জানতে পারা যেতো যে, প্রকৃত ধর্ম কি ছিল এবং পরবর্তীকালে কখন কে কোন্ জিনিস কিভাবে তার সাথে সংযোজিত করেছে, সে জন্যে আরববাসীর নিকটে তার গোটা দ্বীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছিল। না তারা কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারতো যে এটা সেই প্রকৃত দীনের অংশ যা আল্লাহ প্রেরিত। আর না তারা এটাও জানতো যে, এগুলো বেদআত (ধর্মের নামে নতুন আবিষ্কৃত জিনিস) এবং ভ্রান্ত রসম ও রেওয়াজ যা পরবর্তীকালে লোকেরা সংযোজন করেছে।[৩৫৪]

আরবের মুশরিকদের কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ প্রতিমা

লাত

তার মন্দির ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ তার এতো ভক্ত ছিল যে, যখন আবরাহা হস্তিবাহিনীসহ কা'বাঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন

---

১. আরবের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হয়েছে।—সংকলকদ্বয়

বনী সাকীফের লোকজন শুধু তাদের দেবতার আস্তানা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অত্যাচারী আবরাহাকে মক্কার পথ দেখাবার জন্যে তার সাথে সশস্ত্র প্রহরীর (Escort) ব্যবস্থা করে। যেন সে লাতের গায়ে হাত না লাগায়। অথচ সমগ্র অরববাসীর ন্যায় বনী সাকীফের লোকেরাও এ কথা স্বীকার করতো যে কা'বা আল্লাহর ঘর।

লাতের অর্থ সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জারীর তাবারীর গবেষণায় এটি আল্লাহর স্ত্রী লিংগ। অর্থাৎ আসলে শব্দ ছিল اللهة। (আল্লাহাতুন) যাকে اللات। (আল্-লাত্) করা হয়েছে। যামাখ্শরীর মতে এ لوى يلوى থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ মোড় ফেরানো বা কারো দিকে ঝুঁকে পড়া। যেহেতু মুশরিকরা ইবাদাতের জন্যে তার দিকে মুখ ফেরাতো, তার সামনে ঝুঁকে পড়তো এবং তার তাওয়াফ করতো, সে জন্যে তাকে লাত বলা হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, لت يلت থেকে উৎপন্ন। তার অর্থ মথন করা ও মাখা। তিনি এবং মুজাহিদ বলেন, এটি একজন মানুষ ছিল, যে তায়েফের নিকটে একটি পর্বতশিলায় বাস করতো এবং হজ্বযাত্রীদেরকে ছাতু ও খানা খাওয়াতো। তার মৃত্যুর পর মানুষ সেই শিলার উপর তার মন্দির নির্মাণ করে এবং তার পূজা করতে থাকে। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের মতো দু'জন বুযর্গের লাত সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তা দুই কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম কথা এই যে, কুরআনে তাকে لات (লাত) বলা হয়েছে, لتّ বলা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কুরআন লাত, উয্যা এবং মানাত এ তিনটিকেই দেবী বলে উল্লেখ করেছে আর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী লাত পুরুষ ছিল, নারী নয়।

উয্যা

উয্যা শব্দটি عزت (ইয্যত) থেকে উৎপন্ন এবং তার অর্থ ইয্যতের অধিকারিণী। এটি ছিল কুরাইশদের বিশিষ্ট দেবী এবং তার মন্দির মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখ্লা উপত্যকায় হুরাজ (حراض) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বনী হাশিমের মিত্র বনী শায়বানের লোকেরা এ মন্দিরের খাদেম ছিল। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তার যিয়ারত করতো এবং তার উপরে ভেট চড়াতো। তার নামে কুরবানীও করতো। কা'বার মতো তার দিকে হাদিয়ার পশু নিয়ে যাওয়া হতো এবং সকল দেব-দেবীর চেয়ে তার বেশী সম্মান করা হতো। ইবনে হিশাম বলেন, আবু লুহায়হা যখন মরতে বসলো তখন আবু লাহাব তাকে দেখতে গেল। দেখলো যে, সে কাঁদছে। আবু লাহাব বলল, কাঁদছো কেন? মরণের জন্যে ভয় করছো? তা সকলকে তো মরতেই হবে। সে বললো, আল্লাহর কসম, মরণের ভয়ে আমি কাঁদছি না। আমি কাঁদছি যে, আমার পরে উয্যার পূজা কিভাবে হবে। আবু লাহাব বললো, তার পূজা না তোমার জীবনে তোমার খাতিরে হতো, আর না তোমার পরে তার পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। আবু লুহায়হা বললো, এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, আমার পরে কেউ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

মানাত

তার মন্দির মক্কা ও মদীনার মধবর্তী লোহিত সাগরের তীরে কুদায়মা নামক স্থানে ছিল এবং বিশেষ করে বনী খুযায়া এবং আওস্ ও খায্‌রাজের লোকেরা তার খুবই ভক্ত ছিল। তার যিয়ারত এবং তাওয়াফ করা হতো, তার জন্যে মানতের কুরবানী করা হতো।

হজ্জের সময় যখন হাজীগণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাত ও মিনার কাজ শেষ করতো তখন সেখান থেকে মানাতের যিয়ারতের জন্যে 'লাব্বায়কা-লাব্বায়কা' ধ্বনী করতে করতে অগ্রসর হতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা-মারওয়ার সায়ী করতো না।

নূহের জাতির দেব-দেবী

নূহের জাতির দেব-দেবীদের মধ্যে সূরা নূহে শুধু ঐসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে আরববাসী যাদের পূজা করা শুরু করে। ইসলামের সূচনাকালে আরবের স্থানে স্থানে তাদের মন্দির স্থাপিত ছিল। হতে পারে যে, তুফানে যারা জীবিত রয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখে পরবর্তী বংশধরগণ নূহের জাতির প্রাচীন দেব-দেবীর কথা শুনেছিল এবং যখন তাঁর বংশধরগণের মধ্যে নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা ঐসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে পুন তাদের পূজা শুরু করে।

এক ঃ ওয়াদ্দ

কুযায়া গোত্রের শাখা বনী কাল্‌ব্‌ বিন ওয়াব্‌রা-এর দেবতা ছিল 'ওয়াদ্দ', যার মন্দির তারা "দুমাতুল জান্দাল"-এ নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম ওয়াদ্দাম্‌ আবাম্‌ লিখিত পাওয়া যায়। কাল্‌বীর বর্ণনা মতে প্রতিমাটি বিরাট দেহ বিশিষ্ট পুরুষের আকারে নির্মিত ছিল। কুরাইশরাও তাকে খোদা বলে মানতো এবং তাদের নিকটে তার নাম ওদ্দ্‌ ছিল। তার নামানুসারে ইতিহাসে আবদে ওদ্দ্‌ নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুই ঃ সুআ' (سواع)

এ ছিল হুযায়ইল গোত্রের দেবী এবং তার প্রতিমা নারী মূর্তি বিশিষ্ট ছিল। ইয়াম্বুর নিকটে রুবীত নামক স্থানে তার মন্দির ছিল।

তিন ঃ ইয়াগুস্‌

তাঈ গোত্রের শাখা আনৃউম্‌ এবং মুযহেজ গোত্রের কতিপয় শাখার দেবতা ছিল ইয়াগুস্‌। মুযহেজ গোত্রের লোকেরা ইয়ামেন ও হেজাজের মধ্যবর্তী জুর্না নামক স্থানে তার প্রতিমা স্থাপন করে রেখেছিল। সে ছিল বাঘের আকৃতি বিশিষ্ট। কুরাইশদের মধ্যেও কারো কারো নাম আবদে ইয়াগুস্‌ পাওয়া যায়।

চার ঃ ইয়াউক্‌

এ ছিল ইয়ামেন অঞ্চলের হামদান গোত্রের শাখা খাইওয়ানের দেবতা। সে ছিল ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট।

পাঁচ ঃ নাস্‌র

খিম্‌ইয়ার অঞ্চলে খিম্‌ইয়ার গোত্রের শাখা 'যুল্‌কুলা'-এর দেবতা ছিল নাস্‌র। বাল্‌খা নামক স্থানে গাধার আকৃতিতে তার প্রতিমা স্থাপিত ছিল। সাবা জাতির প্রাচীন শিলা-লিপিতে তার নাম 'নাসুর' বলে লিখিত পাওয়া যায়। তার মন্দিরকে লোক বায়তে নাসুর এবং পূজারীদেরকে আহলে নাসুর বলতো। প্রাচীন মন্দিরসমূহের যেসব ধ্বংসাবশেষ

আরব ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অনেক মন্দিরের দরজায় গাধার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।[৩৫৬]

বিখ্যাত প্রতিমা বা'ল (بعل)

اَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ الصفت ١٢٥

"তোমরা কি বা'লকে ডাকো এবং সবচেয়ে ভালো সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করে চল ?"
–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১২৫

বা'লের আভিধানিক অর্থ প্রভু, সরদার মালিক। স্বামীর জন্যেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানেও এ শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ্, আয়াত ২২৮ ; সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৮ ; সূরা হূদ, আয়াত ৭২ এবং সূরা আন নূর, আয়াত ৩১। কিন্তু প্রাচীন যুগের সাস বংশীয় জাতিগুলো এ শব্দকে ইলাহ্ বা খোদা অর্থে ব্যবহার করতো। তারা এক বিশেষ দেবতাকে বা'ল নামে অভিহিত করে। বিশেষ করে লেবাননের ফিনিকী জাতির (Phoenicians) সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিল বা'ল এবং তার স্ত্রী এস্তারাত (Ashtoreth) ছিল সকলের বড়ো দেবী। গবেষকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, বা'ল বলতে সূর্য বুঝায়। না বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter), আর এস্তারাত বলতে চন্দ্র বুঝায়, না শুক্র গ্রহ (Venus)। যাই হোক, এ কথা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, বেবিলন থেকে নিয়ে সির পর্যন্ত গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বা'লের পূজা বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মুশরিক জাতিগুলো মারাত্মকভাবে এতে লিপ্ত ছিল।

বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিন এবং পূর্ব জর্দানে পুনর্বাসিত হলো এবং তাওরাতের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুশরিক জাতির সাথে বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগলো। তখন তারাও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। বাইবেল বলে, মূসা (আ)-এর প্রথম খলিফা হযরত ইউশা বিন নূন্-এর মৃত্যুর পরেই বনী ইসরাঈলের মধ্যে ঐ নৈতক ও দ্বীনী পতন শুরু হয়।

–"ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল ; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। .... সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুদ্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল,"–বিচারকর্ত্তৃগণ ২ ঃ ১১-১৩

–"ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিকীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়গণের মধ্যে বসতি করিল ; আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।"-বিচারকর্ত্তৃগণ ৩ ঃ ৫-৬

সে সময়ে বা'ল পূজা ইসরাঈলীদের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করলো যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের একটি বস্তিতে বা'লের কুরবানীগাহ্ বানানো হয়েছিল যেখানে কুরবানী করা হতো। একজন খোদাপুরস্ত ইসরাঈলী এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাত্রি বেলা চুপে চুপে কুরবানীর স্থান ভেঙে ফেলে। পরের দিন এক বিরাট সমাবেশে জনতা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো, যে শিরকের এ আড্ডা ভেঙে দিয়েছিল।

অবশেষে হযরত সামবিল, তালূত, হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তাঁরা শুধু বনী ইসরাঈলেরই সংশোধন করেননি, বরঞ্চ নিজেদের গোটা রাজ্যেই সাধারণভাবে শির্‌ক ও মূর্তিপূজা দমন করেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর পর এ ফেতনা আবার মাথাচাড়া দিল এবং বিশেষ করে উত্তর ফিলিস্তিনের ইসরাঈলী রাষ্ট্র বা'ল পূজায় নিমজ্জিত হলো।[৩৫৭]

মূর্তি পূজার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে উচ্চতর ধারণা

আরবের মুশরিকগণ একথা স্বীকার করতো যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই দিন ও রাতের আবর্তন বিবর্তন ঘটান। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাদের মধ্যে কারো এ বিশ্বাস ছিল না যে, এসব কাজ লাত, হুবল, উয্যা অথবা অন্য কোনো দেবতার ছিল।[৩৫৮]

আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের ধারণা-বিশ্বাস কি ছিল, কুরআনে স্থানে স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন সূরা যুখরুফে আছে, "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদেরকে কে পয়দা করেছে। তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ" (আয়াত ৮৭)। সূরা আনকাবুতে আছে, "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আসমান-যমীন কে পয়দা করেছে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে–আল্লাহ।---এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করালেন এবং কে মৃতবৎ পড়ে থাকা যমীনকে জীবিত করলেন। তারা অবশ্যই বলবে–আল্লাহ।"–আয়াত ৬১, ৬৩

সূরা মুমিনূনে আছে, "তাদেরকে বল, এ যমীন এবং তার সকল অধিবাসী কার বলো দেখি, যদি তোমাদের জানা থাকে ? তারা অবশ্যই বলবে–আল্লাহর।----তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, সাত আসমান এবং বিরাট আরশের মালিক কে ? তারা অবশ্যই বলবে–আল্লাহ। ----তাদেরকে বল, তোমরা যদি জান তাহলে বলো দেখি, প্রত্যেক বস্তুর উপর কর্তৃত্ব প্রভুত্ব কার ? আর কে আছে যে আশ্রয় দেয় এবং তাঁর মুকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না ? তারা নিশ্চয় জবাবে বলবে–এত সব আল্লাহর জন্যে।"–আয়াত ৮৪-৮৯

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, "তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিয্‌ক কে দেয় ? এই যে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি, যা তোমরা লাভ করেছ, কার এখতিয়ারে ? এবং কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবত থেকে বের করে ? এবং কে বিশ্ব শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করছে ? তারা অবশ্যই বলবে–আল্লাহ" (আয়াত ৩১)। সূরা ইউনুসে আর এক স্থানে আছে, তোমরা যখন নৌকায় চড়ে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ সহকারে সফর করতে থাক, তারপর প্রতিকূল হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত লাগতে থাকে, আর মুসাফির মনে করে যে, তারা ঝড়-ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়েছে, তখন তারা নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খালেস করে তাঁরই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর তাহলে আমরা তোমারই কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে নেন, তখন তারাই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে দুনিয়ার বুকে বিদ্রোহ করা শুরু করে"–(আয়াত ২২-২৩)। একথা সূরা বনী ইসরাঈলে এভাবে বলা হয়েছে, "যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন ঐ এক আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আর যাকে যাকে ডাকো তারা সব হারিয়ে যায়,

কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌছিয়ে দেন। তখন তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও" (আয়াত ৬৭)।[৩৫৯]

সম্পদে আল্লাহর সাথে দেব-দেবীর অংশ

তারা (মুশরিক) স্বয়ং এ কথা স্বীকার করতো, যে যমীন আল্লাহর এবং শস্য তিনিই উৎপন্ন করেন। ঐসব পশুর স্রষ্টাও আল্লাহ এবং তারা তাদের জীবনে ঐসব পশুর খেদমত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ধারণা এই ছিল যে, ঐসব দেব-দেবী, ফেরেশতা, জ্বিন, আকাশের তারকারাজি এবং মৃত বুযর্গাণের আত্মাসমূহ তাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি রাখতেন বলে তাদের মধ্যস্থতায় ও বরকতেই তাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ হয়েছে। সে জন্যে তারা তাদের ক্ষেতের ফসল ও পশু থেকে দু'টি অংশ বের করতো। এক অংশ আল্লাহর নামে এ কতৃজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে যে, তিনি এ শস্য এবং পশু তাদেরকে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংশ আপন গোত্র বা পরিবারের পৃষ্ঠপোষক দেব-দেবীর নযর নিয়াযের জন্যে, যেন তাদের কৃপা তাদের প্রতি বর্ষিত হয়।[৩৬০]

আল্লাহর উপর প্রতিমাদের অগ্রাধিকার দান

তারা আল্লাহর নামে সম্পদের যে অংশ বের করতো, নানান ছলচাতুরি করে তাও হ্রাস করে ফেলতো। সর্বপ্রকারে নিজেদের তৈরী অংশীদারদের অংশ বাড়াবার চেষ্টা করতো। এর থেকে বুঝা যায় যে, তাদের এসব অংশীদারদের প্রতি তারা যতোটা গুরুত্ব দিত ততোটা আল্লাহর প্রতি দিত না। যেমন, যেসব খাদ্যশস্য বা ফল প্রভৃতি আল্লাহর নামে বের করা হতো, তার মধ্য থেকে যদি কিছু পড়ে যেতো, তাহলে তা অংশীদারদের ভাগে দিয়ে দেয়া হতো। আর যদি অংশীদারদের অংশ থেকে কিছু পড়ে যেতো অথবা আল্লাহর অংশে মিশে যেতো, তাহলে তা অংশীদারের ভাগে দিয়ে দেয়া হতো। ক্ষেতের যে অংশ অংশীদারদের (আল্লাহর অংশীদার) জন্যে নির্ধারিত করা হতো, তার থেকে যদি পানি বয়ে আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত অংশে যেতো, তাহলে তার সমুদয় ফসল আল্লাহর অংশীদারদের ভাগে দিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু এর বিপরীত হলে আল্লাহর অংশে কিছু বর্ধিত করা হতো না। যদি খরা হওয়ার কারণে নযর নিয়াযের ফসল নিজেদের খাওয়ার প্রয়োজন হতো। তাহলে আল্লাহর অংশের ফসল খেয়ে ফেলতো। কিন্তু আল্লাহর শরীকদের অংশে হাত দিতে তারা ভয় করতো যে, কি জানি কোনো বিপদ না এসে পড়ে। যদি কোনো কারণে অংশীদারদের ভাগে কম পড়তো, তাহলে আল্লাহর অংশ থেকে তা পূরণ করা হতো। কিন্তু আল্লাহর অংশে কম পড়লে, শরীকদের অংশ থেকে একটি শস্যাদানাও দেয়া হতো না। এ ধরনের আচরণের কেউ সমালোচনা করলে নানান ধরনের মনভুলানো অজুহাত পেশ করা হতো। যেমন, তারা বলতো, আল্লাহ তো ধনবান, তাঁর অংশ থেকে কিছু কম হলে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। আর এরা তো বেচারা বান্দাহ-আল্লাহর মতো ধনী নয়। সে জন্যে কিছু কম-বেশী হলে তারা ধরে বসবে।

এসব কুসংস্কারের মূলে কি ছিল তা বুঝতে হলে জেনে রাখা দরকার যে, অজ্ঞ আবরবাসী তাদের সম্পদের যে অংশ আল্লাহর জন্যে বের করতো তা ফকীর, মিসকিন, এতিম, মুসাফির প্রভৃতির সাহায্যে ব্যয়িত হতো। আর যে অংশ আল্লাহর শরীকদের নযর নিয়াযের জন্যে বের করা হতো। তা হয়তো সরাসরি ধর্মীয়-শ্রেণীর পেটে যেতো অথবা

আস্তানায় ভেট দেয়া হতো। ফলে তা পরোক্ষভাবে পূজারী ঠাকুরদের উদরস্থ হতো। এ জন্যে তাদের স্বার্থান্ধ ধর্মীয় নেতাগণ শত শত বছরের ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে তাদের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, আল্লাহর অংশে কিছু কম হলে তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু আল্লাহর প্রিয়দের অংশে কম হওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ কিছু বেশী হওয়াই ভালো।[৩৬১]

মুশরিকদের সত্যিকার গোমরাহি কি ছিল ?

যদিও মক্কার মুশরিকগণ একথা অস্বীকার করতো না যে, সকল সম্পদ আল্লাহরই দেয়া এবং এসব সম্পদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহও তারা স্বীকার করতো—অস্বীকার করতো না। কিন্তু যে ভুল তারা করতো তাহলো এই যে, এসব সম্পদ ও নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে তারা ঐসব অনেক সত্তারও শুকরিয়া কথা ও কাজের দ্বারা আদায় করতো। কারণ তাদেরকে তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকেই এসব নিয়ামত বা সম্পদ দানে হস্তক্ষেপকারী ও অংশীদার মনে করতো।

এটাকেই কুরআন—'আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকৃতি' বলে উল্লেখ করেছে। কুরআনে এ কথাকে একটা পরিপূর্ণ বিধি হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করা যদি হয় এমন কারো কাছে যে, অনুগ্রহকারী নয়, তাহলে প্রকৃত অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা বা নিমকহারামিই করা হয়। এমনিভাবে কুরআন এটাকেও একটা নীতি হিসেবে পেশ করেছে যে, অনুগ্রহকারী বা সম্পদদাতা সম্পর্কে কোনো যুক্তি প্রমাণ ব্যতিরেকে যদি এমন ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর আপন অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বশে এসব দান করেননি, বরঞ্চ করেছেন অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে, অথবা অমুকের সম্মানে, অথবা অমুকের সুপারিশক্রমে বা হস্তক্ষেপে, তাহলে তাও হবে প্রকৃতপক্ষে তাঁর দানের অস্বীকৃতি।[৩৬২]

নিজেদের খোদাগুলো সম্পর্কে আরববাসীর ধারণা

আরববাসী যদিও শিরকে লিপ্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তাদের চরম গোঁড়ামি ছিল, তথাপি তাদের শিরকের মূল শুধু উপরিভাগেই সীমিত ছিল, গভীরে পৌঁছতে পারেনি। দুনিয়ার কোথাও এবং কখনোও শিরকের মূল মানব প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে খাঁটি আল্লাহপুরস্তির মহত্ব তার মনের গভীরে বিদ্যমান ছিল। তাকে উদ্বুদ্ধ ও উদ্বেলিত করার জন্যে উপরিভাগকে সজোরে একটু ঘর্ষণ করার প্রয়োজন হয়।

জাহেলিয়াতের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা এ দুটি বিষয়ের সাক্ষ্যদান করে। যেমন আবরাহার আক্রমণের সময় কুরাইশের আবাল বৃদ্ধবনিতা জানতো যে, কা'বাঘরে রক্ষিত প্রতিমাগুলো এ বিপদ ঠেকাতে পারে না, বরঞ্চ এ ঘর যে আল্লাহর একমাত্র তিনিই ঠেকাতে পারেন। আজও সে সব কবিতা ও প্রশংসাসূচক গীতিকাব্য সংরক্ষিত আছে, যেগুলো আসহাবে ফীলের ধ্বংসের উল্লাসে সমকালীন কবিগণ পাঠ করেন। তাদের প্রতিটি শব্দ সাক্ষ্যদান করে যে, তারা এ ঘটনাকে নিছক আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিস্ময়কর প্রকাশ মনে করতো। তারা সামান্যতম ধারণাও পোষণ করতো না যে, এ ব্যাপারে তাদের দেব-দেবীর কোনো হাত ছিল। এ ঘটনায় শিরকের এ নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডও কুরাইশ এবং সকল মুশরিকদের সামনে ধরা পড়লো যে, আবরাহা যখন মক্কার পথে তায়েফ পৌঁছলো

তখন তায়েফবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, কি জানি তাদের 'লাত' দেবতার মন্দিরও যদি ধ্বংস করে দেয়। সে জন্যে কা'বাঘর ধ্বংস করার জন্যে তারাও তাদের খেদমত আবরাহার কাছে পেশ করলো এবং তাদের সাথে তাদের নিজেদের সশস্ত্র প্রহরী বাহিনী পাঠালো যাতে পাহাড়ী পথে তাদেরকে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এ ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুদিন যাবত কুরাইশদেরকে পীড়া দিতে থাকে এবং কয়েক বছর যাবত তারা ঐ ব্যক্তির কবরে পাথর ছুড়তে থাকে, যে তায়েফের প্রহরী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

তাছাড়া কুরাইশ এবং অন্যান্য আরববাসী তাদের ধর্মকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করতো। নিজেদের বহু ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে হজ্জের নিয়ম-প্রণালী ইবরাহীমী দ্বীনের অংশ বলে তারা গণ্য করতো।

তাদের এ কথাও জানা ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) খাঁটি আল্লাহপুরস্ত ছিলেন। তিনি কখনো প্রতিমা পূজা করেননি। তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে এ বিবরণও লিপিবদ্ধ ছিল যে, প্রতিমাপূজা তাদের মধ্যে কখন্ প্রচলিত হয় এবং কোন্ প্রতিমা কে কখন্ কোথা থেকে এনেছিল।

নিজেদের দেব-দেবীর প্রতি সাধারণ আরববাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা কতখানি ছিল তার ধারণা এর থেকে করা যায় যে, যখন দোয়া এবং কামনা-বাসনার বিপরীত কোনো ঘটনা ঘটতো, তখন অনেক সময় তারা তাদের দেবতার অপমানও করতো এবং তার নযর নিয়ায বন্ধ করে দিত। একজন আরববাসী তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল এবং যুল্-খালাসা দেবতার নিকটে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে গুটি চালালো। জবাবে যে গুটি বেরুলো তাতে বলা হলো–এ কাজ করো না। এতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলো–

لَوْ كُنْتَ يَا ذَا الْخَلَصِ الْمَوْتُوْرَا مِثْلِيْ وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوْرَا
لَمْ تَنْهَ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرًا

"হে যুল্-খালাসা, আমার স্থানে যদি তুমি হতে এবং তোমার বাপকে মারা হতো, তাহলে তুমি কক্ষণো এ মিথ্যা কথা বলতে না যে, যালিমের প্রতিশোধ নিও না।"

আর একজন আরববাসী তার উটের পাল নিয়ে গেল সাদ নামক এক মন্দিরে এ আশায় যে, সে কিছু বরকত লাভ করবে। কিন্তু প্রতিমাটি ছিল লম্বা চওড়া কিম্ভূতকিমাকার এবং তার গায়ে কুরবানীর রক্ত লেগেছিল। উটগুলো তাকে দেখে ভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে গেল। উটগুলোকে এভাবে চারদিকে পলায়নপর দেখে সে ভয়ানক রেগে গেল এবং সে দেবতাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে ছুড়তে বলতে লাগলো, আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। আমি এসেছিলাম বরকত নেবার জন্যে আর তুমি আমার উটগুলো তাড়িয়ে দিলে?[১]

---

১. এ বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহপুরস্তির প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাদের অন্তরে ছিল। কিন্তু একদিকে তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে কুরাইশ ঠাকুর পুরোহিত আল্লাহপুরস্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াবার কাজে লিপ্ত ছিল। কারণ দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা খতম হয়ে গেলে তাদের আশংকা ছিল, আরবে তাদের যে কেন্দ্রীয় মর্যাদা ছিল তা শেষ হয়ে যাবে। উপরন্তু তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এসব অবলম্বনের উপরে যে শিরকের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা তাওহিদী দাওয়াতের মুকাবিলায় সসম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এ কারণেই কুরআন মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলে, তোমাদের সমাজে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীগণ যেসব কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং খাঁটি আল্লাহপুরস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এ দিক দিয়ে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মুশরিকগণ মুখে স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু অন্তরে তার গুরুত্ব তারা অনুভব করতো।[৩৬৪]

অনেক দেব-দেবী এমন ছিল যাদের সম্পর্কে ঘৃণ্য ও অশ্লীল গল্প কাহিনী কথিত ছিল। এসাফ্ ও নায়েলার মূর্তি সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির উপর স্থাপিত ছিল। তাদের সম্পর্কে এ কাহিনী মশহুর ছিল যে, তারা দুই নারী-পুরুষ ছিল এবং তারা কা'বার ঘরে ব্যভিচার করে। এ অপরাধে আল্লাহ্ তাদেরকে পাথরে পরিণত করে দেন। যেসব দেব-দেবীর প্রকৃত পরিচয় এই, পূজারীদের অন্তরে তাদের জন্যে কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা স্থান পেতে পারে না।[৩৬৩]

সালফ সালিহীনের মূর্তি পূজা

আরবের বিভিন্ন গোত্র—যথা রাবীয়াহ্, গাস্সান, কাল্ব্, তাগলীব, কুযায়া, কেনানা, হার্স, কা'ব, কিন্দাহ্ প্রভৃতি গোত্রগুলোর মধ্যে বহু সংখ্যক ইহুদী-খৃস্টান ছিল। এ উভয় ধর্মই আম্বিয়া, আউলিয়া এবং শহীদানের পূজা-পার্বণে লিপ্ত ছিল। তারপর আরবের মুশরিকদের অধিকাংশ না হলেও বহু উপাস্য এমন ছিল যারা মূলে ছিল মানুষ। পরবর্তী বংশধরগণ তাদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস্, ইয়াউক্ ও নসর এসব নেক লোকের নাম। পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁদেরকে উপাস্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসাফ্ এবং নায়েলা উভয়েই ছিল মানুষ। এ ধরনের বর্ণনা লাত, মানাত এবং উয্যা সম্পর্কেও পাওয়া যায়। মুশরিকদের এ ধারণা-বিশ্বাসও বর্ণনা করা হয়েছে যে, লাত ও উয্যা আল্লাহ্ তাআলার এমন প্রিয় ছিল যে, আল্লাহ্ শীতে লাতের নিকটে এবং গরমে উয্যার নিকটে অবস্থান করতেন।—মায়াযাল্লাহ্, সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা আম্মা ইয়াসিফুন)।[৩৬৫]

কবরবাসীদের পূজা

সূরা আন নাহলের ২১নং আয়াতে বিশেষ করে যেসব বানোয়াট উপাস্যদের খণ্ডন করা হয়েছে তারা ফেরেশতা, জ্বিন, শয়তান অথবা কাঠ-পাথর নির্মিত প্রতিমা নয়। বরঞ্চ তারা কবরবাসী। এজন্যে যে ফেরেশতা ও শয়তান তো জীবিত সত্তা। তাদের জন্যে أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ শব্দাবলীর প্রয়োগ হতে পারে না এবং কাঠ ও পাথরের প্রতিমাগুলোর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ জন্যে مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ শব্দগুলোও তাদেরকে ধর্তব্যের বাইরে গণনা করছে। এখন এ আয়াতে الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এর অর্থ অবশ্যম্ভাবীরূপে সেসব আম্বিয়া, আউলিয়া, শুহাদা, সালেহীন এবং অন্যান্য অসাধারণ মুসলমানই হবেন যাঁদেরকে চরমপন্থী ভক্তের দল-দাতা, বিপদ-ভঞ্জনকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, গরীব নওয়ায বা গরীবের ত্রাণকর্তা, গঞ্জবখ্শ এবং এ ধরনের নানান বিশেষণে ভূষিত করে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদন করা শুরু করে। এর জবাবে যদি কেউ বলে যে, আরবে এ ধরনের কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব ছিল না, তাহলে আমরা বলব যে, এ হচ্ছে আরবের জাহিলী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে তার অজ্ঞতারই প্রমাণ।[৩৬৬]

ফেরেশতাদের স্ত্রীমূর্তির পূজা

মৌলিক উপাখ্যান থেকে জানতে পারা যায় যে, আরবে কুরাইশ, জুহানিয়া, বনী সালমা, খুযায়া, বনী মুলায়াহ্ এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর এ বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতারা

আল্লাহ তাআলার কন্যা ছিলেন।[১] ফেরেশতাদেরকে তারা দেবী মনে করতো এবং নারী আকৃতিতে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখতো, তাদেরকে নারীর পোশাক এবং অলংকার পরিয়ে দিত এবং বলতো, এরা সব আল্লাহর কন্যা। তারা তাদের পূজা করতো, কামনা-বাসনা পূরণের জন্যে তাদের নামে মানত করতো।

ভাগ্যের দোহাই

তাদের এ অজ্ঞতার প্রতিবাদ করলে তারা ভাগ্যের দোহাই পারতো। বলতো, আল্লাহ যদি এ কাজ পছন্দ না করতেন, তাহলে আমরা কি করে এসব প্রতিমা পূজা করতাম?

অথচ আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ জানার মাধ্যম হচ্ছে তাঁর কেতাবগুলো। কিন্তু ঐসব কাজ নয় যা দুনিয়ায় তাঁর ইচ্ছায় চলছে। দুনিয়ায় তো প্রতিমা পূজা কেন, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার সবই তাঁর ইচ্ছায় চলছে। এ যুক্তি দিয়ে কি ঐ প্রত্যেকটি মন্দ কাজকে জায়েয বা ন্যায়সংগত বলা যাবে যা দুনিয়ার বুকে হচ্ছে? দুনিয়ায় কোনো কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়ার অর্থ এ নয় যে, এ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট।

বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ

তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, এ ভ্রান্ত যুক্তি ছাড়া আর কোনো প্রামাণ্য যুক্তি আছে কি? তদুত্তরে তারা বলতো—এতো বাপ-দাদা থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে এই হলো যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ। অথচ যে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়াটা ছিল সকল গৌরব অহংকারের কারণ, তিনি তো বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের এ ধরনের অন্ধ অনুসরণ নাকচ করে দিয়েছিলেন। কারণ তার কোনো যুক্তিসংগত দলিল প্রমাণ ছিল না। এসব লোকদের যদি পূর্বপুরুষদের অনুসরণই করতে হতো তাহলে তার জন্যে তাদের মহানতম পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বাদ দিয়ে তাদের অজ্ঞতম বাপ-দাদার অনুসরণ করলো কেন?

ঈসায়ীদের গোমরাহি থেকে পৌত্তলিক আরববাসীদের যুক্তি প্রদর্শন

যদি তাদেরকে বলা হতো, কখনো কোনো নবী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো কিতাব এ শিক্ষা দিয়েছে কি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য? তাহলে তারা ঈসায়ীদের কর্মকাণ্ড দলিল হিসেবে পেশ করে বলতো যে, তারাও তো ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নিয়েছে এবং তার পূজা করছে। অথচ প্রশ্ন এটা ছিল না যে, কোনো নবীর উম্মত শিরক করেছে কি না। বরঞ্চ প্রশ্ন ছিল এই যে, স্বয়ং কোনো নবী শিরকের শিক্ষা দিয়েছেন কি না। ঈসা ইবনে মারইয়াম কি কখনো একথা বলেছিলেন, আমি আল্লাহর পুত্র এবং তোমরা আমার পূজা কর? দুনিয়ার প্রত্যেক নবীর যে শিক্ষা ছিল, তাঁরও তাই ছিল। অর্থাৎ আমার ইলাহও আল্লাহ এবং তোমাদের ইলাহও আল্লাহ। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর।[৩৬৭]

---

১. তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা বিশ্বাসের প্রতিবাদ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে। যেমন, সূরা আন নিসা আয়াত ১১৭, সূরা আন নামল ৫৭-৫৮, বনী ইসরাঈল ৪০, যুখরুফ ১৬-১৯, নাজম আয়াত ২১-২৭ দ্রষ্টব্য।

মুশরিকদের উপাস্য দেব-দেবীর প্রকার

সারা দুনিয়ার মুশরিকরা আল্লাহ্ ছাড়া যে সকল সত্তার নিকটে দোয়া চাইতো এবং আরববাসীও যাদের কাছে দোয়া চাইতো তারা তিন প্রকারের।* এক. প্রাণহীন ও জ্ঞানহীন সৃষ্টি। দুই. ঐ সকল নেক ও বুযর্গ ব্যক্তি যাঁরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তিন. ঐসব পথভ্রষ্ট লোক যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। প্রথম প্রকারের উপাস্য দেবতা বা খোদা যে, তাদের পূজারীদের দোয়া সম্পর্কে একেবারে বেখবর তা অতি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারের খোদা, যাঁরা দুনিয়াতে আল্লাহর পিয়ারা ছিলেন তাঁদেরও বেখবর থাকার দু'টি কারণ আছে। এক হচ্ছে এই যে, তাঁরা আল্লাহর নিকটে এমন অবস্থায় আছেন যে, মানুষের কোনো আওয়াজ তাঁদের কাছে পৌছে না। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ তাঁদের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দেন না যে, যাঁদেরকে তাঁরা সারাজীবন আল্লাহর নিকটে দোয়া চাওয়া শিক্ষা দিলেন, তাঁরা উল্টা তাঁদের কাছেই দোয়া চাইছে। এ খবর তাঁদেরকে পৌছানো হয় না এ জন্যে যে, এর চেয়ে দুঃখজনক সংবাদ তাঁদের কাছে আর কিছু হতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাহদের আত্মাকে কষ্ট দেয়া কিছুতেই পসন্দ করেন না। তারপর তৃতীয় প্রকারের খোদাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে যে, তাদেরও বেখবর থাকার দু'টি কারণ আছে। একটা হচ্ছে এই যে, তারা অভিযুক্ত হিসেবে খোদার হাজতে বন্দী আছে যেখানে দুনিয়ার কোনো আওয়াজই পৌছে না। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাদেরকে এ সংবাদ পৌছান যে, দুনিয়াতে তাদের মিশন খুবই কৃতকার্যতা লাভ করছে এবং তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদেরকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের সংবাদ তাদের জন্যে খুবই আনন্দদায়ক হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কিছুতেই জালেম পাপাচারীদের আত্মাকে খুশী করতে চান না।[৩৬৯]

ঐসব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়াতে দেব-দেবী মনে করে পূজা করা হয়েছে এবং ঐসব জ্বিন, আত্মা, পূর্ব পুরুষ, আম্বিয়া, আউলিয়া শহীদান প্রভৃতি যাদেরকে খোদার গুণাবলীর অংশীদার মনে করে তাদেরকে ঐসব অধিকার দেয়া হয়েছে —যা প্রকৃত পক্ষে ছিল খোদার, তাঁরা সেখানে (আখেরাতে) তাদের পূজারীদের সুস্পষ্ট করে বলে দেবেন, আমাদের তো মোটে জানাই ছিল না যে, তোমরা আমাদের পূজা অর্চনা কর। তোমাদের কোনো দোয়া, কাকুতি-মিনতি, কোনো ফরিয়াদ, কোনো আর্তনাদ, কোনো নযর-নিয়ায, কোনো নৈবেদ্য-উৎসর্গ, কোনো প্রশংসা, আমাদের নামের কোনো তপ-জপ, কোনো সেজদা করণ, আস্তানা চুম্বন, দরগাহ পূজা কিছুই আমাদের কাছে পৌছেনি।[৩৭০]

আরবে বেশ্যাবৃত্তির পদ্ধতি

আরবে বেশ্যাবৃত্তির দু'রকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এক হচ্ছে ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তির পেশা (Private Prostitution), দ্বিতীয় প্রকাশ্য বেশ্যালয়ে বেশ্যাবৃত্তি। ঘরোয়া বেশ্যাবৃত্তি

* গ্রন্থকার একথা অন্য স্থানে আর একভাবে লিখেছেন যে, পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে পৃথক পৃথক তিনটি জিনিস পাওয়া যায়। এক হচ্ছে সেসব দেবমূর্তি, প্রতিকৃতি অথবা নিদর্শনাবলী যা পূজার লক্ষবস্তু (Objects of worship) হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সেসব লোক, অথবা অর্থ যা প্রকৃতপক্ষে উপাস্য গণ্য করা হয় এবং যে সবের প্রতিনিধিত্ব প্রতিমা, প্রতিকৃতি প্রভৃতির আকারে করা হয়। তৃতীয়তঃ ঐসব ধারণা-বিশ্বাস যা এসব পৌত্তলিক পূজা অর্চনা ও কাজ-কর্মের নিয়ামক হয়।[৩৬৮]

অধিকাংশ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীরাই করতো যাদের কোনো অভিভাবক ছিল না। অথবা এমন কোনো স্বাধীন নারী যার পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো পরিবার বা গোত্র ছিল না। এরা কোনো গৃহে এ পেশার জন্যে অবস্থান করতো এবং কয়েকজন পুরুষের সাথে এদের চুক্তি হতো যে, তারা এদের ভরণ-পোষণ করবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে। সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মেয়েলোকটি যে লোকটিকে তার সন্তানের জন্মদাতা বলে ঘোষণা করতো, সেই তাকে তার সন্তান বলে মেনে নিত। এ যেন সমাজের মধ্যে এমন একটা স্বীকৃত সংস্থা ছিল যাকে জাহেলিয়াতবাসী এক ধরনের বিবাহ মনে করতো।-আবু দাউদ

দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ পুরোপুরি বেশ্যাবৃত্তি সকল কৃতদাসীর দ্বারা চলতো। তা আবার দুই প্রকারের। এক এই যে, লোক তাদের যুবতী দাসীদের উপর একটা অংক নির্ধারিত করে দিয়ে বলতো যে, প্রত্যেক মাসে এতোটা পরিমাণে উপার্জন করতে হবে। হতভাগিনীরা বেশ্যাবৃত্তি করে করে তাদের মালিকদের দাবী পূরণ করতো। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তারা এতো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারতো না এবং মালিকরাও মনে করতো না যে, এরা সদুপায়ে এ অর্থ উপার্জন করতো। তাছাড়া যুবতী কৃতদাসীদের সাধারণ পারিশ্রমিক থেকে কয়েক গুণ অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণের অন্য কোনো উপায়ও ছিল না।

দ্বিতীয় এই ছিল যে, লোকেরা তাদের যুবতী দাসীদেরকে কুঠিতে বসিয়ে দিত এবং তাদের দরজার উপরে পতাকা লট্‌কিয়ে দেয়া হতো যা দেখে দূর থেকেই বুঝতে পারা যেতো যে, এখানেই মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এসব স্ত্রীলোকদেরকে বলা হতো 'কালিকিয়াত' (قليقيات) এবং তাদের কুঠিগুলো 'মাওয়াখীর' (مواخير) নামে অভিহিত ছিল। বড়ো বড়ো সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যাবাড়ী খুলে রাখতো। মুনাফিকদের প্রধান স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন ওবাই-এরও এ ধরনের একটা বেশ্যাবাড়ী বিদ্যমান ছিল। অথচ তাকে নবী করীম (স)-এর মদীনা আগমনের পূর্বে মদীনাবাসী তাদের বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত করেছিল এবং সে এ ব্যক্তি, যে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবার ব্যাপারে সকলের অগ্রে ছিল। তার এ বেশ্যাখানায় ছয়জন সুন্দরী ক্রীতদাসী থাকতো। তাদের দ্বারা সে শুধু অর্থ উপার্জনই করতো না, বরঞ্চ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মেহমানদের আপ্যায়নও তাদের দ্বারা করা হতো। তাদের গর্ভে যে সব অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, তাদের দ্বারা তার জারি-জুরির জন্যে চাকর-নফরের সংখ্যা বাড়ানো হতো।[৩৭১]

দেব মন্দিরে ভাগ্য গণনা

মক্কার মুশরিকগণ ফালগিরি করার জন্যে কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থিত হোবল দেবতাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। এর কাছে ভাগ্যের লিখন জিজ্ঞেস করা হতো, ভবিষ্যতের সংবাদ জানা হতো অথবা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা হতো। তার মন্দিরে সাতটি তীর রাখা থাকতো যার মধ্যে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য মুদ্রিত ছিল। কোনো কাজ করা না করার প্রশ্ন দেখা দিলে তার জন্যে লোক হোবালের পাশা রক্ষকের নিকটে যেতো। পাশা রক্ষক তীরগুলোর সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করতো। যে তীর বের হয়ে আসতো তার মধ্যে লিখিত জিনিসকেই হোবলের সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করা হতো।[৩৭২]

নযর-নিয়াযের পদ্ধতি

আরববাসীর প্রথা ছিল যে, তারা কোনো পশু অথবা ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে মানত করতো যে এ অমুক মন্দির অথবা অমুক দেবতার নিয়াযের জন্যে নির্দিষ্ট। এ নিয়ায সকলে খেতে পারতো না। তার জন্যে কিছু নিয়ম প্রণালী ছিল যার ভিত্তিতে বিভিন্ন নিয়ায-নযর বিভিন্ন ধরনের বিশিষ্ট লোকই খেতে পারতো।[৩৭৩]

আরববাসীদের কিছু বিশেষ মানত ও নযরের পশু এমন হতো, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া জায়েয মনে করা হতো না। তার উপর আরোহণ করে হজ্ব করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ হজ্বের জন্যে 'লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা' পড়তে হতো। এভাবে তাদের দুধ দোহন করার সময়, তাদের উপর আরোহণ করার সময়, তাদেরকে জবাই করার সময় অথবা তাদের গোশত খাওয়ার সময় এমন সতর্কতা অবলম্বন করা হতো, যেন আল্লাহর নাম মুখে না আসে।[৩৭৪]

আরববাসীদের মানতের পশু সম্পর্কে তাদের মনগড়া শরিআতের বিধিও ছিল যে, ঐ পশুর পেটে কোনো বাচ্চা পয়দা হলে তা শুধু পুরুষই খেতে পারতো, মেয়েদের জন্যে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে বাচ্চা যদি মৃত হতো অথবা পরে মরে যেতো তাহলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের খাওয়া জায়েয ছিল।[৩৭৫]

ধর্মের নামে পশু দান করে ছেড়ে দেয়া

জাহিলী যুগে আরববাসী বিভিন্নভাবে ধর্মের নামে পশু ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়া পশুর বিভিন্ন নাম রাখা হতো।

'বাহিরা' ঐসব উটনীকে বলা হতো, যে পাঁচ বার প্রসব করেছে এবং শেষ বারে নর বাচ্চা প্রসব করেছে। তার কান চিরে দিয়ে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। তারপর কেউ তার পিঠে চড়তে পারতো না। না তার দুধ পান করা যেতো, না তাকে জবাই করা যেতো, আর না তার পশম উঠানো যেতো। সে যেখানে খুশী সেখানে স্বাধীনভাবে চরতে পারতো এবং যেখানে খুশী সেখান থেকে পানি পান করতে পারতো।

'সায়েবা' ঐসব উট বা উটনীকে বলা হতো, যাদেরকে কোনো মানত পূরণ হওয়ার পর, অথবা কোনো রোগ মুক্তির পর অথবা কোনো বিপদ কেটে যাবার পর শুকরিয়া আদায়ের জন্যে ছেড়ে দেয়া হতো। উপরন্তু যে উটনী দশবার প্রসব করেছে এবং প্রত্যেক বার মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে তাকেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো।

'ওয়াসিলা' যদি বকরীর প্রথম বাচ্চা নর হতো তাহলে তাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হতো। প্রথম বার মাদী বাচ্চা হলে তাকে নিজের জন্যে রেখে দেয়া হতো। কিন্তু যার পেট থেকে এক সাথে নর ও মাদী পয়দা হতো, তাহলে নর-কে যবাই না করে তাকে আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া হতো। তার নাম ছিল 'ওয়াসিলা'।

'হাম' যদি কোনো উটের পৌত্র সওয়ারীর যোগ্য হতো তাহলে সে বৃদ্ধ উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। উপরন্তু যে উটের ঔরসে দশটি বাচ্চা পয়দা হতো তাকেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো।[৩৭৬]

জাহিলী যুগে আরববাসীদের হজ্জ

মোটকথা যে সকল কুসংস্কারজনিত পূজা পার্বণের প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল তার এ একটা ছিল যে, যখন কেউ হজ্জের জন্যে এহ্‌রাম বাঁধতো, তখন সে তার বাড়ীতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো না। বরঞ্চ পেছন দিক থেকে প্রাচীর টপ্‌কিয়ে অথবা প্রাচীর ফুটো করে সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতো। উপরন্তু সফর থেকে ফিরে এসেও পেছন দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতো।[৩৭৭]

প্রাচীন আরবের এটাও এক অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা ছিল যে, হজ্জের সময় জীবিকা উপার্জনের জন্যে কোনো কিছু করাকে দূষণীয় মনে করা হতো। কারণ তাদের নিকটে জীবিকা উপার্জন করা ছিল দুনিয়াদারীর কাজ এবং হজ্জের মতো ধর্মীয় কাজের সময় তা করা খুব নিন্দনীয় ছিল।[৩৭৮]

আরববাসী হজ্জ শেষে একত্রে সম্মিলিত হতো এবং সে সম্মেলনে তারা বাপ-দাদার কর্মকাণ্ড গর্বের সাথে বর্ণনা করতো এবং নিজের গর্ব অহংকার প্রচার করে বেড়াতো।[৩৭৯]

প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা

চাঁদের ঘাটতি-বাড়তি এমন এক দৃশ্য যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, ধারণা-বিশ্বাস ও প্রথা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। আরববাসীদের মধ্যেও এ ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। চাঁদ থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা, কোনো কোনো দিন-তারিখকে সৌভাগ্যজনক অথবা দুর্ভাগ্যজনক মনে করা, কোনো তারিখ সফরের জন্যে এবং কোনো তারিখ কাজ শুরু করার দিন হিসেবে ধার্য করা, কোনো তারিখকে বিয়ে-শাদীর জন্যে শুভ অথবা অশুভ মনে করা, এরূপ ধারণা করা যে চাঁদের উদয় ও অস্ত, বাড়তি ও ঘাটতি, তার গতি ও গ্রহ প্রভৃতি মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের ধারণা বিশ্বাস অন্যান্য জাতির ন্যায় আরববাসীদের মধ্যেও ছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক রীতি পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৩৮১]

জ্বিনদের সম্পর্কে কুসংস্কার

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, জাহেলী যুগে যখন কোনো আরববাসী কোনো জন-মানবশূন্য প্রান্তরে রাত কাটাতো, তখন চিৎকার করে বলতো, "আমরা এ প্রান্তরের মালিকের (জ্বিন) আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" জাহেলী যুগে র অন্যান্য বর্ণনাতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, কোনো স্থানে যদি পানি ও পশুর আহার শেষ হয়ে যেতো, তাহলে যাযাবর বেদুঈন তাদেরই একজনকে পানি ও পশুর চারার তালাশের জন্যে অন্যত্র পাঠিয়ে দিত। অতঃপর সে ব্যক্তির চিহ্নিত করা নতুন স্থানে যখন তারা যেতো তখন সেখানে সওয়ারী থেকে অবরতণ করার পূর্বেই তারা চিৎকার করে বলতো, "আমরা এ প্রান্তরের প্রভুর আশ্রয় চাইছি যাতে করে আমরা এখানে সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।" তাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, যে স্থানে কোনো মানুষের বসবাস নেই, তা কোনো না কোনো জ্বিনের অধিকারে থাকে এবং তার আশ্রয় প্রার্থনা না করে সেখানে অবস্থান করলে সে নিজে উপদ্রব করে অথবা অন্যান্য জ্বিনকে উপদ্রব করতে দেয়।[৩৮২]

বহু বিবাহ

জাহেলী যুগে বিবাহের জন্যে কোনো সংখ্যা সীমিত ছিল না। এক একজন দশ বারোজন করে স্ত্রী রাখতো। বহু স্ত্রী রাখার কারণে খরচ পত্রাদি বেড়ে গেলে বাধ্য হয়ে এতিম ভাতিজা ও ভাগ্নেদের এবং অন্যান্য অসহায় আত্মীয়দের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো।[৩৮৩] এমন কি সৎ মা'কেও তারা বিয়ে করে বসতো।[৩৮৪]

ঋতুমতী মেয়েদের সাথে আচরণ

মদীনাবাসী যেহেতু ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সে জন্যে তাদের সমাজে ইহুদীদের মতোই স্ত্রীলোকদেরকে তাদের মাসিক ঋতুর সময় অপবিত্র মনে করা হতো। তাদের হাতের পাক করা খাদ্য এবং তাদের হাতে পানি খাওয়া যেতো না। তাদের সাথে এক বিছানায় বসা যেতো না। এমনকি তাদের হাত স্পর্শ করাও খারাপ মনে করা হতো। এ কয়টি দিনে নারী তার আপন গৃহেই অচ্ছুৎ হয়ে থাকতো।[৩৮৫]

তালাকের পর তালাক দেয়ার রীতি

আরবের জাহেলী যুগে এক বিরাট সামাজিক অবিচার এ ছিল যে, একজন লোক তার স্ত্রীকে বার বার তালাক দেয়ার অধিকার রাখতো। যে স্ত্রীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট হতো, তাকে সে বার বার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করতো। তার ফলে না হতভাগিনী তার স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারতো, আর না তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করতে পারতো।[৩৮৬]

এতিমদের উপর বাড়াবাড়ি

জাহেলী যুগে যেসব কন্যা সন্তান এতিম হয়ে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন যাপন করতো, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে অথবা এটা মনে করে যে তাদের কোনো অভিভাবক নেই বলে তাদেরকে ইচ্ছা মতো দাবিয়ে রাখা যাবে, তাদেরকে বিয়ে করতো এবং তাদের উপর যুলুম করতো।[৩৮৭]

হযরত আয়েশা (রা) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের এতিম কন্যা সন্তানরা থাকতো এবং যাদের কাছে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদ থাকতো, তাদের সাথে তারা বিভিন্ন প্রকারের অন্যায় অবিচার করতো। মেয়ে যদি মালদার হওয়ার সাথে সাথে সুন্দরীও হতো, তাহলে তারা স্বয়ং এদেরকে বিয়ে করে মাল ও সৌন্দর্য উভয়ই উপভোগ করতে চাইতো। আর যদি সে দেখতে কুশ্রী হতো, তাহলে তাকে নিজেরাও বিয়ে করতো না এবং অন্যকেও বিয়ে করতে দিতো না। যেন কেউ তার কোনো অভিভাবক সেজে তার অধিকার আদায়ের দাবী করতে না পারে।[৩৮৮]

এতিম কন্যাদের সাথে কি আচরণ করা হতো ?

এ সম্পর্কে এক আজব ঘটনা কাজী আবুল হাসান আল্ মাওয়ারদী তাঁর 'আ'লামুন্ নবুওয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু জাহল এক এতিম মেয়ের অলী ছিল। একদিন মেয়েটি তার নিকটে উলংগ অবস্থায় এসে আবেদন করলো যে, তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দেয়া হোক। কিন্তু যালেম আবু জাহল তার দিকে ফিরেও তাকালো না। বেচারী তখন দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। কুরাইশ

সরদারগণ উপহাস করে তাকে বললো, "তুই মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট গিয়ে নালিশ কর। তিনি আবু জাহলের কাছে সুপারিশ করে তোকে তোর মাল দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।" আবু জাহলের সাথে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর কি সম্পর্ক ছিল এবং এসব দুরাচারগণ তাকে কি উদ্দেশ্যে এ পরামর্শ দিচ্ছে তা বেচারীর জানা ছিল না। সে সরাসরি হুজুর (সা)-এর কাছে পৌঁছলো এবং তার অবস্থা তাঁর কাছে খুলে বললো। নবী (সা) তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন এবং তাকে নিয়ে তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমন আবু জাহলের কাছে গেলেন। আবু জাহল তাঁকে দেখে সম্বর্ধনা জানালো। তারপর নবী (সা) যখন এতিম মেয়েটিকে তার হক আদায় করে দেয়ার জন্যে আবু জাহলকে বলেন, তখন সে তৎক্ষণাৎ সে এতিমের মাল তাকে দিয়ে দিল। কুরাইশ সরদারগণ এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যে, উভয়ের মধ্যে কি ঘটে তাই তারা মজা করে দেখবে। কিন্তু যখন তারা এরূপ দেখলো তখন অবাক হয়ে আবু জাহলের নিকটে এলো এবং ভর্ৎসনা করে বললো। "তুমি কি তোমার দীন পরিত্যাগ করেছো?" আবু জাহল বললো, আল্লাহর কসম, আমি আমার দীন পরিত্যাগ করিনি। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর ডানে ও বামে এক একটি অস্ত্র ছিল এবং যদি তার কথা না মানতাম তাহলে সে অস্ত্র আমার দেহে প্রবেশ করতো।[৩৮৯]*

সন্তান হত্যার পন্থা

সন্তান হত্যার তিন প্রকার পন্থা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

১। কন্যা বেঁচে থাকলে কেউ না কেউ জামাই হবে, গোত্রীয় লড়াইয়ে সে দুশমনের হাতে চলে যেতে পারে, অথবা অন্য উপায়ে সে লজ্জার কারণ হতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে, কন্যা হত্যা করা হতো।

২। ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যাতে করে পালন করতে না হয়, উপার্জন কম হওয়ার কারণে তারা অসহনীয় বোঝা হয়ে পড়বে, এ ধারণায় কন্যা সন্তান হত্যা করা হতো।

৩। দেব-দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সন্তানদের বলী দেয়া হতো।[৩৯১]

উত্তরাধিকার থেকে নারী ও শিশুদেরকে বঞ্চিত করা

আরবে নারী এবং শিশুদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো এবং লোকের ধারণা এ ব্যাপারে এই ছিল যে, উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য একমাত্র ঐসব পুরুষ যারা লড়াই করতে পারে এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে বিনা বাধায় সমস্ত উত্তরাধিকার একত্র করে আত্মসাৎ করতো এবং যারা তাদের অংশ আদায় করার শক্তি রাখতো না সে তাদেরকে বঞ্চিত করতো। অধিকার এবং দায়িত্বের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না যাতে করে ঈমানদারীর সাথে আপন দায়িত্ব মনে করে ঐসব লোকের হক আদায় করতে পারে যাদের সে হক হাসিল করার শক্তি থাক বা না থাক।[৩৯২]

---

* এ ঘটনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে-সময়ে আরবের সবচেয়ে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত গোত্রের সরদারগণ এতিম ও অন্যান্য অসহায় লোকের সাথে কি আচরণ করতো, বরঞ্চ এও জানা যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (সা) কোন্ মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর এ চরিত্র তাঁর চরম দুশমনদের মনে কতখানি ত্রাসের সঞ্চার করতো। এ ধরনের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তাফহীমুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠায়।৩৯০

উত্তরাধিকারের এক প্রথা

আরববাসীদের মধ্যে এ প্রথা ছিল যে, যাদের সাথে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি হতো তারা একে অপরের সম্পত্তির অধিকারী হতো। এভাবে পালিত অথবা যাকে পুত্র বলে ডাকা হতো তারাও উত্তরাধিকার লাভ করতো।[৩৯৩]

কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া

আরবে কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করার নির্মম প্রথা প্রাচীনকালে বিভিন্ন কারণে প্রচলিত ছিল। প্রথম কারণ হলো আর্থিক দুরবস্থা, যে জন্যে লোক চাইতো যে, আহার গ্রহণকারীর সংখ্যা যেন কম হয় এবং অধিক সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব তাদের উপর না পড়ে। পুত্র সন্তানদের এ আশায় প্রতিপালন করা হতো যে, পরবর্তীকালে তারা জীবিকা অর্জনে সাহায্য করবে। কন্যা সন্তানদেরকে এজন্যে মেরে ফেলা হতো যে, যৌবন পর্যন্ত তাদেরকে প্রতিপালন করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা, যার জন্যে পুত্র সন্তান প্রতিপালন করা হতো, কারণ যার যতো বেশী পুত্র সন্তান হবে তার ততোই সাহায্যকারী হবে। পক্ষান্তরে মেয়েদেরকে এজন্যে মেরে ফেলা হতো যে, গোত্রীয় লড়াইয়ের সময় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা কোনোই কাজে লাগতো না। তৃতীয়তঃ সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে একটা আশংকা এই ছিল যে দুশমন গোত্রগুলো যখন একে অপরের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসতো তখন যেসব মেয়েলোক তাদের হস্তগত হতো তাদেরকে নিয়ে গিয়ে দাসী বানিয়ে রাখতো অথবা কোথাও কারো নিকটে বিক্রি করে দিত। এসব কারণে আরবে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে পড়েছিল যে, প্রসব বেদনার সময়েই সে স্ত্রীলোকের সামনে একটা গর্ত খনন করে রাখা হতো যেন মেয়ে পয়দা হলে তাকে সেই গর্তে ফেলে দিয়ে উপরে মাটি চাপা দেয়া যায়। মা এতে রাজী না হলে, কিংবা তার পরিবারের লোকজন বাধা দিলে বাপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু দিন তার প্রতিপালন করতো। তারপর কোনো এক সময় তাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জীবিত দাফন করে দিত। এ ব্যাপারে যে দুর্বৃত্ততা চলতো সে সম্পর্কে এক ব্যক্তি তার জাহেলিয়াত যুগের একটি ঘটনা নবী (সা)-এর সামনে বর্ণনা করে। সে বলে, আমার একটি মেয়ে ছিল, যে আমার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। তাকে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন তাকে ডেকে আমার সাথে নিয়ে চললাম। পথে একটা কূপ পেলাম, আমি তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তার শেষ শব্দ যা কানে এলো তা ছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! এ কথা শুনে নবী (সা) কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললো, হে লোক, তুমি হুজুর (সা)-কে কষ্ট দিলে? নবী (সা) বললেন, তাকে বাধা দিয়ো না, তার যে বিষয়ে কঠিন অনুভূতি আছে সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘটনা বর্ণনা কর। সে পুনরায় তার কাহিনী বর্ণনা করলো। এবার রহমতের নবী (সা) এতো কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক অশ্রুতে ভিজে গেল। তারপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন, তুমি এখন নতুন করে নিজের জীবন শুরু কর (সুনানে দারেমী, প্রথম অধ্যায়)।

এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আরববাসী এ ধরনের চরম অমানুষিক নৃশংসতার কোনোই অনুভূতি রাখতো না। এটা ঠিক যে কোনো সমাজ যতোই অধঃপতিত হোক না

কেন, এ ধরনের উৎপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষ অনুভূতিহীন হতে পারে না। এ কারণে কুরআন পাক এ কর্মকাণ্ডের নৃশংসতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেনি। কিন্তু শরীর রোমাঞ্চিতকারী ভাষায় শুধু এতোটুকু বলা হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন এসব জীবিত কবরস্থ মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন্ অপরাধে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল।*

আরবের ইতিহাস থেকেও জানতে পারা যায় যে, জাহেলী যুগেও অনেকের মধ্যে এ নৃশংস প্রথার অনুভূতি ছিল। তাবারানী বলেন, ফারযওয়াক কবির সা'সায়া বিন্ নাজেতী আল্ মুজাশেয়ী রসূল (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহেলী যুগে আমি কিছু ভালো কাজও করেছি। তার মধ্যে একটা এই যে, আমি ৩৬০ জন কন্যা সন্তানকে জীবিত কবরস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করেছি। প্রত্যেকের জীবনরক্ষার জন্যে দুটি করে উট ফিদিয়া স্বরূপ দিয়েছি। এর কোনো প্রতিদান আমি পাব কি? নবী (সা) বললেন, নিশ্চয় তার জন্যে তোমার প্রতিদান রয়েছে এবং তাহলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন।

হত্যার প্রতিশোধ

জাহেলী যুগে নিয়ম এই ছিল যে, কোনো দল বা গোত্রের লোক তাদের নিহত ব্যক্তির খুন যতোখানি মূল্যবান মনে করতো, ততোখানি মূল্যের খুন সেই পরিবার, গোত্র বা দলের থেকে নিতে চাইতো যার লোক নিহত ব্যক্তির হন্তা। শুধুমাত্র নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হত্যাকারীর প্রাণনাশ করাতেই তাদের দিল ঠাণ্ডা হতো না। তারা একজনের জীবনের পরিবর্তে শত শত জীবন নিতে প্রস্তুত হতো। তাদের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি অন্য দলের কোনো নিম্নস্তরের লোকের দ্বারা নিহত হতো, তাহলে তারা প্রকৃত হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরঞ্চ তাদের বাসনা এই হতো যে,

---

* وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝ التكوير : ٩-٨

"এবং যখন জীবিত কবরস্থ মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন্ অপরাধে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল।"

–সূরা আত তাকভীর ঃ ৮-৯।

এ আয়াতের বর্ণনাভংগীতে এমন ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তার অধিক চিন্তা করা যায় না। আপন কন্যাকে যেসব পিতা-মাতা জীবিত কবরস্থ করেছে আল্লাহর চোখে তারা এতোটা ঘৃণ্য যে, তাদেরকে সম্বোধন করে এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে না, "তোমরা এসব নিষ্পাপ সন্তানদেরকে কেন মেরে ফেলেছ?" বরঞ্চ তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিষ্পাপ শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা হতভাগিনীর দল, কোন্ অপরাধে মারা গেলে? তারা তখন তাদের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করবে যে, যালেম বাপ-মা তাদের উপর কতখানি অন্যায় করেছে এবং কিভাবে জীবিত দাফন করেছে। তাছাড়া এ সংক্ষিপ্ত আয়াতটিতে দুটি বিরাট বিষয় নিহিত রয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা না হলেও কথার ধরন থেকেই জানা যায়। এক হচ্ছে এই যে, আরববাসীদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করা হয়েছে যে, জাহেলিয়াত তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের কোন্ চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, তারা আপন হাতে তাদের আপন সন্তানদেরকে জীবিত করবস্থ করে মেরে ফেলে। তারপরও তাদের একগুঁয়েমি যে তারা তাদের এ জাহেলিয়াতের উপরই অটল থাকবে এবং ঐ সংস্কার কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী না, যা নবী মুহাম্মাদ (সা) তাদের পথভ্রষ্ট ও অধঃপতিত সমাজে করতে চান। দ্বিতীয় এই যে, এতে আখেরাতের অনিবার্যতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেসব শিশুদেরকে জীবিত দাফন করে মারা হয়েছে তাদের তো কোথাও না কোথাও প্রতিকার হওয়া উচিত এবং যেসব যালেম এ ধরনের অমানুষিক যুলুম করেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যেও তো কোনো এক সময় আসা উচিত। যেসব শিশুদেরকে জীবিত দাফন করা হয়েছে তাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করার তো দুনিয়ায় কেউ নেই। জাহেলী সমাজে তাকে তো একেবারে বৈধ করা হয়েছে। না মা-বাপের এতে কোনো লজ্জার কারণ আছে, না পরিবারে এমন কেউ আছে যে তাদের ভর্ৎসনা করবে। আর না সমাজে এমন কেউ আছে যে,, এ কাজের জন্যে পাকড়াও করবে। তাহলে খোদার রাজত্বে এ যুলুম কি প্রতিকারহীন হয়ে থাকবে?[৩১৫]

হত্যাকারী গোত্রের কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। অথবা প্রতিপক্ষের কয়েকজনকে নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যা করা হোক। পক্ষান্তরে তাদের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তি যদি কোনো নিম্নস্তরের লোক হতো এবং হত্যাকারী অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হতো, তাহলে তারা এটা কিছুতেই বরদাশ্‌ত্‌ করতো না যে, নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীকে নিহত করা হবে।[৩৯৬]

পোশাকের ধারণা ও নগ্নতা

আরববাসী শুধু সৌন্দর্য ও আবহাওয়ার প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্যে পোশাক ব্যবহার করতো। কিন্তু তার সর্বপ্রথম বুনিয়াদী উদ্দেশ্য অর্থাৎ দেহের লজ্জাজনক অংশকে আবৃত রাখাকে তারা কোনো গুরুত্ব দিত না। নিজেদের 'সতর'কে অপরের সামনে অনাবৃত করতে তারা কোনো প্রকার ভয় বা লজ্জা করতো না। প্রকাশ্য স্থানে উলংগ হয়ে গোসল করা, পথ চলতে চলতে পেশাব-পায়খানার জন্যে বসে যাওয়া, পরিধেয় বস্ত্র খুলে গেলে 'সতর' বেপর্দা হয়ে যাওয়ার কোনো পরোয়া না করা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ কাজ ছিল। অধিকতর লজ্জাকর ব্যাপার এই যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক হজ্বের সময় কা'বার চারদিকে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করতো এবং এ ব্যাপারে তাদের মেয়ে লোকেরা তাদের চেয়ে অধিকতর নির্লজ্জ ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এ ছিল একটা ধর্মীয় কাজ এবং সৎ কাজ মনে করে তারা এসব করতো।[৩৯৭]

আরবের সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা ও অরাজকতা

আরবের সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করতো, যার ফলে সারাদেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল, চারদিকে খুন-খারাবি ও লুঠতরাজ চলতো। গোত্রগুলো পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ চালাতো। কেউ নিরাপদে রাত কাটাতে পারতো না। কারণ প্রত্যেকেই আশংকা করতো যে কখন কোন্‌ মুহূর্তে দুশমন তাদের বস্তি আক্রমণ করে বসে। এ এমন এক অবস্থা ছিল, যে সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিল এবং এর ভয়াবহতা সকলেই অনুভব করতো। যাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হলো তারা যদিও বিলাপ করতো এবং লুণ্ঠনকারী উল্লাস করতো, কিন্তু লুণ্ঠনকারীর যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসতো তখন সেও অনুভব করতো যে, এ এমন এক গর্হিত কাজ যার মধ্যে তারা লিপ্ত।[৩৯৮]

আরববাসীদের নিয়ম ছিল যে, যখন কোনো বস্তির উপর তাদের আক্রমণ চালাতে হতো, তখন তারা রাতের অন্ধকারে অগ্রসর হতো যাতে করে দুশমন সতর্ক হতে না পারে এবং প্রত্যুষে হঠাৎ দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো যেন ভোরের আলোতে সব কিছু দেখতে পাওয়া যায় এবং দিনের আলোও এতোটা উজ্জ্বল না হয় যে, দুশমন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে এবং সতর্ক হয়ে মুকাবিলা করতে পারে।[৩৯৯]

তখনকার যুগে আরবের অবস্থা এই ছিল যে, গোটা দেশে এমন কোনো জনপদ ছিল না যার অধিবাসী শান্তিতে থাকতে পারতো। কারণ সর্বদা তারা সন্ত্রস্ত থাকতো যে, কখন কোনো লুণ্ঠনকারী দল হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যে তার গোত্রের সীমানার বাইরে যেতে পারতো। কারণ একজন, দু'জন লোকের পক্ষে জীবিত ফিরে আসা, এবং গ্রেফতার হয়ে গোলাম হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোনো কাফেলা এমন ছিল না যে নিরাপদে সফর করতে পারতো। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তাদের উপর ডাকাতি হওয়ার আশংকা থাকতো। কিন্তু সমস্ত পথে প্রভাবশালী গোত্রীয় সরদারদেরকে ঘুষ দিয়ে কাফেলা নিরাপদে পথ অতিক্রম করতে পারতো।[৪০০]

আরববাসীদের অন্যান্য কিছু ধর্ম

হুনাফা

দ্বীন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান সে জাহেলিয়াতের যুগে লোকের না থাকলেও একথাও তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, প্রকৃত দ্বীন হলো তাওহীদ এবং আম্বিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পৌত্তলিক পূজার শিক্ষা দেননি। আরববাসীদের আপন ভূখণ্ডের নবীগণের নিকট থেকে যেসব বিবরণ তাদের নিকটে পৌঁছেছিল, এ সত্য তার মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। নিকটবর্তী ভূখণ্ডে আগত হযরত মূসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মতো নবীগণের শিক্ষার মাধ্যমেও তারা এ সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল।

আরব ঐতিহ্যের এ কথা অতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, প্রাচীন যুগে আরবের প্রকৃত দ্বীন ছিল 'দ্বীনে ইবরাহীমী' এবং পৌত্তলিক পূজা তাদের ওখানে শুরু হয়েছিল আমর বিন লুহাই নামক এক ব্যক্তির দ্বারা। শিরক ও পৌত্তলিকতার সাধারণ প্রচলন সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে এমন লোক বিদ্যমান ছিল যারা শিরক অস্বীকার করতো, তাওহীদের ঘোষণা করতো এবং পৌত্তলিক পূজার প্রকাশ্যে নিন্দা করতো। নবী (সা)-এর যুগের অতি অল্পকাল পূর্বে এমন বহু লোক ছিলেন যাঁদের অবস্থা ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা, 'হুনাফা' ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুস্ বিন সায়েদাহ্ আল ইয়াদী, ওমাইয়া বিন আবি আস্সাল্ত্, সুয়াইদ বিন আমর আল মুস্তালেকী, ওয়াকী বিন সালামা বিন যুহাইর আল ইয়াদী, আমর বিন জুন্দুব আল জুহানী, আবু কায়স্ সালমা বিন আবি আনাস, যায়দ বিন আমর বিন আমর বিন নুফাইল, ওয়ারাকা বিন নাওফাল, ওসমান বিন আল হোয়াইরেস ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ, আমের বিন আয্যার্ব আল আদওয়ানী, আল্লাফ্ বিন শিহাব আত্তামিমী, আল মুতালাম্মেস্ বিন উমাইয়া আল কেনানী, যুহাইর বিন আবি সাল্মা, খালেদ বিন সিনান্ বিন গায়স্ আল আব্সী, আবদুল্লাহ্ আল কুযায়ী এবং আরও অনেকে। এসব লোক প্রকাশ্যে তাওহীদকেই আসল দীন বলে ঘোষণা করতেন এবং মুশরিকদের ধর্মের সাথে তাঁদের কোনোই সম্পর্ক নেই, এ কথাও পরিষ্কার বলতেন। একথা ঠিক যে, তাদের মনের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে। উপরন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে ইয়ামেনে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গেছে তার থেকে জানতে পারা যায় যে, সে যুগে সেখানে তাওহীদী ধর্ম বিদ্যমান ছিল, যার অনুসারীগণ 'আর রাহ্মান' এবং 'রাব্বুস সামায়ে ওয়াল্ আরদ'কেই একমাত্র ইলাহ্ বলে মানতো। ৩৭৮ খৃস্টাব্দের একটা শিলালিপি একটি ইবাদতখানার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া যায়, যার মধ্যে লেখা ছিল—এ ইবাদাতখানা اله ذوسموى। অর্থাৎ আসমানের ইলাহ্ বা রবের ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৬৫ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে بنصر وردا الهن بعل سمين وارضين (بنصر وبعون الا له رب السماء والارض) কথাগুলো লেখা ছিল যা তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসেরই প্রমাণ পেশ করে। এ যুগের আর একটি শিলালিপি একটি কবরে পাওয়া যায় যার মধ্যে بحيل رحمنن (يعنى استعين بحول الرحمن) শব্দগুলো লেখা ছিল। এমনি উত্তর আরবে ফোরাত এবং কিন্নাস্রীন নদীর মধ্যবর্তী 'যাবাদ' নামক স্থানে ৫১২ খৃস্টাব্দের একটা শিলালিপি পাওয়া যায় যার মধ্যে بسم الا له، لاعزا لا له، لاشكر

لا ل। শব্দগুলো লেখা ছিল। এ সবকিছু এটাই প্রমাণ করে যে, নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে নবীগণের শিক্ষার প্রভাব আরবের বুক থেকে একেবারে মুছে যায়নি। অন্ততঃপক্ষে এতোটুকু কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে বহু উপায়-উপাদান ছিল যে, তোমাদের খোদা মাত্র একজন।[৪০১]

আরবাসীদের মধ্যে যে সকল একত্ববাদী পাওয়া যেতো তারা তিনটি গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতো যার মধ্যে অধিকাংশ আরববাসী লিপ্ত ছিল, সে তিনটি গোনাহ্ হলো— আল্লাহ্র সাথে শিরক, অন্যায়ভাবে হত্যা এবং ব্যভিচার।*

---

* একথা নবী (সা) বহু হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) বলেন, একবার হুজুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে বড়ো গোনাহ্ কোন্‌টি? নবী (সা) বলেন, ان تجعل الله ندا وهو خلقك অর্থাৎ তুমি কাউকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী বানাবে অথচ আল্লাহ্ তোমাকে পয়দা করেছেন। বলা হলো, তারপর? নবী (সা) বলেন, ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে আহারে তোমার সাথে শরীক হবে। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? নবী (সা) বলেন, ان تزانى حليلة جارك অর্থাৎ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তুমি ব্যভিচার কর (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, আহমাদ)। যদিও কবীরা গোনাহ্ আরও বহু আছে কিন্তু তৎকালীন আরব সমাজে এ তিনটির সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য ছিল। এজন্যে মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে যে, গোটা সমাজে কিছু লোক এমন আছে, যারা এসব গোনাহ্ থেকে বেঁচে আছে।৪০২

সাবেয়ীন

প্রাচীনকালে সাবেয়ী নামে দুটি শ্রেণী পরিচিত ছিল। এক শ্রেণী ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী যাদের বহু সংখ্যক লোক ইরাকের উচ্চ এলাকা জাজিরায় বাস করতো। তারা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর অনুসরণে ধর্মে দীক্ষাদান (Baptism) করতো। দ্বিতীয় শ্রেণী তারকার পূজা করতো। তারা বলতো তাদের দীন হযরত শীস্ (আ) এবং হযরত ইদরীস (আ) থেকে এসেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে উপাদানসমূহের উপর গ্রহ-উপগ্রহের এবং গ্রহ-উপগ্রহের উপর ফেরেশতাদের কর্তৃত্ব ছিল, 'হাররান' ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল। ইরাকের বিভিন্ন অংশে তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় শ্রেণী তাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতির কারণে অধিকতর প্রখ্যাত ছিল, খুব সম্ভব এখানে প্রথম শ্রেণীর কথাই বলা হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণী সম্ভবত কুরআন নাযিলের সময় এ নামে পরিচিত ছিল না।"*৪০৩

---

* এ সম্পর্কে মাহমুদ শুক্রী আলুসী নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন ঃ 'সাবেয়া' শ্রেষ্ঠ উম্মতগুলোর মধ্যে একটি। তাদের দীন সম্পর্কে মানুষের যত পরিমাণে জানা আছে ততো পরিমাণে মতভেদও আছে। তারা দু'শ্রেণী, মু'মিন ও কাফের।

তারা ছিল হযরত ইবরাহীম আল খলীল (আ)-এর জাতি। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের জন্যেই প্রেরীত হয়েছিলেন। তাদের আবাসস্থল ছিল 'হাররান' এবং এখানেই সাবেয়ীদের বাড়ীঘর ছিল। তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত–এক 'দীনে হানীফের' উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মুশরিক। যারা মুশরিক ছিল তারা সাত তারকা এবং বারো বুযর্গের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং নিজেদের মন্দিরে তাদের প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখতো। এসব তারকার জন্যে তাদের বিশেষ বিশেষ মন্দির ছিল। এ ছিল তাদের সর্ববৃহৎ ইবাদাতের স্থান, যেমন খৃস্টানদের গির্জা এবং ইহু-দীদের উপাসনালয় বীয়ে (بيعى)। তারা সূর্যের জন্যে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করে রেখেছিল। একটা চাঁদের জন্যে, একটা শুক্র গ্রহ, একটা বৃহস্পতি গ্রহ, একটা বুধ গ্রহ, একটা মংগল গ্রহ, একটা শনি গ্রহ এবং একটা আদিকার্য কারণের জন্যেও বানিয়ে রেখেছিল। তাদের নিকটে প্রত্যেক তারকার জন্যে বিশেষ ইবাদাত ও দোয়া নির্দিষ্ট ছিল..... মুসলমানদের মতো তাদের পাঁচ বার নামাযও ছিল।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ রমযান মাসে রোযাও রাখতো। কা'বার দিকে মুখ করে নামাযও পড়তো। মক্কার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং হজ্বের জন্যে মক্কা গমনও বিশ্বাস করতো। মৃত জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস হারাম মনে করতো। বিয়ের ব্যাপারে মুসলিমগণ যাদেরকে হারাম বলতো, তারাও তাদেরকে হারাম বলতো। বাগদাদের রাজ পরিষদের একদল এ ধর্মাবলম্বী ছিল। বেলাল বিন আল মুহসিন আস্সাবী নামের তাদেরই একজন প্রবন্ধ কবিতা লেখায় দক্ষ ছিল এবং খ্যাতনামা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিল। সে মুসলমানদের সাথে রোযা রাখতো, তাঁদের সাথে ইবাদাত করতো, যাকাত দিত এবং হারাম বস্তুকে হারাম মনে করতো। ... মনে করা হয় যে, তাদের দীনের সারবস্তু এই ছিল যে, তারা দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্মগুলোর ভালো দিকগুলো গ্রহণ করতো। মন্দ দিকগুলো থেকে দূরে থাকতো। এজন্যে তাদেরকে 'সাবেয়া' বলা হয়, বা খারেজ অর্থাৎ যে বের হয়ে গেছে। তারা প্রত্যেক ধর্মের সামগ্রিক রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে শুধু ততোটুকু মেনে চলতো যতোটুকু তারা হক মনে করতো।

কুরাইশ কাফেরগণ নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে 'সাবী' এবং তাঁর সংগী সাথীদেরকে 'সুবাত' বলতো। যখন কেউ একটা থেকে বের হয়ে অন্যটাতে চলে যেতো তখন এ প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করা হতো– صبا الرجل

– বুলুগুল আদবের উর্দু অনুবাদ থেকে গৃহীত।–সংকলকদ্বয়

মাজুসী

ইহুদী এবং নাসারা এ দুটি দল ছাড়া আর যেসব জাতির কাছে আসমানী কিতাব পাঠানো হয়েছিল, তারা যেহেতু তাদের কেতাবগুলোকে বিলুপ্ত অথবা বিকৃত করে ফেলেছে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং আমলের মধ্যে নবীগণের শিক্ষার কোনো কিছুই পাওয়া যেতো না, তাদেরকে আহলে কিতাব বলা যেতে পারে না। এ কারণেই মাজুসীদেরকে আহলে কেতাব নামে অভিহিত করা হয়নি। অথচ তারা যরদশ্‌তকে মানতো যাকে নবী বলে সন্দেহ করা যায়। হাজারের মাজুসীদের সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেন, سنوا بهم سنة اهل الكتاب তাদের সাথে আহলে কিতাবের মতো আচরণ কর। তিনি এ কথা বললেন না যে, তারা আহলে কেতাব। তারপর যখন তিনি হাজারের মাজুসীদেরকে পত্র লিখলেন তখন এ কথা সুস্পষ্ট করে লিখলেন, فان اسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ومن ابى فعليه الجزية غير اكل نبائحهم ولا نكاح نساء هم যদি তোমরা ইসলাম কবুল কর, তাহলে তোমাদের ঐসব অধিকার হবে যা আমাদের আছে এবং তোমাদের উপর ঐসব অপরিহার্য দায়িত্ব আরোপিত হবে যা আমাদের উপর আছে। তোমাদের মধ্যে যারা অস্বীকার করবে তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হবে। কিন্তু না তাদের জবাই করা কিছু খাওয়া যাবে, আর না তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা যাবে।

ইরানের অগ্নি উপাসকগণ* আলো এবং অন্ধকারের দুজন খোদা** মানতো। তারা নিজেদেরকে যরদশ্‌তের অনুসারী বলতো। তাদের ধর্ম ও নৈতিকতাকে মায্‌দাক সম্প্রদায়ের গোমরাহি বিকৃত করে রেখে দেয়। এমনকি সহোদর ভগ্নিকে বিয়ে করার প্রথাও তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

---

* আরবের অগ্নি উপাসকদের সম্পর্কে মাহমুদ শুক্‌রী আলুসী বলেন ঃ আরববাসীদের মধ্যে এ ধরনের লোক বিভিন্ন প্রকারের ছিল। এমন মনে হয় যে, এ ধর্ম ইরানী এবং মাজুসীদের মাধ্যমে তাদের ভেতর প্রবেশ করে। বলা হয় যে, অগ্নিপূজা কাবীলের সময় থেকে দুনিয়ায় চলে আসছে। কাবীল প্রথমব্যক্তি, যে অগ্নিপূজার মন্দির তৈরী করে এবং তার পূজা করে। তারপর এ ধর্ম মাজুসীদের মধ্যে স্থান লাভ করে। তারা অগ্নিপূজার বহু মন্দির তৈরী করে, তার জন্যে ওয়াক্‌ফ, রক্ষক, প্রহরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। এ অগ্নি তারা এক মুহূর্তের জন্যেও নির্বাপিত হতে দিত না। ফরীদীরা এক অগ্নি মন্দির তূসে এবং আর একটি বুখারায় নির্মাণ করে। বাহমন সিজিস্তানে একটি এবং আবু কাতাদাহ্‌ বোখারার পাশে একটি করে অগ্নি মন্দির নির্মাণ করে।

অগ্নিপূজক কয়েক প্রকারের। তাদের একটা দল আগুনে কোনো জীব নিক্ষেপ করা এবং তার দ্বারা দেহ প্রজ্জ্বলিত করা হারাম গণ্য করে। তাদের আর একটি দল আছে যারা অগ্নি পূজায় এতোদূর অগ্রসর যে, তারা নিজেদেরকে এবং সন্তানদেরকে অগ্নিতে উৎসর্গ করে।

অগ্নিপূজকদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যারা ধার্মিক। তারা আগুনের পাশে রোযা রেখে বসে থাকে এবং চিন্তা করে। তাদের রীতি এই যে, তারা সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, সতীত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রেরণা দেয়।

ইবনে কুতায়বা 'কিতাবুল মায়ারিফ' গ্রন্থে বলেন, মাজুসী ধর্মের প্রথা বনী তামীমের মধ্যে ছিল। যুরারা বিন উদুস্‌ আততামীমী ও তার পুত্র হাজেব বিন যুরারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে তার কন্যাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়। তাদেরই একজন আকরা বিন হারেস্‌ পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীদের মধ্যে শামিল হন। ওয়াকী বিন হাস্‌সানের দাদা আবুল আস্‌ওয়াদও মাজুসী ছিল–

—বুলুগুল আদবের অনুবাদ থেকে গৃহীত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮-১৪১।

** আমাদের ধারণা, মাজুসীদের বিভিন্ন অংশ ও তার ধরন আরবে পৌছে। আরবাসীদের মধ্যে যরদাশ্তী দলের দুই খোদা এবং আলো ও অন্ধকারের আকীদাহ-বিশ্বাসের লোক সম্পর্কে মাহমুদ শুক্‌রী আলুসী 'সানায়িয়াদের ধারণা-বিশ্বাসের বিবরণ' শীর্ষক একটা অধ্যায় রচনা করেছেন যা নিম্নরূপ–

এসব লোক বলতো যে, স্রষ্টা দুজন। মংগলের স্রষ্টা হলো নূর বা আলো, এবং অমংগলের স্রষ্টা অন্ধকার। তারা অনাদি এবং শাশ্বত, শক্তিমান, অনুভূতিশীল এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন, শ্রবণ ও দর্শনকারী।

কিছু লোকের ধারণা খোদা কিছুকাল যাবত একাকী থাকার পর উদাস হয়ে পড়েন এবং মনে খারাপ চিন্তার উদয় হয় (নাউযুবিল্লাহ্) এবং দেহ ধারণ করে অন্ধকারে পতিত হন এবং তার থেকে ইবলিস পয়দা হয়।

—বলুগুল আদবের অনুবাদ থেকে গৃহীত, ৩য় খণ্ড, পৃ ঃ ১৩০-১৩১)।–সংকলকদ্বয়

নাস্তিকতা

নাস্তিকতার মর্মকথা

যারা বস্তুর শুধু উপরিভাগ দেখে, দুনিয়ার জীবন তাদেরকে অনেক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করে। কেউ মনে করে জীবন ও মৃত্যু শুধু দুনিয়ার মধ্যেই সীমিত। তারপর দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই। অতএব যা কিছু তোমার করার, তা এখানেই করে নাও।[৪০৬]

কিছু লোক একথা কিছুতেই স্বীকার করে না যে, এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। এসব কিছু বস্তুর আলোড়নের ফলশ্রুতি। অথবা একটা দুর্ঘটনার ফল, যার মধ্যে কোনো কারিগরের এবং কোনো শিল্প-নৈপুণ্যের কোনো হাত নেই।*[৪০৭]

কুরআন মজীদ অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমি যতোটা বুঝতে পেরেছি, তাতে আমার প্রায় এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, দুনিয়াতে কোনো জাতি বা সম্প্রদায় (Community) এমন ছিল না যারা সামষ্টিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এবং নাস্তিক ছিল। ব্যক্তিবর্গ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিকের দল এ ধরনের অবশ্যই ছিল। কিন্তু তারা এমন উল্লেখযোগ্য ছিল যে সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করার জন্যে কোনো নবী প্রেরিত হয়েছেন অথবা কোনো কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এজন্যে কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকের জন্যে কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত ইংগিত অবশ্যই করা হয়েছে। কিন্তু দাওয়াতের সরাসরি সম্বোধন মুশরিকদের প্রতিই করা হয়েছে। সাধারণত তাওহীদের যেসব যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা এমন বর্ণনাভংগীতে যে শির্ককে খণ্ডনের সাথে সাথে নাস্তিকতার খণ্ডনও করা হয়েছে। তাদের জন্যে পৃথকভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন হয়নি।[৪১০]

---

* উল্লেখ্য কুরআনে নাস্তিকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণও আছে এবং তাদের মতবাদের ভ্রান্তিও খণ্ডন করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, এ দলের অস্তিত্বও আরবে ছিল, কিন্তু ছিল অতি অল্প সংখ্যক। এর ভিত্তিতেই মাওলানা মওদূদী এ দলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। আরবের নাস্তিকদের সম্পর্কে আল্লামা মাহমুদ শুকরী আলুসী নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন–

আরবে এক শ্রেণীর নাস্তিক ছিল যারা শিল্পকে শিল্পী থেকে একেবারে আলাদা গণ্য করেছে। তাদের উক্তি, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এই যে–

اِنْ هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ۔

–অর্থাৎ জীবন তো শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবন। (আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং মরে যাই) এবং কাল বা কালচক্র ব্যতীত আর কিছু আমাদেরকে ধ্বংস করে না।

তাদের দুটি শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতবাদ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

---- বস্তুত একেবারেই কোনো উৎপত্তি বা প্রারম্ভকাল নেই। বস্তুত শুধু শক্তি (Energy) থেকে ক্রিয়ার দিকে ধাবিত হয়ে আসে। অতএব যে বস্তু প্রথমে শক্তিসম্পন্ন থাকে এবং ক্রিয়ার দিকে যখন বেরিয়ে আসে, তখন বস্তুর যৌগিক পদার্থ (Compound) ও যোগ্যতা আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়—অন্য কিছু থেকে সৃষ্টি হয় না। উপরন্তু তারা এ কথাও বলে যে জগত আদিকাল থেকেই রয়েছে এবং এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। না তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে, আর না ক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

শাহ রাস্তানীর 'আল মিলাল্ ওয়ান্ নাহাল' গ্রন্থে নাস্তিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

তারা সৃষ্টির পুনর্জীবন অস্বীকার করে। তারা বলে, প্রকৃতি (Nature) জীবন দান করে এবং কাল ধ্বংস করে।–বুলুগুল আদবের উর্দু অনুবাদ থেকে গৃহীত)।–সংকলকদ্বয়

শিরকের সাথে নাস্তিক্যেরও খণ্ডন

এ সম্পর্কে সূরা আন নামলের আয়াত ৬০ দ্রষ্টব্য। বলা হয়েছে তিনি কে, যিনি আসমান ও যমীন পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন, তারপর তার সাহায্যে সুন্দর বাগ-বাগিচা উৎপন্ন করেছেন, যার গাছপালা উৎপন্ন করা তোমাদের সাধ্য ছিল না। আল্লাহর সাথে (এসব কাজ) অন্য কোনো খোদা শরীক আছে কি ? (নেই) বরঞ্চ এসব লোক সত্য পথ থেকে সরে যাচ্ছে।

–তাফহীমুল কুরআন

এ প্রশ্ন এবং তার পরের প্রশ্নগুলোতে শুধু মুশরিকদের শিরকই খণ্ডন করা হয়নি, বরঞ্চ নাস্তিকদের নাস্তিকতাও খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন এ প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বৃষ্টিবর্ষণকারী এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারে তরুলতা উৎপন্নকারী কে ? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক পরিমাণে অথবা কিছু কম পরিমাণে যমীনে সমাবিষ্ট হওয়া, ক্রমাগতভাবে সমুদ্র থেকে উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সঠিকভাবে বর্ষণ করা, উদ্ভিদ জগতের লালন-পালন ও বর্ধন এবং পাখী জগতের সকল প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যমীন, পানি, বাতাস, উষ্ণতা প্রভৃতি শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অনুপাত ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা—এগুলোকে একজন মহাজ্ঞানীর সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং অপরাজেয় শক্তি ও অদম্য ইচ্ছা ছাড়া স্বয়ং আকস্মিকভাবে সংঘটিত হতে পারে কি ? এটা কি সম্ভব যে, প্রতিটি আকস্মিক ঘটনা হাজার হাজার কেন বরঞ্চ লক্ষ কোটি বছর ধরে এমন নিয়ামতও সঠিকভাবে সংঘটিত হতে থাকবে ? শুধু এক হঠকারী ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই একে আকস্মিক ঘটনা বলে দাবী করতে পারে। কোনো সত্যনিষ্ঠ বিবেকবান মানুষের পক্ষে এ ধরনের অর্থহীন দাবী করা এবং তা সত্য বলে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।[৪১১]

শৃংখলা ও সামঞ্জস্য আকস্মিক ঘটনা নয়

যমীনে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জনবসতির স্থান হওয়াটাও সহজ ব্যাপার নয়।....... এ ভূমণ্ডলটি মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। কোনো কিছুকে অবলম্বন করে নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এতে কোনো অস্থিরতা ও কম্পন নেই। যদি এতে সামান্য পরিমাণেও কম্পন হতো, ভূমিকম্প হলে যার ভয়ানক পরিণাম আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাহলে এর উপরে কোনো জনবসতি মোটেই সম্ভব হতো না এ ভূমণ্ডলের উপর পাঁচশত মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর এক সূক্ষ্ম গাঢ় স্তর রক্ষিত আছে, যা মারাত্মক উল্কা পতনের আঘাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যথায় প্রতিদিন দু' কোটি উল্কা যে প্রতি সেকেন্ডে ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবীর দিকে নিপতিত হচ্ছে, তা পৃথিবীর বুকে এক সর্বনাশা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করতো। .... এ বায়ুস্তরই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এ-ই সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন স্থানে বারি বর্ষণের কাজ করে। এ-ই মানুষ, জীব-জানোয়ার ও উদ্ভিদরাজির প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করে।* এ না হলে পৃথিবীতে কোনো জনবসতি হতে পারতো না। এ ভূমণ্ডলের নিকটবর্তী স্তরে এমন সব

---

* এই হচ্ছে আমাদের শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের মাধ্যম যার অভাবে কথোপকথন সম্ভব ছিল না।

খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করে দেয়া হয়েছে যা উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের জন্যে একান্ত অপরিহার্য। ..... এ ভূলোকের উপর সমুদ্র, নদ-নদী, বিল-ঝিল, ঝর্ণা এবং প্রস্রবনের আকারে ভূগর্ভে পানির অফুরন্ত ভাণ্ডার রাখা আছে। পাহাড়ের চূড়াতেও পানি জমাট করার এবং তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।........ তারপর এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে প্রাপ্য সকল দ্রব্যাদি একত্র করে রাখার জন্যে আকর্ষণ রাখা হয়েছে। ...... তাছাড়া এ পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে যা তার উপর বসবাসকারী সকল জীবের জন্যে অত্যন্ত অনুকূল। ....

এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি সামঞ্জস্যেরই উল্লেখ করা হলো, যার কারণে পৃথিবী বর্তমানে বসবাসের উপযোগী হয়েছে। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি যদি এসব বিষয় সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ধারণা করতে পারবে না যে, কোনো বিজ্ঞ স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব সামঞ্জস্য একটি দুর্ঘটনার ফলে আপনা-আপনিই কায়েম হয়েছে। আর সে এ ধারণাও করতে পারবে না যে, এ বিরাট সৃজনশীল পরিকল্পনা রচনা ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে কোনো দেব-দেবী, জ্বিন, নবী, অলী কিংবা ফেরেশতার কণামাত্র কর্তৃত্ব আছে।[৪১২]

জীবন ও তার পুনর্জীবন বা পুনরাবৃত্তি

জীবনের উদ্গমের জন্যে যেসব কার্যকারণের (Factors) প্রয়োজন সে সবের ঠিক ঠিক পরিমাণসহ একেবারে আকস্মিকভাবে একত্রে সমাবিষ্ট হয়ে জীবনের আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করার মতবাদটি নাস্তিকদের একটা অবৈজ্ঞানিক কল্পনাবিলাস তো অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু অংকশাস্ত্রের হঠাৎ ঘটে যাওয়ার নিয়ম (Law of Chances) যদি এর উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য ছাড়া আর কিছু হবে না।

জীবন শুধু একটিমাত্র প্রতিকৃতিতে নয় বরঞ্চ অসংখ্য রকমের প্রতিকৃতিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবের প্রায় দশ লক্ষ এবং উদ্ভিদের প্রায় দুই লক্ষ প্রকারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লক্ষ লক্ষ প্রকার জীব তাদের গঠন ও প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরস্পর হতে সুস্পষ্টরূপে বিভিন্ন। এ বিভিন্নতা এতো সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, প্রাচীনতম জ্ঞাতকাল থেকে তারা আপন-আপন প্রজাতীয় আকার-আকৃতিকে এমনভাবে ক্রমাগত অক্ষুণ্ন রেখেছে যে, এক আল্লাহর সৃজনশীল পরিকল্পনা (Desing) ছাড়া জীবনের এ বিরাট রকম-বেরকম প্রজাতীয় পার্থক্যের অন্য কোনো প্রকার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া কোনো ডারউইনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

এখন একটু সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা যাক। স্রষ্টা প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রজাতির আকার-আকৃতি ও সংযোজনে এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Mechanism) স্থাপিত রেখেছেন যা তার অসংখ্য ব্যক্তি সত্তা থেকে অগণিত বংশ ঠিক তারই মতো প্রজাতীয় প্রতিকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যসহ ক্রমাগত বের করে যাচ্ছে। এ কোটি কোটি ক্ষুদ্র কারখানাগুলোতে কোনো এক প্রকারের প্রজাতি সৃষ্টির কারখানা ভুল করেও ভিন্ন প্রকারের নমুনা উৎপাদন করে না। আধুনিক প্রজনন বিজ্ঞানের (Genetics) পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে বিস্ময়কর তথ্য পেশ করেছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ চারার মধ্যে এ যোগ্যতা রেখে দেয়া

হয়েছে যে, সে তার আপন প্রজাতির ধারাবাহিকতা পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত অব্যাহত রাখার এমন পুরোপুরি ব্যবস্থা করবে যার ফলে পরবর্তী বংশধরেরা তাদের প্রজাতীয় সকল পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারবে এবং তাদের প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাই অন্যান্য সকল প্রকার প্রজাতীয় ব্যক্তিদের তুলনায় আপন প্রজাতীয় আকার প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র রূপ সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারবে। এ প্রজাতীয় স্থিতি ও প্রজননের উপাদান প্রত্যেকটি চারার একটি কোষের (Cell) একাংশে সুরক্ষিত থাকে। একটা অধিক শক্তিশালী অনুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা কিছুতেই দেখা যেতে পারে না। এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারটি চারা গাছটির লালনপালন ও বিকাশকে নির্ভুলভাবে এমন পথে নিয়ন্ত্রিত করে যা তার প্রজাতীয় প্রতিকৃতির নিজস্ব পথ। ..... জীবজগত ও মানব জাতির বেলায়ও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। তাদের মধ্যে কারো সৃষ্টি একবার হয়েই থেমে যায়নি। বরঞ্চ ধারণা করা যায় না সে কত ব্যাপকভাবে চারদিকে সৃষ্টি পুনরাবৃত্তির এক বিরাট কারখানা চলছে। সেখানে প্রত্যেক প্রজাতির বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা থেকে অনুরূপ প্রজাতীয় অসংখ্য সত্তা অস্তিত্ব লাভ করে চলেছে। .....

এসব ব্যবস্থাপনার সূচনাতে এক সুবিজ্ঞ ও সূক্ষ্মজ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্বই শুধু অনিবার্য নয়, বরঞ্চ প্রতিমুহূর্তে তা সঠিকভাবে অব্যাহত থাকার জন্যে এক পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং এক চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তার (খোদার) একান্তই প্রয়োজন, যিনি এক মুহূর্তের জন্যেও এ কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে গাফেল হবেন না।

এসব মহাসত্য ও তত্ত্ব যেভাবে নাস্তিকের নাস্তিকতার মূলোৎপাটন করে দেয়, তেমনি মুশরিকের শিরকেও মূলোৎপাটন করে।[৪১৩]

বিশ্ব প্রকৃতির মর্মকথার দুটি দিক

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قف مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط - الروم ٨

"তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি ? আল্লাহ যমীন ও আসমান এবং তাদের মধ্যস্থিত সকল কিছু সত্যতা সহকারে এবং একটি নির্দিষ্ট মুদ্দৎ পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ৮

এ বাক্যাংশে আখেরাত সম্পর্কে অতিরিক্ত দুটি দলিল পেশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষ যদি তার আপন সত্তা অস্তিত্বের বাইরের বিশ্বব্যবস্থা গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহলে দুটি তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে।

একটা এই যে, এ বিশ্ব প্রকৃতি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কোনো বালকের খেলা নয় যে, শুধু মনভুলাবার জন্যে সে কাদামাটি দিয়ে খেলাঘর বানালো। তার এ ঘর বানানো এবং তা ভেঙে ফেলা উভয়ই অর্থহীন। বরঞ্চ এ বিশ্বপ্রকৃতি একটা দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অনু-পরমাণু সুস্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দেয় যে, তা পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিবেচনা সহকারে তৈরী করা হয়েছে। তার প্রত্যেক বস্তুতে একটা আইন ও রীতিনীতি কার্যকর রয়েছে। তার প্রতিটি জিনিস উদ্দেশ্যপূর্ণ। মানুষের গোটা তামাদ্দুন, তার সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা স্বয়ং এ কথার

সাক্ষ্যদান করে যে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি জানার পর এবং প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সন্ধান করার পরই মানুষ এখানে এসব কিছু পুনর্গঠন করতে পারে। নতুবা একটা নিয়ম-নীতিহীন ও উদ্দেশ্যহীন খেলনায় যদি তাকে একটা পুতুলের মতো করে রাখা হতো, তাহলে এখানে কোনো বিজ্ঞান ও কোনো সভ্যতা সংস্কৃতির ধারণাই করা সম্ভব হতো না। যে মহাজ্ঞান এ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহকারে এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তার বুকে মানুষের মতো একটা সৃষ্টিকে উচ্চমানের মানসিক ও দৈহিক শক্তি দিয়ে ক্ষমতা এখতিয়ার দিয়ে বাছাই করার স্বাধীনতা দিয়ে, নৈতিক অনুভূতি দিয়ে নিজের তৈরী দুনিয়ার অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রী তার হাতে তুলে দিয়েছেন, তিনি মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন—এ কথা কি করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিতে আসতে পারে ? মানুষ দুনিয়ার বুকে গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক কাজ করবে, পাপ অথবা পুণ্য, ন্যায় অথবা অন্যায় করবে এবং সততা অথবা মিথ্যাচারিতা অবলম্বন করবে, তারপর এমনিই মৃত্যুবরণ করে মাটিতে মিশে যাবে, তার ভালো বা মন্দ কাজের কোনো প্রতিফলন হবে না ? সে তার এক একটি কাজের দ্বারা তার ও তার মতো অসংখ্য মানুষের জীবনে এবং দুনিয়ায় অসংখ্য জিনিসের উপরে ভালো বা মন্দ প্রভাব রেখে চলে যাবে এবং তারপর মৃত্যুর সাথে সাথেই তার কর্মকাণ্ডের গোটা দপ্তরখানা গুটিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে ? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কি হতে পারে ?

এ বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দ্বিতীয় তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। তাহলো এই যে, এখানে কোনো জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক জিনিসের একটা সময়-সীমা নির্ধারিত আছে এবং সে সীমায় পৌঁছলেই তা শেষ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতের ব্যাপারটাও তাই। এখানে যতো শক্তিই সক্রিয় তা সবই সীমিত। একটা সময় পর্যন্ত তা কার্যকর থাকে। কোনো এক সময়ে অনিবার্যরূপে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে এ ব্যবস্থাপনাও শেষ হয়ে যায়। প্রাচীনকালে যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী পৃথিবীকে অনাদি ও অবিনশ্বর বলতো, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাদের কথা কিছুটা চলতো। কিন্তু পৃথিবীর নিত্য নতুনত্ব ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নাস্তিক ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত যে বিতর্ক চলতো, আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের মতকেই সমর্থন করেছে। নাস্তিকদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে এ কথা বলার আর কোনো অবকাশই রইলো না যে, দুনিয়া অনন্তকাল থেকে আছে, অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং কেয়ামত কখনোই সংঘটিত হবে না। প্রাচীন বস্তুবাদ এ ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল যে, বস্তু কখনো ধ্বংস হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন হতে পারে। এর ভিত্তিতে একথা বলা যেতো যে, এ বস্তুজগতের না কোনো শুরু আছে, আর না কোনো শেষ। কিন্তু বর্তমানে আণবিক শক্তি (Atomic Energy) আবিষ্কারের ফলে সে ধারণা একেবারে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এখন এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে, শক্তি বস্তুতে এবং বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এমন কি তখন তার না থাকে আকার আকৃতি আর না কোনো নিরাকার রূপ। এখন থার্মো-ডাইনামিক্স্-এর দ্বিতীয় আইন (Second Law of Thermo-Dynamics) এ কথা প্রমাণ করেছে যে, এ বস্তু জগত না অনাদি আর না চিরশাশ্বত ও অবিনশ্বর। অনিবার্যরূপে তার শুরু এবং শেষ থাকতেই হবে। এজন্যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কেয়ামত অস্বীকার করা আর সম্ভব নয়। বিজ্ঞানই যখন এ ব্যাপারে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন দর্শন কোন্ যুক্তিতে কেয়ামত অস্বীকার করবে।[৪১৪]

ইহুদী ও ইহুদীবাদ

হযরত মূসা (আ)-এর পূর্ববর্তী যুগ

হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ঈসা এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালাম। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নাম যেহেতু ইসরাঈল ছিল, সে জন্যে তাঁর বংশধরগণ বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হন। তাঁদের প্রচারের ফলে যেসব জাতি তাঁদের দ্বীন গ্রহণ করে তারা হয়তো তাদের স্বকীয়তা পরিহার করে তাঁদের মধ্যে একাকার হয়ে যায় অথবা তারা বংশগতভাবে তাঁদের থেকে আলাদা হলেও ধর্মের দিক দিয়ে তাঁদের অনুসারী হয়ে পড়ে।[৪১৫]

এ জাতির পৌরাণিক কাহিনী এই যে, তাদের উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সাথে আল্লাহ তায়ালা মল্লযুদ্ধ করেন। সারারাত মল্লযুদ্ধ হতে থাকে। ভোবে প্রভাত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে হারাতে পারলেন না। তারপর আল্লাহ বললেন, এখন আমাকে যেতে দাও। ইয়াকুব (আ) বললেন, না তোমাকে যেতে দেব না যতোক্ষণ না তুমি আমাকে একটা 'বর' দাও। আল্লাহ বললেন, তোমার নামটা কি ? তিনি জবাবে বললেন—ইয়াকুব। আল্লাহ বললেন, ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়াকুব নয় ইসরাঈল হবে। কারণ তুমি খোদা ও মানুষের মধ্যে শক্তি পরিক্ষায় জয়ী হয়েছ।* (নাউযুবিল্লাহ)[৪১৬]

বনী ইসরাঈলের গৌরবময় অতীত

একদিকে যেমন হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইউসুফ (আ) প্রমুখ মহান নবীগণ এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, অপরদিকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে এবং তাঁর পরে মিসরে তাঁদের শাসন কর্তৃত্ব লাভের সৌভাগ্য হয়। দীর্ঘকাল যাবত তৎকালীন সভ্যতামণ্ডিত পৃথিবীর তারাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং চারপাশে তাঁদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজ করছিল।

সাধারণত মানুষ বনী ইসরাঈলের উন্নতি-অগ্রগতির ইতিহাস হযরত মূসা (আ) থেকে শুরু করে। কিন্তু এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাঈলের সত্যিকার উন্নতি অগ্রগতির যুগ হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেই অতীত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) তাঁর জাতির সামনে তাদের গৌরবময় অতীত তুলে ধরতেন।

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ২০)[৪১৭]

ইহুদীবাদের সূচনা ও নামকরণ

হযরত মূসা (আ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবীগণ যে দ্বীনে হকের প্রচার করেন তা তো ইসলামই ছিল। এসব নবীদের মধ্যে কেউই ইহুদী ছিলেন না। আর না তাঁদের যুগে

---

* দেখুন, The Holy Sepulchre -এর আধুনিকতম অনুবাদ Jewish Publications Society of America, 1954, আদি পুস্তক, অধ্যায় ৩২; স্তোত্র ২৫-২৯। খৃস্টানদের অনুদিত বাইবেলেও কথাটি এভাবে বলা হয়েছে। ইহুদী অনুবাদের টীকায় ইসরাঈল শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে- He who striveth with God- যিনি খোদার সাথে মল্লযুদ্ধ করেন। তারপর বাইবেল সাহিত্যের বিশ্বকোষে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ 'ইসরাঈল' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- Wrestler with God অর্থাৎ খোদার সাথে মল্লযুদ্ধকারী। বাইবেলের কেতাব হোসী (هو سيع) -তে হযরত ইয়াকুবের পরিচয় এ ভাষায় দেয়া হয়েছে,- তিনি তাঁর শক্তি সামর্থ থাকাকালে খোদার সাথে মল্লযুদ্ধ করেন। তারপর ফেরেশতাদের সাথে এবং বিজয়ী হন- অধ্যায় ১২, স্তোত্র ৪। ৪১৮

ইহুদীবাদের উৎপত্তি হয়। নামের ভিত্তিতে এ ধর্মের উৎপত্তি বহু পরবর্তী যুগের। ইয়াকুব (আ)-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার প্রতি এ ধর্ম আরোপ করা হয়। হযরত সুলায়মান (আ)-এর পর তাঁর রাজ্য যখন দু' খণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন এ পরিবার সে রাষ্ট্রের মালিক হয় যা ইয়াহুদীয়া নামে অভিহিত হয়। বনী ইসরাঈলের অন্যান্য গোত্রগুলো পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করে, যা সামেরিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারপর আসিরীয়গণ শুধু সামেরিয়াকেই ধ্বংস করে না, বরঞ্চ এসব ইসরাঈলী গোত্রগুলোরও নাম নিশানা মিটিয়ে দেয়, যারা এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। তারপর শুধু ইয়াহুদা এবং বিন ইয়ামিনের বংশই অবশিষ্ট রইলো। ইয়াহুদা বংশের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যে এদেরকে ইয়াহুদী বা ইহুদী নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ বংশে পাদ্রী-পুরোহিত, রিব্বী ও পণ্ডিতগণ আপন আপন ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী ধারণা-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় রীতিনীতির যে কাঠামো শত শত বছরে তৈরী করে তাকে বলা হয় ইহুদীবাদ বা ইহুদী ধর্ম। এ কাঠামো শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এবং পঞ্চম খৃস্টাব্দ পযর্ন্ত এর গঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

নবীগণের কাছে যে খোদায়ী হেদায়াত এসেছিল তার অতি সামান্য উপকরণই তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল এবং তার বিশিষ্ট বিষয়গুলো বিকৃত করা হয়েছিল। এ কারণে কুরআনের অনেক স্থানে তাদেরকে الذين هادوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ হে লোকেরা যারা ইহুদী হয়ে রয়েছো। তাদের মধ্যে সকলেই ইসরাঈলী ছিল না বরঞ্চ ঐসব লোকও ছিল যারা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কুরআনে যেখানে বনী ইরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে বনী ইসরাঈল শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেখানে ইহুদী ধর্মাবলম্বীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে الذين هادوا শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।[৪১৯]

হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে ইহুদী

আধুনিক যুগের গবেষকগণ বাইবেল এবং মিসরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার পর এ অভিমত পোষণ করেন যে রাখাল বাদশাহদের (Kyksos Kings) মধ্যে যে শাসকের নাম মিসরীয় ইতিহাসে 'এপোফিস্' (Apophis) বলা হয়েছে যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সম-সাময়িক ছিল।

মিসরের রাজধানী ছিল মিস্ফিস্। তার ধ্বংসাবশেষ কায়রোর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে দেখতে পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ) সতেরো-আঠারো বছর বয়সে সেখানে পৌঁছেন। দু'তিন বছর আযীয মিসরের গৃহে অবস্থান করেন। আট বছর জেলে অতিবাহিত করেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মিসরের শাসনকর্তা হন এবং আশি বছর যাবত একচ্ছত্রভাবে মিসরে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর শাসনের নবম অথবা দশম বছরে তিনি তাঁর পিতাকে গোটা পরিবারসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। কায়রো ও দিম্ইয়াতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনি তাঁদেরকে পুনর্বাসিত করেন। বাইবেলে এ অঞ্চলের নাম যুশান বা দুশান বলা হয়েছে।* হযরত মূসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত তাঁরা এ

* তালমুদে বলা হয়েছে যে যখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর আগমনের সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছে, তখন হযরত ইউসুফ (আ) রাজ্যের বিশিষ্ট আমীর-ওমরাহ, উচ্চপদস্থ সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে বেরিয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত ধুমধামের সাথে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। দুদিন যাবত উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে শোভাযাত্রায় মেয়ে-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলে যোগদান করে। সমগ্র দেশে আনন্দ উল্লাসের বন্যা প্রবাহিত হয়।[৪২০]

অঞ্চলে বসবাস করেন। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ (আ) একশ' দশ বছর জীবিত ছিলেন, মৃত্যুর সময় তিনি বনী ইসরাঈলকে অসিয়ত করেন যে, যখন তারা মিসর ত্যাগ করবে তখন যেন তাদের সাথে তাঁর কংকাল তুলে নিয়ে যায়।[৪২১]

যাঁর বদৌলতে তারা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) স্বয়ং নবী ছিলেন। তাঁর পরে চার পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত মিসরের শাসন ক্ষমতা তাদেরই হাতে ছিল। এ সময়ে অবশ্যই তারা মিসরে ইসলামের ব্যাপক প্রচার কার্য চালিয়ে থাকবে। মিসরবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের শুধু ধর্মই না, বরঞ্চ তাদের তামাদ্দুন এবং গোটা জীবন পদ্ধতি অমুসলিম মিসরীয়দের থেকে পৃথক এবং বনী ইসরাঈলের সাথে একই রঙে রঞ্জিত হয়। ভারতের হিন্দুরা যেমন (বিভাগ পূর্বকালে) মুসলমানদেরকে বিদেশী মনে করতো তেমনি মিসরীয়গণও তাদের সকলকে বহিরাগত মনে করতো। মিসরীয় মুসলমানদেরকে তারা বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত করতো, যেমন অনারব মুসলমানদেরকে 'মুহামেডান' বলা হতো। তারা নিজেরাও দ্বীন, সাংস্কৃতিক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অমুসলিম মিসরীয়দের থেকে পৃথক এবং বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই যখন মিসরে জাতীয়তাবাদের প্রবল আন্দোলন শুরু হয় তখন অত্যাচার উৎপীড়ন শুধু বনী ইসরাঈলের উপরেই হয়নি, বরঞ্চ তাদের সাথে মিসরীয় মুসলমানরাও তার শিকারে পরিণত হয়। তারপর বনী ইসরাঈল যখন দেশ ত্যাগ করে তখন মিসরীয় মুসলমানরাও তাদের সাথে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে বনী ইসরাঈলের মধ্যেই গণ্য করা হয়।*[৪২২]

মিসরে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব

হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগ অতীত হওয়ার পর মিসরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়। কিবতীগণ যখন পুনর্বার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে তখন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ইসরাঈলের ক্ষমতা চূর্ণ করার সকল প্রচেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে এবং তাদেরকে নিম্নস্তরের কাজকর্মে নিযুক্ত করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ তাদের জনসংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করার এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখার পলিসিও গ্রহণ করে, যাতে করে তাদের নারী সমাজ ক্রমশঃ কিবতীদের আয়ত্তে আসতে পারে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলী বংশের পরিবর্তে কিবতী বংশ পয়দা হতে পারে। তালমুদ এ সম্পর্কে আরও বলে যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মৃত্যুর এক শতাব্দীর কিছু কাল পরে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে ইসরাঈলীদেরকে তাদের উর্বর ভূসম্পত্তি, বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে এবং তারপর তাদেরকে সরকারের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে বেদখল করে। তারপরও যখন কিবতী শাসকগণ অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল এবং

---

* বাইবেলের বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত থেকে আমাদের এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন বাইবেল প্রণেতা 'যাত্রাপুস্তক' অধ্যায়ে বনী ইসরাঈলের মিসর পরিত্যাগের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তাদের সাথে অনুরূপ একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল (১২ ঃ ৩৮)। এসব অ-ইসরাঈলী মুসলমানদেরকে বিদেশী-বহিরাগত বলা হতো। তাওরাতে হযরত মূসা (আ)-কে যেসব হেদায়াত দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ঃ তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের সাথে অবস্থানকারী এসব বহিরাগতদের জন্যে বংশানুক্রমে একই আইন বলবৎ থাকবে। খোদার নিকটে বহিরাগতরাও সেই মর্যাদার অধিকারী হবে–যেমন তোমরা আছ (২৫ ঃ ১৪-১৫)– গ্রন্থকার।[৪২৩]

তাদের স্বধর্মাবলম্বী মিসরীয়গণ যথেষ্ট প্রভাবশালী তখন তাদেরকে নানাভাবে হেয় ও লাঞ্ছিত করা শুরু করে। অল্প পারিশ্রমিকে তাদের দ্বারা কঠিন শ্রম গ্রহণ করতে থাকে। এ হচ্ছে কুরআনের ঐ বর্ণনার ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে—ফেরাউন মিসরের অধিবাসীদের একদলকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে থাকে (يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً) এবং সূরা বাকারায় যেখানে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–আলে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে কঠিন শাস্তি দিত।[৪২৪]

হযরত মূসা (আ)-এর আগমন

বনী ইসরাঈল কয়েক শতাব্দী যাবত লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের জীবন যাপন করছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মূসা (আ)-কে পয়দা করেন। তাঁর মাধ্যমে এ জাতিকে গোলামির শৃংখল থেকে মুক্ত করেন। তারপর তাদের উপর কিতাব নাযিল করেন এবং তার প্রভাবে সেই পদদলিত ও নিষ্পেষিত জাতি হেদায়াতের আলো লাভ করে দুনিয়ার এক প্রখ্যাত জাতিতে পরিণত হয়।[৪২৫]

হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াত

হযরত মূসা (আ) দু' বিষয়ের দাওয়াতসহ ফেরাউনের নিকট গমন করেন। এক ঃ যেন সে আল্লাহর বন্দেগী (ইসলাম) কবুল করে এবং দ্বিতীয়তঃ যারা পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল, সেই বনী ইসরাঈল জাতিকে সে যেন তার অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করে।[৪২৬]

অপরদিকে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে এ শিক্ষা দেন ঃ

"আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। এ যমীন আল্লাহর এবং তিনি যাকে চান তাকে এ যমীনের ওয়ারিস বানিয়ে দেন। তাঁকে ভয় করে যারা কাজ করে, চূড়ান্ত সাফল্য তাদেরই।"

বনী ইসরাঈলের হীন মানসিকতা

এ সংকটময়কালে সত্যকে গ্রহণ করা এবং সত্যের পতাকাবাহীকে [মূসা আলাইহিস সালাম] নিজেদের নেতা বলে মেনে নেয়ার সৎসাহস কতিপয় যুবক ও যুবতী প্রদর্শন করে। কিন্তু পিতা-মাতা এবং জাতির বয়োজ্যেষ্ঠদের এ সৌভাগ্য হয়নি। সুযোগ সন্ধান, পার্থিব স্বার্থ এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের মানসিকতা তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তারা এ সত্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ এ পথকে তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতো। তারা বরঞ্চ যুব শ্রেণীকে বাধা দিয়ে বলতো, মূসা (আ)-এর নিকটবর্তী হয়ো না। নতুবা তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোষানলে পড়বে এবং আমাদের উপরেও বিপদ ডেকে আনবে।[৪২৭]

তাদের এ ধরনের আচরণের কারণ এ ছিল না যে, হযরত মূসা (আ) যে একজন সত্যনিষ্ঠ এবং তাঁর দাওয়াতও সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সম্পর্কে তাদের কণামাত্র সন্দেহ ছিল। বরঞ্চ কারণ এই যে, তারা এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বীগণ হযরত মূসা (আ)-এর সহযোগিতা করে ফেরাউনের নিষ্ঠুরতার শিকার হতে প্রস্তুত ছিল না। যদিও তারা বংশীয় ও ধর্মীয় দিক দিয়ে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইউসুফ (আ)-এর উম্মতভুক্ত ছিল এবং এর ভিত্তিতে তারা সকলে মুসলমান ছিল কিন্তু দীর্ঘদিনের নৈতিক অধঃপতন এবং গোলামি জীবনের সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে এমন কোনো শক্তিই অবশিষ্ট রাখেনি যে, তারা কুফর ও গোমরাহীর কর্তৃত্ব প্রভুত্বের মুকাবেলায় ঈমান ও হেদায়াতের পতাকাবাহী নিজেরা হবে অথবা পতাকাবাহীর সহায়তা করবে।[৪২৮]

প্রকাশ থাকে যে, অত্যাচার উৎপীড়নের একটা যুগ তখন ছিল যখন হযরত মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় রা'মাসিস্-এর শাসনকাল ছিল। উৎপীড়নের দ্বিতীয় যুগ শরু হয় ফেরাউন মিন ফিতাহ্-এর সময়ে হযরত মূসার আগমনের পরে। উভয় যুগে এ একই প্রথা ছিল যে, বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তান হত্যা করা হতো এবং কন্যা সন্তান জীবিত থাকতে দেয়া হতো।[৪২৯]

হযরত মূসা (আ) এবং ফেরাউনের এ দ্বন্দ্বে সাধারণ ইসরাঈলীদের ভূমিকা কি ছিল তা বাইবেলের নিম্নোক্ত পাঠ থেকে অনুমান করা যায় ঃ

"যখন তারা (মূসা ও হারুন) ফেরাউনের নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁরা দেখলেন যে তারা (ইসরাঈলীরা) তাঁদের সাক্ষাতের জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা বললো, খোদা তোমাদের উপর ইনসাফ করুন, তোমরা ফেরাউন ও তার অনুচরদের কাছে আমাদেরকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছ এবং আমাদেরকে হত্যা করার জন্যে তার হাতে তরবারী তুলে দিয়েছ।–যাত্রাপুস্তক ৬ ঃ ২০-২১।

তালমুদে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে বলতো– আমাদের দৃষ্টান্ত তো এমন যে, একটি নেকড়ে ছাগল ধরেছে এবং রাখাল তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারপর উভয়ের টানা-হেঁচড়াতে ছাগল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ঠিক এমনি তোমাদের এবং ফেরাউনের টানা-হেঁচড়াতে আমরা শেষ হয়ে যাব।[৪৩০]

মিসর থেকে বনী ইসরাঈলের হিজরত*

অবশেষে আল্লাহ তাআলা একটা রাত নির্ধারিত করে দেন যে রাতে সকল ইসরাঈলী এবং অ-ইসরাঈলী মুসলমানদেরকে মিসরের সকল অংশ থেকে হিজরতের জন্যে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। তারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে একটা কাফেলার আকারে বেরিয়ে পড়ে। .... হযরত মূসা (আ) লোহিত সাগরগামী পথ ধরেন। .... তাঁরা যখন সমুদ্র তীরে উপস্থিত হন, তখন ফেরাউন বিরাট বাহিনী সহ তাঁদের পিছু ধাওয়া করে সেখানে উপস্থিত হয়। সূরা শুয়ারায় বলা হয়েছে যে, মুহাজিরদের কাফেলা সমুদ্র এবং ফেরাউনের সৈন্যসামন্তের মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক সে মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ করেন, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। সাথে সাথেই সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং সমুদ্রের দুটি খণ্ড দুদিকে বিরাট টিলার মতো দাঁড়িয়ে যায়। কাফেলার পথ অতিক্রম করার জন্যে শুধু একটা পথ বেরিয়ে এলো তা নয়, বরঞ্চ সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশটি একটা শুষ্ক রাজপথে পরিণত হলো। মুহাজিরদের এ পথ অতিক্রম করার পরপরই ফেরাউন তার লোক লশকরসহ সমুদ্রের এ মধ্যবর্তী পথে নেমে পড়ে। তারপর সমুদ্র তাকে এবং তার লোকলশকর দু'দিক থেকে চেপে ধরে।[৪৩১]

---

* হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের সামনে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে দাওয়াত পেশ করলেন, তাঁর প্রতি কি কি দোষারোপ করা হলো, তাঁর যুগে ফেরাউনীদের উপর কি কি সতর্কতামূলক শাস্তি নাযিল হলো, স্বয়ং ইসরাঈলীদের কি অবস্থা ছিল এতোসব বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা ঐতিহাসিক গুরুত্বের এ দিকটা তুলে ধরছি যে, যেহেতু হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে অস্বীকৃতিই জানিয়েছে সেজন্যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ) নবী ইসরাঈলের মুক্তির জন্যে হিজরতের পথ অবলম্বন করেন।–সংকলকদ্বয়

মূসার জাতির মরুজীবন

হযরত মূসা (আ)-এর বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সিনাই উপদ্বীপে মারা, এলিয়াম ও রাফিদিমের পথ ধরে সিনাই পর্বতের দিকে এলেন। তারপর এক বছরের কিছু বেশী সময় সেখানে অবস্থান করেন।* এখানেই তাওরাতের অধিকাংশ নির্দেশাবলী তাঁর উপর নাযিল হয়।

ফিলিস্তিন আক্রমণের নির্দেশ

অতপর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়, বনী ইসরাঈলসহ ফিলিস্তিন জয় কর। এ তোমাদের উত্তরাধিকার ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলসহ তাব্ইর এবং হাসিরাতের পথ ধরে দাশতে ফারান পৌঁছেন। ফিলিস্তিনের অবস্থা যাঁচাই করার জন্যে তিনি এখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। কাদেস নামক স্থানে এসে সে প্রতিনিধি দল তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। ইউশা এবং কালেব ব্যতীত প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদন ছিল নিরুৎসাহব্যঞ্জক যা শুনার পর বনী ইসরাঈল আর্তনাদ করে উঠে এবং ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়।

শাস্তি হিসেবে মরু অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিচরণের দ্বিতীয় যুগ

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, বনী ইসরাঈল চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ অঞ্চলে দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে এবং ইউশা ও কালেব ব্যতীত তাদের বর্তমান বংশধর ফিলিস্তিনের মুখ দেখতে পাবে না। তারপর বনী ইসরাঈল দাশতে ফারান, শুর মরুভূমি ও দাশ্তে সীনের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং আমালিক, আমুরী, আদুমী, মিদ্ইয়ানী, মুওয়াবের অধিবাসী প্রভৃতির সাথে দ্বন্দ্ব কলহ করতে থাকে।

---

* বনী ইসরাঈলের মরুজীবনের কাহিনী অনেক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে অলৌকিকভাবে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ সম্পদে ভূষিত করা হয়। এ সময়ে তাদের অতীত গোলামি জীবনের নিদর্শন বিভিন্ন ভ্রান্ত আচরণের দ্বারা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার সংশোধনের জন্যে হযরত মূসা (আ) কঠোর পরিশ্রম করেন। এ দিক দিয়ে এ ছিল প্রশিক্ষণের যুগ।—সংকলকদ্বয়

ফিলিস্তিন বিজয় ও তার পরবর্তী যুগ

ফিলিস্তিন বিজয়

চল্লিশ বছর অতীত হওয়ার কিছু পূর্বে হুর পর্বতে হযরত হারুন (আ) ইন্তেকাল করেন। তারপর হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলসহ মোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং ঐ গোটা অঞ্চল জয় করে হাসবুন ও শাতীম্ পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে আবারিম পর্বতে হযরত মূসা (আ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম খলীফা হযরত ইউশা পূর্বদিক থেকে জর্দান নদী পার হয়ে ইয়ারিহো বা আরিহা শহর জয় করেন। এ হলো ফিলিস্তিনের প্রথম শহর যা বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা ফিলিস্তিন তাদের করতলগত হয়।*

বনী ইসরাঈলকে অধঃপতন থেকে রক্ষার জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর সতর্কবাণী

সূরা ইবরাহীমের ৭ আয়াতে হযরত মূসা (আ) এভাবে অসিয়ত করেন ঃ "এবং মনে রেখো, তোমাদের রব সাবধান করে দিয়েছিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে থাক তাহলে তোমাদেরকে বেশী বেশী সম্পদে ভূষিত করব, আর যদি আমার নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।**

এ বিষয়ের উপর প্রদত্ত ভাষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাইবেলে তাওরাতের পঞ্চম পুস্তকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর এ ভাষণে বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী স্মরণ করতে বলেন। তারপর যেসব নির্দেশাবলী তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের জন্যে পাঠানো হয়, তাওরাত গ্রন্থ থেকে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। .... তাঁর ভাষণের কোনো কোনো অংশ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে যে সকল আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেই সকল পালন না কর, তবে এ সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে শাপগ্রস্ত হইবে ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবে। .... যে কোনো কার্যে তুমি হস্তক্ষেপ করো, সেই কার্যে সদাপ্রভু তোমার উপর অভিশাপ, উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন না। .... তুমি

---

* ফিলিস্তিন বিজয়ের পূর্বে বনী ইসরাঈল বিভিন্ন ফেৎনায় লিপ্ত ছিল। বিজয়ের পর তাদের মধ্যে অনাচার-দুষ্কৃতি মাথাচাড়া দেয়। এর পরিণামও তাদেরকে ভোগ করতে হয়।

** এ ধরনের অসিয়তের প্রয়োজন এ জন্যে ছিল যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে ভূষিত হওয়ার পর বার বার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং তাওবা করার প্রেরণা দেন। তাদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ পোষণ করা অমূলক ছিল না যে, যদি তারা ফিলিস্তিনের বিজয় শীর্ষে উপনীত হয়, তাহলে শয়তান তাদেরকে সহজেই অবাধ্যতায় মগ্ন করে দিবে। এজন্যে আল্লাহর এ নীতির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয় যা সম্পদপ্রাপ্ত জাতির অবাধ্যতার আকারে কার্যকর হয়।—সংকলকদ্বয়

যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশ হইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন। .... তোমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশ পিত্তল ও নিম্নস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। ...... সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে পরাজিত করাইবেন ; তুমি এক পথ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে। তোমার সাথে কন্যার বিবাহ হইবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাহার সহিত সংগম করিবে। তুমি গৃহ নির্মাণ করিবে, কিন্তু তাহাতে বাস করিতে পাইবে না ; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিবে না। তোমার গরু তোমার সম্মুখে জবাই হইবে, ... সদাপ্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, উলংগতায় ও সকল বিষয়ের অভাব ভোগ করিতে করিতে তাহাদের দাসত্ব করিবে ; এবং যে পর্যন্ত তিনি তোমার বিনাশ না করেন, সে পর্যন্ত শত্রুরা তোমার গ্রীবাতে লৌহের জোয়াল দিয়া রাখিবে। .... আর সদাপ্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।"–(২৮ ঃ ১৫-১৬)[৪৩৩]

হযরত ইউশার সংশোধনী দাওয়াত

মিসর থেকে বেরিয়ে আসার সত্তর বছর পরে (যখন বনী ইসরাঈল পৌত্তলিক পূজায় লিপ্ত হয়–সংকলক) হযরত মূসা (আ)-এর প্রথম খলীফা হযরত ইউশা বিন নূন্ জনসমাবেশে তাঁর শেষ ভাষণে যা কিছু বলেছিলেন তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মিসরের গোলামি জীবন-যাপন বনী ইসরাঈলের মনমানসিকতা কতখানি বিকৃত করে দিয়েছিল। তাঁর ভাষণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা [ফরাৎ] নদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের সেবা করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেও ; এবং সদাপ্রভুর সেবা কর। যদি সদাপ্রভুর সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর ; ...... কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমার সদাপ্রভুর সেবা করিব।"–যিহোশূয়া ২৪ ঃ ১৪-১৫

এসব থেকে অনুমান হয় যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর এবং আটাশ বছর পর্যন্ত হযরত ইউশার হেদায়াত ও তারবিয়তের অধীনে জীবন যাপন করার পরও এ জাতি তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ঐসব প্রভাব দূর করতে পারেনি, যা ফেরাউনের আনুগত্যের যুগে তাদের অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছিল।*[৪৩৪]

---

* এ জাতির স্বভাব প্রকৃতির বক্রতা এবং কাপুরুষতা কুরআন পাকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। মিসরে হযরত মূসা (আ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিতে অনীহা, মিসর থেকে মুক্তিলাভের পর পরই সামেরীর প্রভাবে গোবৎস্য পূজা, গরু জবাই করার জন্যে হযরত মূসা (আ) আদেশ করলে তা আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়ার পরিবর্তে বার বার প্রশ্ন করা, সিনাই প্রান্তরে আল্লাহর নিয়মাতস্বরূপ বিনা মূল্যে মান্না ও সালওয়া লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে শহরের পুরাতন খাদ্যের দাবী উত্থাপন, জিহাদের সময় হুকুম পালনে অস্বীকার, ইয়াওমে সাব্‌তের নির্দেশাবলী লংঘন, আল্লাহর কিতাব বিকৃতকরণ, নবীগণের হত্যা ও তাঁদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ অর্থের বিনিময়ে জ্ঞানদান, সত্য গোপন করা, মোটকথা বনী ইসরাঈলের গোটা ইতিহাস এভাবে মসীলিপ্ত হয়ে আছে।–সংকলকদ্বয়

ফিলিস্তিন বিজয়ের পর

হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতির বাস ছিল। যেমন—হিত্তি, আম্মুরী, কান্‌আনী, হাবী, ইয়াবুসী, ফিলিস্তী প্রভৃতি। অতি নিকৃষ্ট ধরনের শির্‌ক তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। .... সমগ্র খোদায়ী বহু দেব-দেবীর মধ্যে বন্টন করা ছিল। .... এসব দেব-দেবীর প্রতি এমন সব ঘৃণ্য বিশেষণ ও কার্যকলাপ আরোপ করা হতো যে, নৈতিকতার দিক দিয়ে অতীব চরিত্রহীন লোকও তাদের সাথে পরিচিত হওয়া পছন্দ করতো না। .... তাদের সমাজে সন্তান বলী দেয়ার প্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তাদের উপাসনালয়গুলো ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। নারীদেরকে দেব-দাসী বানিয়ে উপসনালয়ে রাখা এবং তাদের সাথে ব্যভিচার করা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করা হতো।

তাওরাতে হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে যেসব হেদায়াত দেয়া হয়েছিল, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল তারা যেন ঐসব জাতিকে ধ্বংস করে তাদের হাত থেকে ফিলিস্তিন ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের সাথে বসবাস করা থেকে ও তাদের নৈতিক ও বিশ্বাসমূলক দোষত্রুটি থেকে যেন দূরে থাকে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এসব হেদায়াত ভুলে যায়। তারা তাদের কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র কায়েম করেনি। তারা গোত্রীয় গোঁড়ামিতে লিপ্ত ছিল। তাদের প্রত্যেক গোত্র বিজিত অঞ্চলের একটা অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করতো।* এভাবে পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কোনো গোত্রই এতোটা শক্তিশালী ছিল না যে, আপন আপন এলাকা মুশরিকদের থেকে পুরোপুরি পবিত্র রাখতে পারতো। অবশেষে তাদের সাথে মুশরিকদের সহাবস্থান তারা মেনে নিয়েছিল। এর প্রথম পরিণাম তাদের ভোগ করতে হয়েছিল এই যে ঐসব জাতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে শির্‌ক অনুপ্রবেশ করে এবং তার সাথে অন্যান্য নৈতিক জঞ্জাল-আবর্জনার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।**[৪৩৫]

বাইবেল থেকে জানা যায় যে, তালূতের যুগ পর্যন্ত সাইদা, সূর, দূর, মুজাদ্দা, বায়তে শাম, জাযার, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলো মুশরিকদের অধিকারে ছিল এবং বনী ইসরাঈলের উপরে এ শহরগুলোর পৌত্তলিক সভ্যতার বিরাট প্রভাব পড়তে থাকে। উপরন্তু, ইসরাঈলী গোত্রগুলোর সীমান্তে ফিলিস্তী, আদুমী, মোয়াবী এবং আমুনীদের রীতিমতো শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা পর পর আক্রমণ করে ইসরাঈলীদের নিকট থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা ছিনিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে বনী

---

* ফিলিস্তিনের ক্ষুদ্র ভূখণ্ড যেসব গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল তারা ছিল ঃ বনী ইয়াদুহা, বনী শামউন, বনী দানী, বনী ইয়ামিন, বনী আফ্‌রায়েম, বনী রুবান, বনী জাদ্দ, বনী মুনসা, বনী আশকার, বনী যেবুবুন, বনী নিফ্‌তালী, বনী আশের প্রভৃতি (গ্রন্থকারের গবেষণা)।

** দ্বিতীয় পরিণাম যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল তাহলো এই যে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তিগণ (যাদের সমগ্র অঞ্চল অপরাজিত ছিল) বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে একটা জোট গঠন করে এবং বার বার আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে বৃহৎ অংশ থেকে বেদখল করে দেয়। এমনকি তাদের নিকট থেকে খোদার শপথের সিন্দুক পর্যন্ত কেড়ে নেয়। অবশেষে বনী ইসরাঈল একজন শাসকের অধীনে একটা অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনবোধ করে। ...... এ অখণ্ড রাজ্যের তিনজন শাসক ছিলেন, হযরত তালূত, হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)। এ শাসকগণ ঐসব কার্য সমাধা করেন যা মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈল অসম্পন্ন রেখেছিল।–গ্রন্থকার[৪৩৭]

ইসরাঈলকে সেখান থেকে কান ধরে বহিষ্কার করে দেয়া হতো যদি না যথাসময়ে আল্লাহ তাআলা তালূতের নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে একত্র করে দিতেন।[৪৩৬]

বনী ইসরাঈলের প্রথম বিপর্যয়ের যুগ

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পর দুনিয়ার লোভ-লালসায় ইসরাঈলীগণ ভয়ানকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে দুটি পৃথক রাজ্য কায়েম করে। উত্তর ফিলিস্তিন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈল রাষ্ট্র কায়েম হয়। শেষ পর্যন্ত তার রাজধানী সামেরিয়া নির্ধারিত হয়। দক্ষিণ ফিলিস্তিন ও আদুম অঞ্চলে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্র কায়েম হয়। জেরুশালেম তার রাজধানী হয়। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম দিন থেকেই চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

তাদের মধ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের শাসক ও অধিবাসী প্রতিবেশী জাতিগুলোর মুশরিকী ধারণা-বিশ্বাস ও নৈতিক অনাচার দ্বারা সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ে। .... হযরত ইলিয়াস এবং হযরত আল ইয়াসা আলাইহিমাস সালাম এ বন্যা প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এ জাতি যে অধঃপতনের দিকে ছুটে চলেছিল তা থেকে আর ফিরে এলো না। অবশেষে আশিরীয়দের রূপে খোদার গযব ইসরাঈলীদের উপর এসে পড়ে এবং খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দী পর্যন্ত ফিলিস্তিনের উপরে বিজয়ী আশিরীয়দের ক্রমাগত আক্রমণ চলতে থাকে। ....

ছ'শ বিশ খৃস্টপূর্বে আশুরের নির্মম শাসক সারগুন সামেরিয়া জয় করে ইসরাঈল রাষ্ট্রের সমাপ্তি ঘটায়।

বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় যে রাষ্ট্রটি দক্ষিণ ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিয়া নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পর অতি সত্বর শির্‌ক ও চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

যদিও ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ন্যায় তার উপরেও আশুরিয়াগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালায়, তাদের শহর ধ্বংস করে এবং রাজধানী অবরোধ করে, তথাপি এ রাষ্ট্রটি আশুরিয়দের হাতে শেষ হয়ে যায়নি। শুধু করদমিত্র হয়ে রয়েছিল। .... শেষে ৫৮৭ খৃস্টপূর্বে বেবিলনের বাদশাহ বোখত্ নসর এক ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোটো বড়ো সকল শহর ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। সে জেরুশালেম এবং হায়কালে সুলায়মানী এমনভাবে ধূলিসাত করে দেয় যে, তার কোনো একটি দেয়ালও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ইহুদীদের বহু সংখ্যক লোককে তাদের অঞ্চল থেকে বহিষ্কৃত করে বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।[৪৩৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটি সুযোগ দান

আশুরিয়দের বিজয়ের পর সামেরিয়া ও ইসরাঈলের লোকজন ঈমান-আকীদা ও নৈতিকতার চরম অধঃপতন থেকে আর মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়াবাসীদের এমন কিছুসংখ্যক লোকও রয়ে গিয়েছিল, যারা কল্যাণমূলক নীতির অনুসারী ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী ছিল। ইয়াহুদিয়ার মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের মধ্যে তারা সংস্কার সংশোধনের কাজ করতে থাকে। বেবিলন এবং অন্যান্য অঞ্চলে যাদেরকে নির্বাসিত করা

হয়েছিল তাদের মধ্যে তাওবা করার প্রেরণা দান করে। অতপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাদের সহায়ক হয়। বেবিলন রাষ্ট্রের পতন হয়। খৃস্টপূর্ব ৫৩১ সনে ইরানী দিগ্বিজয়ী সাইরাস (খুরস অথবা খসরু) বেবিলন অধিকার করে। তার দ্বিতীয় বছর সে এই বলে এক ফরমান জারী করে যে, ইসরাঈলীগণকে আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করার এবং সেখানে পুনর্বাসিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো।

সাইরাস হায়কালে সুলায়মানী পুণর্নির্মাণের জন্যে ইহুদীদেরকে অনুমতি দেয়। কিন্তু যে সকল প্রতিবেশী গোত্র ঐ অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল তারা কিছুকাল যাবত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। অবশেষে প্রথম দারিউস্ (দারা) ৫২২ খৃস্টপূর্বে ইয়াহুদিয়ার সর্বশেষ বাদশাহর পৌত্র যরুবাবেলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী নবী, যাকারিয়া নবী এবং পুরোহিত প্রধান ইশ্‌র তত্ত্বাবধানে পবিত্র হায়কাল পুনর্নির্মাণ করে।

এ সময় ওযায়ের (আ) হযরত মূসা (আ)-এর দীনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরাট কাজ করেন। তিনি ইহুদী জাতির সকল সৎ ও কল্যাণকারী লোকদেরকে সকল স্থান থেকে একত্র করে এক সুদৃঢ় সংগঠন কায়েম করেন। তিনি তাওরাতসহ বাইবেলের পুস্তকসমূহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ইহুদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শরীআতের আইন জারী করে সেসব মানসিক ও নৈতিক দোষত্রুটি সংশোধন করা শুরু করেন যা ভিন্ন জাতির প্রভাবে ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ইহুদীরা যেসব মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করেছিল তাদেরকে তালাক দেয়ানো হলো। বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে নতুন করে আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর আইন মেনে চলার শপথ নেয়া হলো। দেড়শ' বছর পর বায়তুল মাক্দিস নতুন করে বসতিপূর্ণ হলো এবং ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে পড়লো।

গ্রীক আধিপত্য ও মাক্কাবী আন্দোলন

তৃতীয় এন্টিউকাস্ খৃস্টপূর্ব ৯৮ সনে ফিলিস্তিন অধিকার করেন। সে ছিল সলুকীরাজ্যের শাসক এবং তার রাজধানী ছিল এন্তাকিয়া। এ গ্রীক দিগ্বিজয়ী ধর্মীয় দিক দিয়ে মুশরিক ছিল এবং ছিল স্বেচ্ছাচারী। সে ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতি সহ্য করতো না। তার মুকাবেলায় সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে গ্রীক সভ্যতার প্রসার শুরু করে এবং স্বয়ং ইহুদীদের মধ্য থেকে একটা বিরাট অংশ তার ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। বাইরের এ হস্তক্ষেপ ইহুদী জাতির মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। একদল গ্রীক পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সমাজব্যবস্থা ও গ্রীক খেলাধূলা আয়ত্ত করে ফেলে এবং অপর দল আপন সভ্যতার উপর অটল থাকে।

খৃস্টপূর্ব ১৫৭ সনে চতুর্থ এন্টিউকাস্ (যার উপাধি ছিল এপিফিনিস অর্থাৎ খোদার প্রকাশ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন সে স্বৈরাচারী শক্তি প্রয়োগ করে ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতার মূলোৎপাটন করতে চায়।* .... কিন্তু ইহুদীরা এ স্বৈরাচারের নিকট নতি স্বীকার করে না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে এক বিরাট আন্দোলন শুরু হয় ইতিহাসে যা মাক্কাবী বিদ্রোহ বলে প্রসিদ্ধ। যদিও গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীরা গ্রীকদের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শন করে

* যেসব বিস্তারিত নির্দেশ জারী করে ইহুদীদের সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাস, পূজা-উপাসনা, ধর্মীয় নিদর্শনাবলী এবং সমাজব্যবস্থার মূল নীতিকে লক্ষ্য বানানো হয়েছিল তার উল্লেখ এখানে করা হয়নি।—সংকলকদ্বয়

এবং মাক্কাবী বিদ্রোহ দমনে এন্তাকীয়ার যালেমদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে, কিন্তু সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে হযরত ওযায়েরর দীনদারীর যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেন তা এতোটা প্রবল ছিল যে, তারা সকলে মাক্কাবীদের দলে যোগদান করে। অবশেষে তারা গ্রীকদেরকে বহিষ্কার করে তাদের ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। এ রাষ্ট্র খৃষ্টপূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত কায়েম থাকে। এ রাষ্ট্রের সীমা সম্প্রসারিত হয়ে ঐ সমগ্র অঞ্চলকে আয়ত্তাধীন করে যা এক সময়ে ইয়াহুদিয়া এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রদ্বয়ের অধীন ছিল। উপরন্তু ফিলিস্তিয়ারও একটা বিরাট অংশ তাদের হস্তগত হয় যা হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও আয়ত্তে আনা যায়নি।[৪৪০]

দ্বিতীয় বিপর্যয় ও তার পরিণাম

যে দীনী ও নৈতিক প্রেরণাসহ মাক্কাবী আন্দোলন চলেছিল, তা ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। দীনী প্রেরণা, দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিতে পর্যবসিত হয়। অবশেষে তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং তারা রোমীয় দিগ্বিজয়ী পাম্পীকে ফিলিস্তিন আগমনের আহ্বান জানায়। অতএব পাম্পী খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সনে ফিলিস্তিন বিজয়ে মনোনিবেশ করে এবং বায়তুল মাকদিস অধিকার করে ইহুদীদের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে। কিন্তু রোমীয় দিগ্বিজয়ীদের স্থায়ী নীতি এ ছিল যে, তারা বিজিত অঞ্চলে সরাসরি শাসন পরিচালনা করার পরিবর্তে স্থানীয় শাসক নিযুক্ত করে তার দ্বারা আপন কার্যসিদ্ধি করাকেই বেশী পসন্দ করতো। এজন্যে সে ফিলিস্তিনে আপন কর্তৃত্বাধীন একটি স্বদেশীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অবশেষে এ রাষ্ট্রটি খৃষ্টপূর্ব ৪০ সালে হিরো নামীয় একজন চতুর ইহুদীর অধিকারে আসে। সে হিরোদ দি গ্রেট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। .... সে একদিকে ধর্মীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ইহুদীদের সন্তুষ্ট রাখে এবং অন্যদিকে রোমীয় সভ্যতার প্রসার ঘটিয়ে এবং রোম সাম্রাজ্যের আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কায়সারকে সন্তুষ্ট রাখে। সে সময়ে ইহুদীদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছে।

একচল্লিশ খৃস্টাব্দে হিরোদ দি গ্রেটের পৌত্র হিরোদ আগ্রিয়াপ্পাকে রোমীয়গণ ঐ সকল এলাকার শাসক নিযুক্ত করে যা হিরোদ দি গ্রেটের শাসনাধীন ছিল। হিরোদ আগ্রিয়াপ্পা ক্ষমতা লাভের পর হযরত মাসিহ (আ)-এর অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চালায়।

সে যুগে ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের যে অবস্থা ছিল তার সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে হযরত ঈসা (আ) তাঁর ভাষণে তাদের যে সমালোচনা করেন তা জানা দরকার।

এ জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মতো একজন নিষ্কলুষ চরিত্রবান লোকের শিরশ্চেদ করা হয়। কিন্তু এ পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে তারা কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তারপর সমগ্র জাতি হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। .... এমন কি যখন পন্টিস্ পিলাতিস্ এ হতভাগ্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন.......... বল, ঈসাকে ছেড়ে দেব, না বরাব্বা ডাকাতকে ? সমগ্র জনতা এক বাক্যে বলে, বরাব্বাকে ছেড়ে দিন। এ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জাতির প্রতি সকল যুক্তি-প্রমাণের চূড়ান্ত পরিণতি।

তারপর অল্পকাল অতীত হতে না হতেই ইহুদী ও রোমীয়দের মধ্যে চরম সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৬৪ ও ১৬৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। .... অবশেষে রোম সাম্রাজ্য কঠোর সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিদ্রোহ দমন করে এবং ৭০ খৃস্টাব্দে টিটাস বলপ্রয়োগে জেরুশালেম জয় করে। এ সময়ে গণহত্যায় এক লক্ষ তেত্রিশ

হাজার লোক নিহত হয়। ছিয়াত্তর হাজারকে বন্দী করে দাসে পরিণত করা হয়। হাজার হাজার লোককে বলপূর্বক মিসরীয় খনিতে কাজের জন্যে পাঠানো হয়। বিভিন্ন শহরে এম্পিথিয়েটার ও কালোসিয়ামে হিংস্র পশুদের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যে অথবা তরবারীর খেলার শিকারে পরিণত করার জন্যে হাজার হাজার লোককে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদেহী সুন্দরী বালিকাদেরকে বিজয়ীদের জন্যে বেছে নেয়া হয়। জেরুশালেম শহর ও হায়কাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। তারপর ফিলিস্তিনে ইহুদী প্রভাব এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় যে দু'হাজার বছর ধরে তাদের আর মাথা তুলবার সুযোগ হয়নি।[৪৪১]

তাওরাতের মধ্যে রদবদল*

তাওরাতের পঞ্চম পুস্তকে হযরত মূসা (আ)-এর যে সর্বশেষ ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বার বার বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে নিম্নোক্ত শপথ গ্রহণ করা হয় ঃ

যেসব নির্দেশ আমি তোমাদের নিকটে পৌছিয়েছি, তা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নাও, ভবিষ্যত বংশধরকে তা শিক্ষা দাও, উঠতে-বসতে, শয়নে-স্বপনে তার চর্চা কর, ঘরের চৌকাঠে সেসব লিখে রাখ।

অতপর তিনি তাঁর অসিয়তে এ কথা বলেন, ফিলিস্তিন সীমান্তে প্রবেশ করার পর তোমাদের প্রথম কাজ হবে আয়বাল পর্বতের উপর বড়ো বড়ো পাথর স্থাপন করে তার উপর তাওরাতের নির্দেশাবলী খোদাই করা।

উপরন্তু হযরত মূসা (আ) বনী লাবীকে একখণ্ড তাওরাত দিয়ে নির্দেশ দেন, সাত বছর পর পর খাইয়ামের ঈদের দিনে নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলকে স্থানে স্থানে একত্র করে সমস্ত কেতাব (তাওরাত) প্রতিটি শব্দে শব্দে তাদেরকে যেন তারা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবের প্রতি বনী ইসরাঈলের অনীহা ক্রমশ এতেটা বেড়ে গেল যে, হযরত মূসা (আ)-এর সাতশ' বছর পর হায়কালে সুলায়মানীর উত্তরাধিকারী ও জেরুশালেমের ইহুদী শাসকের জানাই ছিল না যে, তাওরাত নামে কোনো কিতাব তাদের কাছে রয়েছে।

ইহুদী আলেমদের সবচেয়ে বড়ো দোষ এ ছিল যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান বিতরণের পরিবর্তে তাকে রিব্বী ও ধর্মীয় ব্যবসায়ীদের এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে গোপন রেখেছিল এবং সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, স্বয়ং ইহুদী জনসাধারণের স্পর্শ থেকেও তা দূরে রেখেছিল। তারপর যখন সর্বসাধারণের অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে অনাচার প্রসার লাভ করতে থাকে, তখন আলেমগণ শুধু যে তাদের সংস্কার সংশোধনের চেষ্টাই করলো না তাই নয়, বরঞ্চ জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে যে গোমরাহি ও বেদয়াত জনগণের মধ্যে প্রচলিত হতো, কথা ও কাজের দ্বারা অথবা নীরব ভূমিকা পালনের দ্বারা তার বৈধতার সনদ দান করতো।[৪৪৩]

তারা শুধু কালামে ইলাহীর অর্থই নিজেদের ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করেনি, বরঞ্চ বাইবেলে নিজেদের ভাষ্য, জাতীয় ইতিহাস, কুসংস্কার ও আন্দাজ-অনুমান, কাল্পনিক দর্শন

* তাওরাতে কালামে ইলাহীর মধ্যে ইহুদী ধর্মপ্রচারক, ভাষ্যকার, বক্তা ও শাস্ত্রবিদগণ যেসব পরিবর্তন পরিবর্ধন নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছে, তার থেকে ইহুদীবাদের কাঠামো তৈরী হয়েছে।-সংকলকদ্বয়

এবং নিজেদের চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত আইন-কানুন কালামে ইলাহীর সাথে মিশ্রিত করে ফেলে।** এসব কিছু মানুষের সামনে এভাবে পেশ করতো যেন এ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক দর্শন, প্রত্যেক ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা, প্রত্যেক দার্শনিক পণ্ডিতের আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা-বিশ্বাস এবং প্রত্যেক শাস্ত্রবিদের আইনসংক্রান্ত গবেষণা বাইবেলে স্থান লাভ করেছে এবং এসব আল্লাহর বাণীতে (Word of God) পরিণত হয়েছে। তার উপরে ঈমান আনা অপরিহার্য এবং তার থেকে মুখ ফেরানোর অর্থ হলো দ্বীন থেকে মুখ ফেরানো।

আমাদের জানা মতে ওল্ড্ টেস্টামেন্টের পঞ্চমপুস্তক (Pentateuch) প্রকৃত তাওরাত নয়। প্রকৃত তাওরাত দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এ মতবাদের সমর্থন স্বয়ং ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ থেকেই পাওয়া যায়। তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত মূসা আল-াইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে হযরত ইউশার সাহায্যে তাওরাত সংকলন করে একটি সিন্দুকে রেখে দেন (আদি পুস্তক ৩১ ঃ ২৪-২৭)। তাঁর ইন্তেকালের পর খৃষ্ট পূর্ব ষাট শতাব্দীতে যখন। বখ্ত্ নসর বায়তুল মাক্দিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তখন হযরত মূসা (আ)-এর পরে তাঁর শরীআতের মুজাদ্দিদগণ যেসব বই পুস্তক প্রণয়ন করেন সেগুলো সমেত সে পবিত্র সিন্দুকও পুড়ে যায়। এ ধ্বংসকাণ্ডের দু'শ আড়াইশ' বছর পর হযরত ওযায়ের (আ) স্বয়ং বাইবেলের বর্ণনামতে বনী ইসরাঈলের পাদ্রী পুরোহিতদের সাথে মিলে আসমানী ইলহামের সাহায্যে এ গ্রন্থ নতুন করে প্রণয়ন করেন। কিন্তু কালচক্র এ নতুন প্রণীত গ্রন্থকেও তার প্রকৃত অবস্থায় থাকতে দেয়নি। আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেট-এর বিশ্বজনীন দিগ্বিজয়ের প্লাবন যখন গ্রীক সাম্রাজ্যের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রসারিত হয়, তখন খৃস্টপূর্ব ২৮০ সালে তাওরাতের সকল গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। তারপর ক্রমশ ইবরানী অনুলিপিগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং গ্রীক অনুবাদ প্রচলিত হয়ে পড়ে। অতএব আজকাল আমাদের সামনে যে তাওরাত রয়েছে তার সনদ কিছুতেই হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত পৌঁছে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বর্তমান তাওরাতের মধ্যে প্রকৃত তাওরাতের কোনো অংশই শামিল নেই অথবা এ একেবারেই জাল। আসলে যা কিছু আমরা বলতে চাই তাহলো এই যে, এ তাওরাতে আসল তাওরাতের সাথে আরও অনেক কিছু সংমিশ্রিত হয়েছে। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, আসল তাওরাতের বহু কিছু এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি। আজ যদি কেউ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তাহলে সে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করবে যে, এ গ্রন্থে আল্লাহর বাণীর সাথে ইহুদী পণ্ডিতদের ভাষ্য, বনী ইরাঈলের জাতীয় ইতিহাস, ইসরাঈলী শাস্ত্রবিদগণের আইন সংক্রান্ত গবেষণা এবং অন্যান্য বহু কিছু এমনভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে যে, যার থেকে বেছে আল্লাহর বাণী আলাদা করে দেখানো বড়োই কঠিন ব্যাপার।

** কুরআনের ভাষায় ইহুদী পণ্ডিতদের অবস্থা নিম্নরূপ ছিল ঃ

অধিকাংশ ইহুদী আলিম, পীর, দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখতো– (সূরা তাওবা ঃ ৩৪)। যালেমরা ফতয়া বিক্রি করতো, ঘুষ খেতো, নযর নিয়ায লুট করতো, এমন সব ধর্মীয় রীতিনীতি আবিষ্কার করতো যাতে মানুষ তাদের যুক্তি তাদের কাছ থেকে খরিদ করতে পারে। এবং তাদের জীবন-মরণ, বিয়ে-শাদী কিছুই তাদেরকে খুশী না করে হতে পারতো না এবং তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের ঠিকাদার তাদেরকেই মনে করতো। শুধু তাই-ই নয়, বরঞ্চ আপন স্বার্থের জন্যে এ ধর্ম ব্যবসায়ীরা মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার জালে আবদ্ধ করতো। যদি কোনোসত্যের আওয়াজ উঠতো, তাহলে তারা সকলের আগে তাদের প্রতারণার জাল বিস্তার করে তাদের পথ রুদ্ধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হতো।

এই সাথে আমরা একথাও সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, কুরআনের দৃষ্টিতে তাওরাতের দীন এই ছিল যা কুরআনের দীন, আর মুহাম্মদ (সা) যেমন ইসলামের নবী, ঠিক হযরত মূসা (আ)-ও ছিলেন ইসলামের নবী। বনী ইসরাঈল সীচনাতে এ দীনেরই অনুসারী ছিল। কিন্তুপরবর্তীকালে তারা আসল দীনের মধ্যে আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী অনেক কমবেশী করে 'ইহুদীবাদের' নামে এক নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থা রচনা করে নিয়েছে।*৪৪৫

প্রকৃতপক্ষে তাওরাত বলতে ঐসব নির্দেশাবলী বুঝায় যা হযরত মূসা (আ)-এর নবুয়াতের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর উপর নাযিল হয়। তাঁর মধ্যে দশটি নির্দেশনামা তো এমন ছিল যা প্রস্তর-ফলকে খোদিত করে তাঁকে দেয়া হয়। অবশিষ্ট নির্দেশাবলী হযরত মূসা (আ) লিখিয়ে নিয়ে তার বারোটি অনুলিপি করে বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের মধ্যে বন্টন করে দেয়। একটা অনুলিপি বনী লাবীকেও দেয়া হয়, যাতে করে তারা তার সংরক্ষণ করতে পারে। এ গ্রন্থের নামই হচ্ছে তাওরাত। এ একটা স্থায়ী গ্রন্থ হিসেবে বায়তুল মাক্দিসের প্রথম ধ্বংসকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। তার যে অনুলিপি বনী লাবীকে দেয়া হয়, তা প্রস্তর ফলকসহ শপথের সিন্দুকে রাখা হয়। বনী ইসরাঈল একে তাওরাত বলেই জানতো। এর প্রতি তাদের অবহেলা এতদূর পর্যন্ত পৌছছিল যে, ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ ইউসিয়ার শাসনকালে যখন হায়কালে সুলায়মানীর মেরামত করা হয়, তখন হঠাৎ পুরোহিত প্রধান (অর্থাৎ হায়কালের স্থলাভিষিক্ত এবং জাতির প্রধানতম ধর্মীয় নেতা)। একস্থানে রক্ষিত তাওরাত গ্রন্থ দেখতে পায়। সে তাকে একটা বিস্ময়কর বস্তু মনে করে শাহী মুন্সীকে দিয়ে দেয়। মুন্সী আবার তা বাদশাহের সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যেন একটা বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এই হলো কারণ যে, যখন বখ্ত্ নসর জেরুশালেম জয় করে এবং হায়কালসহ গোটা শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে, তখন বনী ইসরাঈলের বিস্মৃত আসল তাওরাত গ্রন্থ যার সংখ্যায় ছিল অতি অল্প, চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর হযরত ওযায়েরের সময়ে বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট লোকজন বেবিলনের বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হয়ে জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন করে এবং বায়তুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করা হয়, তখন ওযায়ের জাতির কতিপয় প্রবীণদের সহায়তায় বনী ইসরাঈলের গোটা ইতিহাস প্রনয়ণ করেন। এসব এখন বাইবেলের প্রথম সতেরটি পুস্তকে সন্নিবেশিত রয়েছে। এ ইতিহাসের চারটি অধ্যায়ে [অর্থাৎ দ্বিতীয় পুস্তক (Expdus), তৃতীয় পুস্তক (Leviticus), চতুর্থ পুস্তক (Number) এবং পঞ্চম পুস্তক (Deuteronomy)] হযরত মূসা (আ)-এর জীবন চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাওরাতের সে সকল বাণী হযরত ওযায়ের এবং তাঁর সহযোগী প্রবীণদের হস্তগত হয় সেগুলোও অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাসের ক্রমানুসারে এ জীবন চরিতের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়। এখন মূসা (আ)-এর জীবন চরিতের মধ্যে তাওরাতের যে অংশগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে তারই সমষ্টির নাম তাওরাত। সেগুলো চিনবার নিদর্শন এই যে ইতিহাস বর্ণনাকালে যেখানে জীবন চরিত্র লেখক বলেছেন, খোদা মূসা (আ)-কে একথা বলেন" অথবা "মূসা (আ) বলেন, তোমাদের "খোদা একথা বলেন,"—সেখান থেকে তাওরাতের একটা অংশ শুরু হচ্ছে। যেখানে আবার জীবন চরিতের প্রসংগ শুরু হচ্ছে, সেখানে তাওরাতের অংশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, মাঝখানে যেখানে

* অর্থাৎ বর্তমান তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর আনীত ইসলামের নয়, বরঞ্চ ঐ দীন ইসলামের বিকৃত রূপ 'ইহুদীবাদের' বহিঃপ্রকাশ।–সংকলকদ্বয়

বাইবেল প্রণেতা ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হিসেবে যা কিছু সংযোজন করেছেন, তা সাধারণ মানুষের নির্ণয় করা বড়ো কঠিন যে, তা কি আসল তাওরাতের কোনো অংশ বিশেষ, না তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য।*৪৪৬

* এ বিকৃত তাওরাতই ইহুদীবাদের উৎস। কিন্তু শিক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইহুদীরা তাওরাতকে তার যেরূপ ও আকৃতিতেই মানতো, সেরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার তারা কোনো দিনই চেষ্টা করেনি। আর না তারা নিষ্ঠার সাথে তার নির্দেশাবলীর প্রচার করেছে এবং না সেগুলো কার্যকর করেছে। এজন্যেই কুরআন প্রশ্ন তুলেছিল–

لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ-

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের সময় ইহুদীদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই

আরবের ইহুদীদের কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান নেই। তারা কোনো পুস্তকে অথবা কোনো শিলালিপিতে তাদের এমন কোনো বিবরণ লিখে যায়নি, যার থেকে তাদের অতীতের উপর আলোকপাত করা যায়। আরবের বাইরের কোনো ইহুদী ঐতিহাসিক এবং গ্রন্থকারও তাদের কোনো উল্লেখ করেনি। যে জন্যে বলা হয় যে, তারা আরব ভূমিতে আগমন করে তাদের জাতির লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যার ফলে দুনিয়ার ইহুদীগণ তাদেরকে কিছুতেই নিজেদের মধ্যে গণ্য করতো না। কারণ তারা ইবরানী ভাষা, সভ্যতা এবং নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবত্ব অবলম্বন করেছিল। হেজাজের ধ্বংসাবশেষে যেসব শিলালিপি পাওয়া যায়, তাতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বেকার ইহুদীদের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না বরং পাওয়া যায় কিছু ইহুদী নাম মাত্র। এজন্যে আরববাসীদের মধ্যে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল আরবের ইহুদীদের ইতিহাসের অধিকাংশ তার উপরেই নির্ভরশীল এবং তার একটা অংশ ইহুদীদের দ্বারা প্রচারিত।

হেজাজের ইহুদীদের দাবী ছিল যে, সর্বপ্রথম তারা হযরত মূসা (আ)-এর শেষ যুগে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের ঘটনা তারা এভাবে বর্ণনা করে যে, হযরত মূসা (আ) ইয়াস্‌রিব থেকে আমালিকাদের বহিষ্কার করার জন্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের প্রতি এ নির্দেশও ছিল যে, তারা যেন সে জাতির একটি লোককেও জীবিত না রাখে। বনী ইসরাঈলের ঐ সৈন্যদল এখানে এসে নবীর আদেশ কার্যকর করে। কিন্তু আমালিকার বাদশাহের এক যুবক পুত্র বড়ো সুদর্শন ছিল। তাকে তারা জীবিত রাখে এবং তাকে নিয়ে ফিলিস্তিন প্রত্যাবর্তন করে। সে সময়ে হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল হয়েছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এর কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, একজন আমালিকাকে জীবিত রাখা নবীর ফরমান ও শরীয়তের নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে তাঁরা সে সৈন্যেদেরকে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং তাদেরকে ইয়াস্‌রিব ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়।–কিতাবুল আগানী খণ্ড ১৯, পৃঃ ৯৪।

এভাবে ইহুদীদের দাবী ছিল এই যে, তারা হযরত ঈসা (আ)-এর বারো শত বছর পূর্বে এখানে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত ইহু-দীরা এ কাহিনী এজন্যে রচনা করে যে, এর দ্বারা তারা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত বলে আরববাসীদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করবে।

ইহুদীদের নিজেদের বিবরণ অনুযায়ী তাদের দ্বিতীয় হিজরত সংঘটিত হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে, যখন বেবিলনের বাদশাহ বখ্‌ত্ নসর বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো যে, সে সময়ে তাদের বিভিন্ন গোত্র আরবভূমিতে আগমন করে ওয়াদিউল্ কুরা, তাইমা এবং

ইয়াসরিবে বসতিস্থাপন করে–(ফতুহুল বুলদান-বালাযুরী)। কিন্তু এরও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এর দ্বারাও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চাইতো।

প্রকৃতপক্ষে প্রমাণিত সত্য এই যে, ৭৭ খৃস্টাব্দে রোমীয়গণ যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে এবং তারপর ১০২ খৃস্টাব্দে তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে, তখন সে সময়ে বহু ইহুদী গোত্র পালিয়ে হেজাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ এ ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণে সংলগ্ন অঞ্চল, এখানে আসার পর যেখানে যেখানে তারা ঝর্ণা ও সুজলা-সুফলা ভূমিখণ্ড দেখতে পায় সেখানেই রয়ে যায়। তারপর ক্রমশ তারা ষড়যন্ত্র ও সুদের ব্যবসা দ্বারা সে অঞ্চলের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে। আইলা, মাক্‌না, তাবুক, তাইমা, ওয়াদিউল্ কুরা, ফাদাক এবং খয়বরের উপর সে সময়েই তারা তাদের আধিপত্য কায়েম করে। বনী কুরায়যা, বনী নযীর, বনী বাহ্‌দাল এবং বনী কাইনুকা প্রভৃতি গোত্রগুলোও সে সময়ে ইয়াসরিব অধিকার করে বসে।

ইয়াসরিবে বসতিস্থাপনকারীদর মধ্যে বনী নযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রগুলো ছিল অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন। কারণ তারা পাদ্রীপুরোহিত শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদেরকে সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য করা হতো। অপন মিল্লাতের মধ্যে তারা ধর্মীয় রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল, তারা যখন মদীনায় বসতি স্থাপন করে তখন সেখানে কতিপয় আরব গোত্র বাস করতো। তাদেরকে পরাভূত করে তারা সুজলা-সুফলা ভূমির মালিক হয়ে বসে। তার প্রায় তিন শতাব্দীকাল পরে, ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃস্টাব্দে ইয়ামেনে এক মহাপ্লাবন হয় যার উল্লেখ সূরা 'সাবার' দ্বিতীয় রুকূ'তে করা হয়েছে। এ প্লাবনের কারণে সাবা জাতির বিভিন্ন গোত্র ইয়ামেন থেকে বেরিয়ে আরবের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে গাস্‌সানী সিরিয়ায়, লাখ্‌মী হীরাতে (ইরাক), বনী খুযায়া জেদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে এবং আওস্ ও খায্‌রাজ ইয়াসরিব গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইয়াসরিবের উপরে যেহেতু ইহুদীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেজন্যে তারা প্রথম প্রথম আওস্ ও খায্‌রাজকে পায়ে দাঁড়াবার কোনো সুযোগই দেয়নি। এ দুটি আরব গোত্র বাধ্য হয়ে অনুর্বর ভূমিখণ্ডের উপরেই বসবাস করতে থাকে। ফলে তারা কোনোপ্রকারে জীবন ধারণ করতো। অবশেষে তাদের জনৈক প্রধান সাহায্যের জন্যে সিরিয়ায় তাদের গাস্‌সানী ভাইদের নিকট গমন করে। সেখান থেকে একদল সৈন্য এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে। ফলে ইয়াসরিবের উপর আওস্ ও খাযরাজের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদীদের দুটি বড়ো গোত্র বনী নযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু ঐ দুটি গোত্রের সাথে মনোমালিন্য ছিল, সেজন্যে তারা শহরেই রয়ে গেল। কিন্তু এখানে থাকার জন্যে তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের আশ্রয় নিতে হয়। তার মুকাবিলায় বনী নযীর ও বনী কুরায়যা আওস্ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, যাতে করে ইয়াসরিবের শহরতলীতে নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

নবী (সা)-এর অবির্ভাবের সময়ে ইহুদীদের অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরতের সূচনা পর্যন্ত সাধারণত হেজাজে এবং বিশেষ করে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

লেবাস-পোশাক, ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি সকল দিক দিয়েই তারা আরববাসীর রঙে রঞ্জিত ছিল। এমন কি তাদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের নামও আরবী হয়ে পড়েছিল। যে

বারোটি ইহুদী গোত্র হেজাজে বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যাউরা ছাড়া কোনো গোত্রের নাম ইবরানী ছিল না। তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আলেম ছাড়া আর কেউ ইবরানী ভাষা পর্যন্ত জানতো না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যকলা আমাদের চোখে পড়ে তার ভাষা, ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আরব কবিদের থেকে পৃথক এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না যা তাদের পার্থক্য নির্ণয় করে। তাদের এবং আরববাসীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আরববাসীর মধ্যে একমাত্র দীন ছাড়া আর কোনো পার্থক্য ছিল না, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা আরববাসীর সাথে একাকার হয়ে যায়নি এবং তারা কঠোরভাবে ইহুদী গোঁড়ামি বজায় রাখে। প্রকাশ্যে আরবত্ব তারা এজন্যে অবলম্বন করে যে, এছাড়া তারা আরবে বসবাস করতে পারতো না।
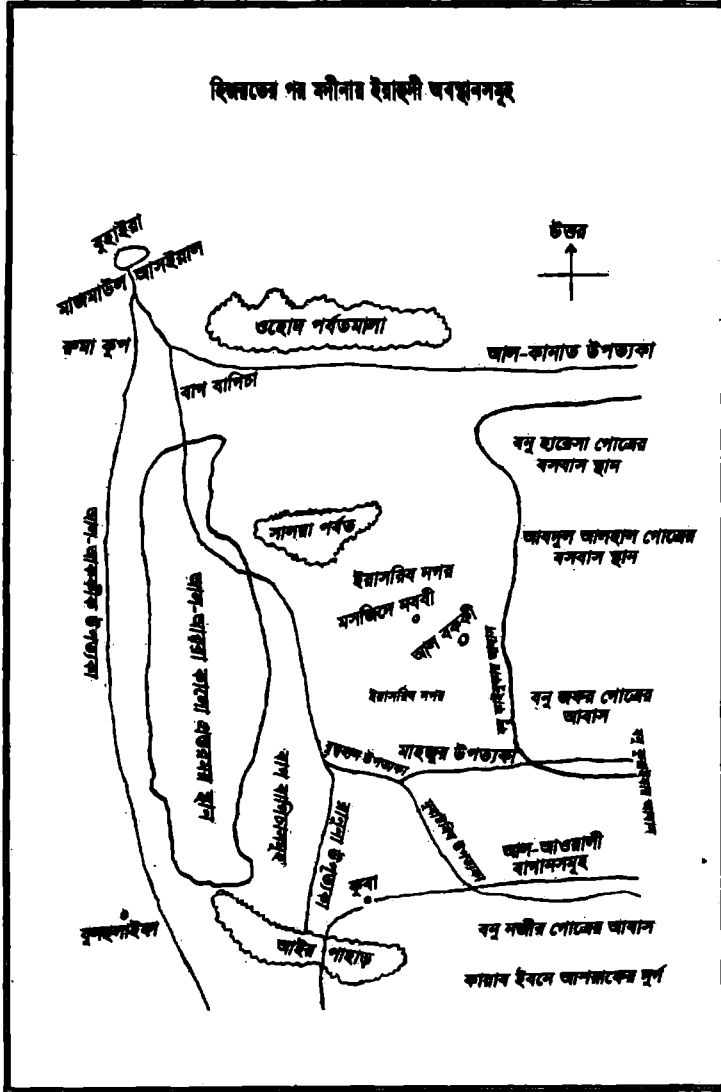
তাদের এ আরবত্ব অবলম্বনের কারণে প্রাচ্যবিদগণ এ বিভ্রান্তিতে পড়েছেন যে, সম্ভবত এরা বনী ইসরাঈল ছিল না, বরঞ্চ তারা ছিল ইহুদী ধর্মাবলম্বী আরববাসী, অথবা নিদেনপক্ষে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আরব ইহুদী। কিন্তু এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে, ইহুদীরা হেজাজে কখনো তাদের ধর্মীয় প্রচারকার্য চালিয়েছে, অথবা খৃষ্টান পাদ্রী ও মিশনারীদের মতো তাদের আলেম-পণ্ডিতেরা আরববাসীকে ইহুদী ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলী হওয়ার ভয়ানক গোঁড়ামি ও বংশীয় গর্ব-অহংকার পাওয়া যেতো। আরববাসীকে তারা উম্মী বলতো। উম্মী অর্থ নিরক্ষর নয়, বরঞ্চ বন্য ও বর্বর। তাদের আকীদাহ এই ছিল যে, ইসরাঈলীরা যেসব মানবীয় অধিকার লাভের যোগ্য, এসব উম্মী তার যোগ্য নয়। তাদের ধন-সম্পদ বৈধ-অবৈধ উপায়ে লুটে-পুটে খাওয়া ইরাঈলীদের জন্যে হালাল ও পবিত্র। আরব প্রধানগণ ছাড়া সাধারণ আরববাসীকে তারা এমন যোগ্যই মনে করতো না যে, তাদেরকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে তাদেরকে সমান মর্যাদা দেয়া হবে। ঐতিহাসিক এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, আর না আরব ঐতিহ্যে এমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, কোনো আরব গোত্র অথবা কোনো বড়ো পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছু লোকের ইহুদী হওয়ার উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায়। তাছাড়া দ্বীন প্রচারের পরিবর্তে ইহুদীদের শুধু ব্যবসার প্রতিই আকর্ষণ ছিল। এজন্যে হেজাজে ইহুদীবাদ একটি ধর্ম হিসেবে প্রসার লাভ করেনি। বরঞ্চ কতিপয় ইসরাঈলী গোত্রের গর্ব-অহংকারই শুধু পুঁজি হয়েছিল। অবশ্যি ইহুদী আলেম-পীরেরা তাবিজ-তুমার, ফাল ও জাদুগিরি প্রভৃতির ব্যবসা খুব জমজমাট করে রেখেছিল যার জন্যে আরববাসীর উপর তাদের 'এল্‌ম' ও 'আমলের' প্রভাব পড়েছিল।[৪৪৭]

তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আরব গোত্রগুলোর তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব মজবুত ছিল। যেহেতু তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিকতর সভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল, এজন্যে তারা এমন বহু কলা-কৌশল জানতো যা আরববাসীর জানা ছিল না। বহির্জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল, এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হেজাজের উত্তরাঞ্চলে যেসব খাদ্যশস্যের আমদানী হতো এবং এখান থেকে যে খেজুর রপ্তানী হতো, তা ছিল এদেরই হাতে। মুরগী চাষ ও মৎস্য চাষের অধিকাংশই ছিল তাদের আয়ত্তে। বস্ত্র নির্মাণ তারা করতো। স্থানে স্থানে তারা মদের দোকান দিয়ে রাখতো এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করে সেখান থেকে বিক্রি করা হতো। বনী কায়নুকা বেশীর ভাগ স্বর্ণকার, কর্মকার এবং পাত্র নির্মাতার কাজ করতো। এসব ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহুদীরা অত্যধিক মুনাফাখুরী করতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা ছিল সুদের। এ সুদের জালে তারা চারপাশের আরব অধিবাসীদের আবদ্ধ করে রেখেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রগুলোর শায়খ ও সর্দারগণ ঋণ করে করে তাদের জাঁকজমক ও ক্ষমতার দাপট দেখাবার রোগে আক্রান্ত ছিল। তারা ইহুদীদের ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। এরা সুদের চড়া হারে কর্জ দিত এবং তারপর ঋণগ্রহিতা সুদের চক্রবৃদ্ধিতে এমনভাবে ফেঁসে যেতো যে, তার থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন হতো। এভাবে তারা আরববাসীদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবারে শূন্যগর্ভ করে রেখেছিল। তার স্বাভাবিক পরিণাম এই ছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ আরববাসীদের মধ্যে চরম ঘৃণা বিরাজ করতো।

তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দাবী এই ছিল যে, তারা আরববাসীদের কারো বন্ধু সেজে অন্য কারো শত্রু না হয়ে পড়ে এবং না তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অপরদিকে তাদের স্বার্থ এটাও দাবী করতো যে, আরবদেরকে যেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে দেয়া না হয়। বরঞ্চ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত রাখা হয়। কারণ তারা জানতো যে, আরব গোত্রগুলো যদি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে, সুদী কারবার করে তারা যে বিরাট বিরাট ভূসম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও শস্য-শ্যামল জমি-জমার মালিক হয়ে বসেছে, তা আর তারা থাকতে দেবে না। উপরন্তু আপন নিরাপত্তার জন্যে তাদের প্রত্যেক গোত্রকে কোনো না কোনো শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হতো যাতে করে অন্য কোনো শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত দিতে না পারে। এর ভিত্তিতে আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক লড়াইয়ে তাদেরকে শুধু অংশগ্রহণই করতে হতো না, বরঞ্চ অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্র তার বন্ধু আরব গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে অন্য কোনো ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতো যাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতো তাদের বিপক্ষ দলের সাথে। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নযীর আওস্ গোত্রের বন্ধু ছিল এবং বনী কায়নুকা বন্ধু ছিল খাযরাজ গোত্রের। হিজ্‌রতের কিছুকাল পূর্বে বুয়াস্ নামক স্থানে আওস্ এবং খাযরাজের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, তাতে তারা আপন আপন বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে।[৪৪৮]

ধার্মিকতার প্রদর্শনীমূলক খোলস

ইহুদীরা তাওহীদ, রিসালাত, অহী, আখেরাত এবং ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস রাখতো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী হযরত মূসা (সা)-এর উপর যেসব শরীয়াতের বিধি ব্যবস্থা নাযিল হয়েছিল তাও তারা স্বীকার করতো। নীতিগতভাবে তাদের দ্বীনও সেই ইসলাম ছিল যার শিক্ষা নবী মুহাম্মাদ (সা) দিচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর অধপতন তাদেরকে আসল দীন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেছিল।* তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী উপকরণ সংমিশ্রিত হয়েছিল যার কোনো সনদ তাওরাতে ছিল না। তাদের ব্যবহারিক জীবনে এমন বহু কিছু রীতি পদ্ধতির প্রচলন হয়ে পড়েছিল যা আসল দীনের মধ্যে ছিল না। তাওরাতে তার কোনো প্রমাণও ছিল না। মানুষের কথার সাথে স্বয়ং তাওরাতকে তারা একত্রে মিলিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহর বাণী, শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে যতোটুকু সংরক্ষিত ছিল, তাকে তারা নিজেদের কাল্পনিক ব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করেছিল, দীনের সত্যিকার প্রাণশক্তি তার মধ্যে ছিল না, বাহ্যিক ধার্মিকতার একটা প্রাণহীন খোলস রয়ে গিয়েছিল। তাকেই তারা বুকে আঁকড়ে ধরেছিল। তাদের আলেম-পণ্ডিত, পীর মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, জনসাধারণ, সকলেরই আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও বাস্তব জীবনের অবস্থার অধপতন ঘটেছিল। এ অধপতনই তাদের নিকটে এতো প্রিয় ছিল যে, কোনো প্রকার সংস্কার সংশোধন মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ অবস্থাই চলছিল এবং যখন কোনো আল্লাহর বান্দাহ তাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাতে আসেন, তখন তাঁকে তারা সবচেয়ে বড়ো দুশমন মনে করতো এবং তারা সর্বাত্মক

---

* তখন মূসা (আ)-এর অতীত হওয়ার পর প্রায় উনিশ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাস মুতাবেক হযরত মূসা (আ)-এর খৃষ্ট পূর্ব ১২৭২ সালে ইন্তেকাল করেন এবং নবী মুহাম্মাদ (সা) ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হন– গ্রন্থকার।

চেষ্টা করতো যাতে করে তিনি তাঁর সংস্কার কার্যে কৃতকার্য না হতে পারেন। এরা ছিল আসলে পথভ্রষ্ট মুসলমান। বেদআত, সত্যকে বিকৃতকরণ, চুলচেরা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, দলাদলি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কালক্ষেপণ (মগজ ফেলে দিয়ে হাড় চিবানো), আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার লোভ-লালসায় মগ্ন হওয়া প্রভৃতি কারণে তাদের অধপতন এমন চরম সীমায় পৌছে যে, তারা তাদের আসল নাম 'মুসলমান' পর্যন্ত ভুলে যায় এবং নিজেদেরকে মুসলমান না বলে নিছক 'ইহুদী' হয়েই রয়ে গেল। আল্লাহর দ্বীনকে তারা ইসরাঈলী বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বানিয়ে রেখে দিল।[৪৪৯]

ধর্মীয় এবং বংশীয় গোঁড়ামি

ইহুদীদের ধারণা এই ছিল যে, আমানতদারি, দেয়ানতদারি, সততা ও বিশ্বস্ততা শুধু ইহুদীদের পারস্পরিক ব্যাপারে হওয়া উচিত। যারা ইহুদী নয় তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাতে কোনোদোষ নেই। এ শুধু ইহুদী জনসাধারণের অজ্ঞতামূলক ধারণাই ছিল না, প্রকৃতপক্ষে ইহুদীবাদের গোটা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, তা নৈতিক বিষয়াদিতে প্রতি পদে পদে ইসরাঈল ও অ-ইসরাঈলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে একই জিনিস যা ইসরাঈলীদের বেলায় অবৈধ, তা অন্যের বেলায় বৈধ। একই জিনিস যা ইসরাঈলীদের হক, অ-ইসরাঈলীদের তা হক নয়। যেমন বাইবেলের নির্দেশ, "তুমি বিজাতীয়ের কাছে আদায় করিতে পার ; কিন্তু তোমার ভ্রাতার নিকট তোমার যাহা আছে, তাহা তোমার হস্ত ক্ষমা করিবে।"–দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ ঃ ৩

একস্থানে সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু "সুদের জন্য বিদেশীকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু সুদের জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না ;"দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ ঃ ২০)। আর একস্থানে লেখা আছে, "কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের–ইস্রায়েল সন্তানদের–মধ্যে কোন প্রাণীকে চুরি করে, এবং তাহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, বা বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে ;" দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ ঃ ৭)। তালমুদে আছে, যদি ইসরাঈলীদের কোনো বলদ অ-ইসরাঈলীর কোনো বলদকে আহত করে, তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু কোনো অ-ইসরাঈলীর বলদ কোনো ইসরাঈলীর বলদকে আহত করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি কেউ কোথাও কিছু পড়ে থাকতে দেখে, তাহলে দেখতে হবে পার্শ্ববর্তী বস্তি কোন্ সব লোকের। যদি ইসরাঈলীদের হয় তাহলে তার ঘোষণা দিতে হবে। যদি অ-ইসাঈলীদের হয় তাহলে সে জিনিস গ্রহণ করা উচিত। রিব্বী ইসমাঈল বলেন, যদি উম্মী এবং ইরাঈলীর কোনো মামলা কাজীর নিকটে আসে, তাহলে কাজী যদি ইসরাঈলী আইন অনুযায়ী তার ধর্মীয় ভাইকে জয়ী করতে পারে, তাহলে তাকে জয়ী করে দিয়ে বলবে যে, এ তাদের আইন অনুযায়ী করা হয়েছে। আর যদি উম্মীদের আইন অনুযায়ী মামলায় তাকে জয়ী করতে পারে, তাহলে জয়ী করে বলবে, "এ তোমাদের আইন মুতাবেক করা হয়েছে।" কিন্তু কোনো আইনেই যদি তাকে জয়ী করা না যায়, তাহলে যে কোনো কৌশল অবলম্বন করে তাকে মামলায় জয়ী করে দেবে। রিব্বী শামওয়ায়েল বলেন, অ-ইসরাঈলীর প্রত্যেক ভুলের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।[৪৫০]

মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় আঁকড়ে ধরা

ইহুদী পণ্ডিতগণ শরীআতের ছোট-খাটো বিষয়গুলো বড়ো যত্নের সাথে পালন করতো। বরঞ্চ খুঁটিনাটি বিষয়ের পুংখানুপুংখ আলোচনায় সকল সময় অতিবাহিত করতো। তাদের শাস্ত্রবিদগণ বহু চিন্তা-ভাবনা করে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু শির্‌ক্ তাদের নিকটে এমন তুচ্ছ বিষয় ছিল যে, তার থেকে না নিজেরা বাঁচবার কোনো চিন্তা করতো, আর না জাতিকে মুশরিকী চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করতো। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেও তাদের বিবেকে বাধতো না।[৪৫১]

সম্ভ্রান্ত লোকের জন্যে শরীয়াত বিকৃতকরণ

ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন থেকে যেভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেই মামলায়, যা ফায়সালার জন্যে খায়বরের ইহুদীরা নবী (সা)-এর দরবারে পেশ করেছিল। মামলার বিবরণ এই ছিল যে, খায়বরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় জনৈক নারী একজন পুরুষের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কস্থাপন করেছিল। তাওরাত অনুযায়ী তাদের শাস্তি ছিল রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা–(দ্বিতীয় বিবরণ ২২ ঃ ২৩-২৪)। কিন্তু ইহুদীরা এ শাস্তি কার্যকর করতে চাচ্ছিল না। অতএব তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করে যে, এ মামলায় নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে মধ্যস্থ মানা হোক। তিনি যদি রজম ছাড়া অন্য কোনো রায় দেন তাহলে তা মানা হবে। আর যদি রজমেরই রায় দেন তাহলে তা মানা হবে না। অতপর মামলাটি নবীর সামনে পেশ করা হলো। তিনি রজম করার নির্দেশ দেন, তারা তা মানতে অস্বীকার করে। নবী (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্মে এর কি শাস্তি রয়েছে ? তারা বলে, বেত মারা এবং মুখে চুনকালি দিয়ে গাধার পিটে চড়িয়ে দেয়া। নবী (সা) তাদের আলেমদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তাওরাতে কি বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যভিচারিনীর এ শাস্তি রয়েছে ? তারা পুনরায় মিথ্যা জবাবই দেয়। কিন্তু ইবনে সুরিয়া নামক এক ব্যক্তি স্বয়ং ইহুদীদের বর্ণনামতেই তাওরাতের তৎকালীন বড়ো আলেম ছিল এবং সে চুপ করেছিল। তাকে সম্বোধন করে নবী (সা) বলেন, যে আল্লাহ তোমাদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত করেছেন এবং যিনি তূর পর্বতে তোমাদেরকে শরীয়াত দান করেছেন তাঁর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, সত্যিকারভাবে তাওরাতে ব্যভিচারের কি শাস্তি লেখা আছে ? সে বলে, আপনি যদি এমন কসম না দিতেন তাহলে আমি বলতাম না। ব্যাপার এই যে, ব্যভিচারের শাস্তি রজমই বটে। কিন্তু আমাদের সমাজে যখন ব্যভিচার বেড়ে গেল, তখন আমাদের শাসকরা এ রীতি অবলম্বন করে যে, সম্ভ্রান্ত লোক ব্যভিচার করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। নিম্ন শ্রেণীর লোক ব্যভিচার করলে তাকে রজম করা হতো। তারপর জনগণের মধ্যে যখন অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে, তখন আইন পরিবর্তন করে এমন করা হয় যে, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীকে বেত্রাঘাতের পর মুখে চুনকালি দিয়ে উল্টো মুখে গাধার পিঠে সওয়ার করে দিতে হবে।[৪৫২]

শরীয়াতের হালাল-হারামে রদবদল

আল্লাহ তাআলার নাযিল করা শরীয়াতের বিরুদ্ধে যখন ইহুদীরা বিদ্রোহ করলো এবং তারা নিজেরাই শরীয়াত প্রণেতা হয়ে বসলো, তখন তারা অনেক পাক ও হালাল জিনিসের

চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ফেললো। এসবের মধ্যে এক হচ্ছে ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী, অর্থাৎ উটপাখী, রাজহাঁস, হাঁস প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ গরু-ছাগলের চর্বি। বাইবেলে এ দুধরনের হারামের হুকুম তাওরাতে সন্নিবেশিত করা হয়। অথচ এ জিনিসগুলো তাওরাতে হারাম ছিল না, বরঞ্চ হযরত মূসা (আ)-এর পরে হারাম করা হয়েছে। ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, বর্তমানের ইহুদী শরীয়াত দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষদিকে রিব্বী ইয়াহুদীর দ্বারা প্রণীত হয়।[৪৫৩]

নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে ইহুদীদের অযৌক্তিক আচরণ

কুরআন বলে–

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ - وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ - البقرة : ٨٩

"এবং এখন যে একখানি কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এলো, তখন তার প্রতি তাদের কান্ ধরনের আচরণ দেখতে পাওয়া যায় ? অথচ এ কিতাব তাদের নিকটে পূর্বে থেকে যা বিদ্যমান আছে তারই সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং এ কিতাবের আগমনের পূর্বে তারা কাফেরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করতো। এতদ্‌সত্ত্বেও সে জিনিস যখন তাদের সামনে এসে গেল এবং তাকে তারা চিনতেও পারলো, তথাপি তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করলো।"-সূরা আল বাকারা ঃ ৮৯

নবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা অধীর হয়ে ঐ নবীর প্রতিক্ষা করছিল, যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের নবীগণ করেছিলেন। তারা এ দোয়া করছিল যে, তিনি সত্বর এসে পড়লে কাফেরদের আধিপত্য শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের উন্নতির যুগ শুরু হবে। স্বয়ং মদীনাবাসী এ কথার সাক্ষী যে, নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর আশায় দিন গুণতো এবং তারা কথায় কথায় বলতো, আচ্ছা, ঠিক আছে, যাদের উপর খুশী যুলুম করে যাও। তারপর যখন সে নবী আসবেন তখন যালেমদের দেখে নেব। মদীনাবাসী এসব কথা শুনতো। এজন্যে যখন তারা নবী (সা)-এর হাল-হকীকত জানতে পারলো, তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, দেখ, এ ইহুদীরা তোমাদের উপর যেন টেক্কা মেরে না যায়। চল, আগেভাগেই তাঁর উপর আমরা ঈমান এনে ফেলি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐসব ইহুদী, যারা অগমনকারী নবীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতো, তাঁর আগমনের পর তাঁর সবচেয়ে বিরোধী হয়ে পড়ে।

"এবং তাকে তারা চিনতেও পারলো"–কুরআনের এ কথাটিও বিভিন্ন প্রমাণাদি সে সময়েই পাওয়া গেছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত সুফিয়া (রা)-এর। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইহুদী আলেমের কন্যা এবং অন্য এক আলেমের ভাতিজি। তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন আমার পিতা এবং চাচা উভয়েই তাঁর সাথে দেখা করতে যান, তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সাথে আলাপ করেন। তাঁদের বাড়ী ফিরে আসার পর আমি আপন কানে তাঁদেরকে এরূপ কথাবার্তা বলতে শুনি ঃ

চাচা ঃ সত্যিই কি ইনি সেই নবী যাঁর সুসংবাদ আমাদের কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছে ?

পিতা ঃ আল্লাহর কসম, তাই।

চাচা ঃ তোমার তাতে বিশ্বাস হয় ?

পিতা ঃ হাঁ, হয়।

চাচা ঃ তাহলে, এখন কি করতে চাও ?

পিতা ঃ যতোদিন জীবন আছে, তার বিরোধিতা করতে থাকবো এবং তাকে কোনো কথা বলতে দিব না।

–(ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫, নতুন সংস্করণ)[৪৫৪]

ইহুদীদের শত্রুতামূলক ফেত্না সৃষ্টি

আরববাসী সাধারণত নিরক্ষর ছিল। তাদের তুলনায় এমনিতেই ইহুদীদের ভেতরে শিক্ষার চর্চা বেশী ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাদের মধ্যে এমন বড়ো বড়ো পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল যাদের খ্যাতি আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্যে আরবের মধ্যে ইহুদীদের শিক্ষাগত প্রভাব খুব বেশী ছিল। তারপর তাদের আলেম ও পীর পুরোহিতগণ তাদের ধর্মীয় দরবারের বাহ্যিক জাঁকজমক এবং ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-তুমারের ব্যবসা দ্বারা তাদের সে প্রভাব দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর করে। বিশেষ করে মদীনাবাসী তাদের দ্বারা বেশী প্রভাবিত ছিল। কারণ, তাদের আশেপাশে বড়ো বড়ো ইহুদী গোত্রের বাস ছিল। রাতদিন তাদের সাথে মেলামেশা ছিল। এ মেলামেশার দ্বারা তারা ঠিক তেমনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, যেমন নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অধিকতর শিক্ষিত, অধিকতর সভ্য ও বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় যখন নবী (সা) নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই নিরক্ষর লোকেরা আহলে কিতাব ইহুদীদের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে, আপনারা একজন নবীর অনুসারী এবং একটি কিতাব মেনে চলেন, আপনারা বলুন—এই যে আমাদের মধ্যে একজন নবীর দাবী করছেন, তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ? নবী (সা) যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখনও বহু লোক এভাবে ইহুদী আলেমদের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে। কিন্তু ঐসব ইহুদী আলেম তাদেরকে কখনও সত্য কথা বলেনি। তাদের একথা বলা তো মুশকিল ছিল যে, তিনি যে তাওহীদ পেশ করছেন, তা ঠিক নয়। অথবা আম্বিয়া, আসমানী কিতাব, ফেরেশ্তা ও আখেরাত সম্পর্কে তিনি যাকিছু বলছেন তার মধ্যে কিছু ভুল আছে। অথবা যেসব নৈতিক মূলনীতি তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, তার মধ্যে কানোটা ভুল। কিন্তু তারা পরিষ্কারভাবে এ সত্যও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না যে, তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা সত্য। তারা না সত্যকে খোলাখুলি অস্বীকার করতে পারতো আর না সহজভাবে সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। এ দুটি পথের মধ্যে তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করলো যে, প্রত্যেক প্রশ্নকারীর মনে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে, তাঁর দলের বিরুদ্ধে এবং তাঁর মহান কাজের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো কুমন্ত্রণা দিয়ে দিতো, তাঁর উপরে কোনো অভিযোগ আরোপ করতো, এমন এক অমূলক অপবাদ ছড়াতো যাতে করে মানুষের মনে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

সৃষ্টি হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের বিব্রতকর প্রশ্নের অবতারণা করতো, যাতে করে লোকেরাও বিব্রত বোধ করে এবং নবী ও তাঁর সংগী-সাথীদেরকেও বিব্রত করার চেষ্টা করে। এ ছিল তাদের আচরণ যার জন্যে সূরা আল বাকারায় তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হলো, হককে বাতিলের পর্দা দিয়ে আবৃত করো না, মিথ্যা প্রচারণা এবং দুষ্টামিসুলভ সন্দেহ সৃষ্টি ও অভিযোগ আরোপ করে সত্যকে দমিত ও গোপন করার চেষ্টা করো না এবং হক ও বাতিলকে একত্রে মিশিয়ে দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করো না।

–সূরা আল বাকারা ঃ ৪২*

* ইহুদীদের অনিষ্টকারিতার পরিধি বড়ো ব্যাপক। তাদের কুমন্ত্রণার জালে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী জামায়াতের মধ্যে মুনাফিক সৃষ্টি হয়েছে। তারা নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যাপারে কোনো না কোনো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, তাঁকে হত্যা করার বার বার চেষ্টা করেছে এবং তাদের চরম ধৃষ্টতা এই যে, যুদ্ধের সিদ্ধান্তকর মুহূর্তে তারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এসব ধৃষ্টতার উল্লেখ যথা স্থানে করা হবে।–গ্রন্থকার

নাসারা ও খৃস্টবাদ

খৃস্টবাদের আবির্ভাব ও বিকাশ

নাসারা শব্দের ব্যাখ্যা

কিছু লোকের এ ধারণা ভুল যে, "নাসারা" শব্দটি "নাসেরা" থেকে গৃহীত যা ছিল মসীহ (আ)-এর জন্মভূমি। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি 'নুসরত' থেকে গৃহীত। এর ভিত্তি হচ্ছে সে বক্তব্য যা মসীহ (আ)-এর مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰه (আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী-কে) এ প্রশ্নের জবাবে হাওয়ারীগণ বলেছিল- نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰه। (আমরা আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী)। খৃস্টান গ্রন্থকারদের সাধারণত শব্দ দুটির বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখেই এ ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে যে, খৃস্টানদের প্রাথমিক ইতিহাসে নাসেরিয়া (Nazarenes) নামে যে দলটি পাওয়া যেতো এবং যাদেরকে ঘৃণাভরে 'নাসেরী' ও 'ইবুনী' বলা হতো, তাদের নামকেই কুরআন সকল খৃস্টানদের জন্যে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যে, তারা স্বয়ং বলেছিল, "আমরা নাসারা"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫২) এবং একথা ঠিক যে, খৃস্টানরা কখনো নিজেদের নাম নাসেরী রাখেনি।৪৫৬

এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদের নাম কখনো 'ঈসায়ী' বা 'মসীহী' রাখেননি। কারণ তিনি তাঁর নিজের নামে কোনো নতুন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করতে আসেননি। হযরত মূসা (আ) এবং আগের ও পরের নবীগণ যে দীন নিয়ে এসেছিলেন, তাকে উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য। এজন্যে তিনি সাধারণ বনী ইসরাঈল এবং শরীয়াতে মূসার অনুসারীদের থেকে আলাদা কোনো জামায়াত গঠন করেননি, আর না তাঁর কোনো স্থায়ী নাম তিনি রেখেছেন। তাঁর প্রাথমিক অনুসারীগণ তাঁদের নিজেদেরকে ইসরাঈলী মিল্লাত থেকে পৃথক মনে করতেন না, তাঁরা কোনো স্থায়ী দল হয়েও পড়েননি, আর না তাঁরা নিজেদের জন্যে কোনো পার্থক্যসূচক নাম ও নিদর্শন নির্ণয় করেছেন। তাঁরা সাধারণ ইহুদীদের সাথে বায়তুল মাকদিসেরই হায়কালে ইবাদাত করতে যেতেন এবং নিজেদেরকে মূসার শরীয়াতের অনুগত মনে করতেন।-প্রেরিতদের কার্য ৩ ঃ ১ ; ১০ ঃ ১৪ ; ১৫ ঃ ১০৫ ; ২১ ঃ ২১ দ্রষ্টব্য।

ইসরাঈলী জনগণ থেকে ঈসায়ীদের বিচ্ছিন্ন হওয়া

পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নতার কাজ দুদিক দিয়ে শুরু হয়। একদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের মধ্যে সেন্টপল্ শরীয়াতের বাধ্যবাধকতা রহিত করে ঘোষণা করে যে, শুধু মসীহের উপর ঈমান আনাই মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। অপরদিকে ইহুদী পণ্ডিতগণ মসীহের অনুসারীদেরকে একটা পথভ্রষ্ট দল গণ্য করে তাদেরকে ইসরাঈলী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রথমে এ নতুন দলটির কোনো বিশেষ নাম দেয়া হয়নি। স্বয়ং মসীহের অনুসারীগণ নিজেদের জন্যে কখনো শিষ্য (শাগরেদ) শব্দ ব্যবহার করে, কখনো আপন সংগী-সাথীদের জন্যে 'ভাই' এবং 'ঈমানদার' শব্দ ব্যবহার করে। আবার কখনো 'মুকাদ্দাস' (পূত পবিত্র) নামেও তাদেরকে ডাকা হয়-(প্রেরিতদের কার্য ২ ঃ ৪৪, ৪ ঃ ৩২, ৯ ঃ ২৬, ১১ ঃ ২৯, ১৩ ঃ ৫২, ১৫ ঃ ১-২৩, রোমীয় ১৫ ঃ ২৫, কলমীয় ১ ঃ ২) পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাদেরকে কখনো 'গালিসী' বলতো এবং কখনো নাসেরীয়দের বেদ্আতী ফের্কা বলতো-(প্রেরিতদের কার্য্য ২৪ ঃ ৫, লূক ১৩ ঃ ২)। বিদ্রূপ

করে তাদেরকে এ নামে ডাকা হতো, কারণ হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মভূমি ছিল নাসেরা যা ফিলিস্তিনের গালীল জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এ বিদ্রূপাত্মক নাম এতোটা প্রচলিত হতে পারেনি যে, মসীহের অনুসারীদের জন্যে নামের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

তাদের নাম 'মসীহী' বা খৃস্টান কিভাবে হলো ?

এ দলটির খৃস্টান নাম সর্বপ্রথম ৪৩ অথবা ৫৪ খৃস্টাব্দে এন্তাকিয়ার মুশরিক অধিবাসীগণ রাখে যখন সেন্টপল্ এবং বার্নাবাস সেখানে গিয়ে ধর্মীয় প্রচারকার্য শুরু করে-(প্রেরিতদের কার্য ১১ ঃ ২৬)। বিরোধীদের পক্ষ থেকে বিদ্রূপ করেই তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয় এবং মসীহের অনুসারীগণ তাদের জন্যে এ নাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের শত্রুদল যখন তাদেরকে ঐ নামেই সম্বোধন করতে থাকে তখন তাদের নেতৃবৃন্দ বলে, তোমাদেরকে যদি মসীহের সাথে সম্পৃক্ত করে 'মসীহী' বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে তাতে লজ্জার কি আছে ? (১-পিতর ৪ ঃ ১৬)। এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্রমশঃ ঐ নামে অভিহিত করতে থাকে যে নাম তাদের দুশমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের প্রতি আরোপ করে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে এ অনুভূতিই বিলুপ্ত হয় যে, এ একটা বিদ্রূপাত্মক নাম ছিল যে নামে তাদেরকে ডাকা হতো।

এজন্যে কুরআন মজিদ মসীহের অনুসারীদেরকে মসীহ অথবা ইসায়ী নামে আহ্বান করেনি। বরঞ্চ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা আসলে ঐসব লোকের বংশধর যাদেরকে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর সম্বোধন করে বলেছিলেন- مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ (কে আছ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী) এবং তারা জবাবে বলেছিল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী)। এজন্যে প্রাথমিক বা মৌলিক দিক দিয়ে তারা 'নাসারা' অথবা 'আনসার'। কিন্তু আজকাল ঈসায়ী মিশনারীগণ কুরআনের এ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অভিযোগ করে যে, কুরআন তাদেরকে মসীহী বা খৃস্টান বলার পরিবর্তে 'নাসারা' নামে অভিহিত করে।[৪৫৭]

খৃস্টবাদের আবির্ভাব কাল

ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ পরবর্তীকালের সৃষ্টি। ইহুদীবাদ তার নাম, বৈশিষ্ট্য ও রীতি পদ্ধতিসহ খৃস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মলাভ করে। যে সকল ধারণাবিশ্বাস ও বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদের সমষ্টির নাম খৃস্টবাদ, তা তো হযরত মসীহ (আ)-এর দীর্ঘকাল পর অস্তিত্ব লাভ করে। এখন আপনা আপনিই এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, হেদায়াত বা সত্য পথের উপর থাকা যদি ইহুদীবাদ অথবা খৃস্টবাদের উপরই নির্ভরশীল হয়, তাহলে এ দুটি ধর্মের বহু শতাব্দী পূর্বে যে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং অন্যান্য নবীগণ জন্মগ্রহণ করেন এবং যাঁদেরকে ইহুদী ও খৃস্টানগণও হেদায়েত প্রাপ্ত বলে স্বীকার করে, তাঁরা তাহলে কোন্ জিনিস থেকে হেদায়াত লাভ করতেন ? একথা ঠিক যে, সে বস্তু 'ইহুদীবাদ' অথবা 'খৃস্টবাদ' ছিল না। অতএব এ কথা আপনা আপনিই সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া ওসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয় যার কারণে এসব ইহুদী ও ঈসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন দল জন্মলাভ করেছে। বরঞ্চ তা প্রকৃতপক্ষে নির্ভরশীল সেই বিশ্বজনীন 'সিরাতে মুস্তাকীম' অবলম্বন করার উপর যার দ্বারা প্রত্যেক যুগে মানুষ হেদায়াত লাভ করতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং ইহুদী-খৃষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থাবলী এ কথার সাক্ষ্যদান করে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা-অর্চনা, পবিত্রতা বর্ণনা, বন্দেগী ও আনুগত্য স্বীকার করতেন না। তাঁর মিশনও এই ছিল যে, আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও অংশীদার করা যবে না। সুতরাং একথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, ইহুদীবাদ এবং খৃষ্টবাদ উভয়ই ঐ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, যে পথে হযরত ইবরাহীম (আ) চলতেন। কারণ এ দুটি ধর্মের মধ্যে শির্কের সংমিশ্রণ ঘটেছে।৪৫৮

খৃষ্টানদের হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বলে অভিহিত করা

প্রথমতঃ খৃষ্টানগণ হযরত মসীহের ব্যক্তিত্বকে মনুষ্যত্ব ও ইলাহত্বের (Divinity) এক যৌগিক পদার্থ (Compound) গণ্য করে এমন এক ভুল করে যে, তার ফলে মসীহের বাস্তবতা তাদের নিকটে একটা প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে। তাদের পণ্ডিতগণ শব্দের বাগাড়ম্বর ও আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে এ প্রহেলিকা খণ্ডনের যতোই চেষ্টা করেছে, ততোই অধিকতর জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে যার মনে ঐ যৌগিক ব্যক্তিত্বের মানবীয় অংশ প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই হযরত মসীহের খোদার পুত্র হওয়ার উপরে এবং তিন স্থায়ী খোদার একজন হওয়ার উপর জোর দিয়েছে। যার মনে ইলাহত্বের (উলুহিয়াত) অংশ অধিক প্রভাবশালী হয়েছে সে মসীহকে আল্লাহ দৈহিক প্রকাশ বলে গণ্য করে একেবারে আল্লাহ বানিয়ে দিয়ে আল্লাহ হিসেবে তাঁর ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করেছে। এ উভয়ের মধ্যবর্তী পথ যারা বের করতে চেয়েছে তারা তাদের সকল শক্তি এমন সব শাব্দিক ব্যাখায় নিয়োজিত করে যে, তার দ্বারা মসীহকে মানুষও বলা হতে থাকে এবং তার সাথে আল্লাহও মনে করা হতে থাকে। আল্লাহ এবং মসীহ দুটি পৃথক সত্তাও, আবার একও।৪৫৯

হযরত ঈসা (আ)-এর 'কালেমাতুল্লাহ' হওয়ার অর্থ

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ - النساء ١٧١

"মারইয়াম পুত্র মসীহ-ঈসা এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, সে ছিল আল্লাহর রাসূল ও তাঁর একটি ফরমান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

প্রকৃতপক্ষে 'কালেমা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ছে। মারইয়ামের প্রতি কালেমা প্রেরণের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা মারইয়ামের জরায়ুর প্রতি এ 'ফরমান' নাযিল করেন যে, সে যেন কোনো পুরুষের শূক্রস্নাত না হয়েই গর্ভসঞ্চার গ্রহণ করে নেয়। খৃষ্টানদেরকে প্রথমে হযরত মসীহ (আ)-এর বিনা বাপে পয়দা হওয়ার এ রহস্যই বলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা গ্রীকদর্শন দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রথমে কালেমা শব্দকে 'কথা' অথবা 'বাকশক্তির' সমার্থবোধক মনে করে। তারপর একথা ও বাকশক্তিকে আল্লাহ তাআলার কথা বলার নিজস্ব গুণের অর্থ হিসেবে গ্রহণ করে। অতপর তারা এ আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌছে যে, আল্লাহ তাআলার ঐ নিজস্ব গুণটি হযরত মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করে এক দৈহিক আকার ধারণ করে যা মসীহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে মসীহ (আ)-এর আল্লাহ হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় এবং এ ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয় যে,

আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে অথবা তাঁর শাশ্বত গুণাবলীর মধ্যে বাকশক্তির গুণকে মসীহের আকৃতিতে প্রকাশ করেছেন।[৪৬০]

ত্রিত্ববাদের ধারণা

সূরা আন নিসার ১৭১ আয়াতে হযরত মসীহকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ্ (رُوْحٌ مِّنْهُ) বলা হয়েছে এবং সূরা আল বাকারায় বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'আমরা পাক রূহ্ দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। (وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ) উভয় মূল বচনের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা মসীহ (আ)-কে এমন পবিত্র রূহ্ দান করেন যা পাপের ঊর্ধে, যা পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র মহত্ত্বে বিভূষিত। এ সংজ্ঞাই খৃস্টানদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল। একে তারা অতিরঞ্জিত করে। 'রূহুম্মিনাল্লাহকে' স্বয়ং আল্লাহর রূহ্ বলে গণ্য করে এবং 'রূহুল্ কুদুস্' (Holy Ghost) এর এ অর্থ করে যে, তা ছিল আল্লাহর পবিত্র রূহ্ যা মসীহের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। এভাবে আল্লাহ এবং মসীহের সাথে এক তৃতীয় খোদা 'রূহুল কুদুস্'কে বানিয়ে নেয়। এ ছিল খৃস্টানদের দ্বিতীয় চরম অতিরঞ্জন—যার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। মজার ব্যাপার এই যে, আজ পর্যন্ত ইঞ্জিল মথির মধ্যে একথা বিদ্যমান রয়েছে—ফেরেশতা (ইউসুফ নাজ্জারকে) স্বপ্নে বললো, হে ইউসুফ ইবনে দাউদ! তোমার স্ত্রী মারইয়ামকে তোমার নিকটে নিয়ে আসতে ভয় করো না। কারণ তার গর্ভে যা আছে তা 'রুহুল্ কুদুসের' কুদরতেই আছে।–অধ্যায় ১ ঃ ২)।[৪৬১]

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খৃস্টানগণ একই সাথে তাওহীদ স্বীকার করে এবং ত্রিত্ববাদও স্বীকার করে। মসীহ (আ)-এর যেসব সুস্পষ্ট বাণী ইঞ্জিলগুলোতে পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে কোনো খৃস্টান একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ মাত্র একজন এবং তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আল্লাহ নেই। একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই যে, তাওহীদ হলো প্রকৃত দ্বীন। কিন্তু প্রথমেই তারা এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর কালাম মসীহের আকারে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর রূহ্ তাঁর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণে তারা বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার উলুহিয়াতের সাথে মসীহ্ এবং রুহুল্ কুদুসের উলুহিয়াতকে স্বীকার করে নেয়াকে অযথা নিজেদের জন্যে অপরিহার্য করে নেয়। বলপূর্বক নিজেদের উপরে চাপিয়ে নেয়ার কারণে এ বিষয়টি তাদের জন্যে এক অসমাধানযোগ্য প্রহেলিকায় পরিণত হয় যে, তাওহীদী আকীদাহ্ সত্ত্বেও ত্রিত্ববাদের আকীদাহকে এবং ত্রিত্ববাদের আকীদাহ সত্ত্বেও তাওহীদের আকীদাহকে কিভাবে মেনে নেয়া যায়। নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট এ সমস্যা সমাধানের জন্যে খৃস্টান পণ্ডিতগণ প্রায় আঠারশ' বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন। বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি হয়েছে, একদল অন্য দলকে অবিশ্বাসী বা কাফের আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং এ নিয়ে কলহ-বিবাদ করে গির্জার পর গির্জা পৃথক হতে থাকে। তাদের কালাম শাস্ত্রের সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অথচ এ সমস্যা না খোদা সৃষ্টি করেছেন, আর না তাঁর প্রেরিত মসীহ্ এবং এ সমস্যার না কোনো সমাধান আছে যে, তিন খোদাও মানতে হবে এবং তারপর খোদার একত্বও অক্ষুণ্ন থাকবে। তাদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এর একমাত্র সমাধান এই যে, তারা অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি পরিহার করুক, মসীহ্ এবং রুহুল কুদুসের উলুহিয়াতের (Divinity) ধারণা পরিত্যাগ করুক। শুধুমাত্র আল্লাহকে

একমাত্র ইলাহ্ মেনে নিক এবং মসীহ্‌কে তাঁর পয়গম্বর মনে করুক, কানো দিক দিয়েই ইলাহত্ব উলুহিয়াতের অংশীদার মনে না করুক।৪৬২

শির্‌ক এবং ধর্মীয় মনীষীদের পূজা-অর্চনা

পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাধারণ খৃস্টানদের মধ্যে এবং বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলোতে শির্‌ক, ধর্মীয় মনীষীদের পূজা-অর্চনা এবং কবর পূজা প্রবল আকার ধারণ করে। বুযর্গদের আস্তানায় পূজা হতে থাকে এবং মসীহ্, মারইয়াম ও স্বর্গীয় অপ্সরীদের মূর্তি গির্জায় রাখা হয়। আস্‌হাবে কাহাফের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্বে ৪৩১ খৃস্টাব্দে সমগ্র খৃস্টান জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল অধিবেশন এফিসুস নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে হযরত মসীহের 'উলুহিয়াত' এবং হযরত মারইয়ামের 'আল্লাহর মা' হওয়ার ধারণা-বিশ্বাস স্থিরীকৃত হয়। এ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ[১] কুরআনের এ বাক্যে ঐসব লোকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা হযরত মসীহের একনিষ্ঠ অনুসারীদের মুকাবিলায় সে সময়ে খৃস্টান জনসাধারণের নেতা ও কর্মকর্তা হয়ে পড়েছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছিল। এরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে শির্‌কের ধ্বজাবাহী। তারই সিদ্ধান্ত করেছিল যে, আসহাবে কাহ্‌ফের উপর সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করে তার পূজা-অর্চনা করা হবে।৪৬৩

বর্তমান খৃস্টবাদ ও সেন্টপল্

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রাথমিক অনুসারীগণ তাকে নবী বলেই মানতো। তারা মূসার শরীয়াতের অনুসারী ছিল। আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে তারা অন্যান্য ইসরাঈলীদের থেকে কিছুতেই পৃথক মনে করতো না। ইহুদীদের সাথে তাদের মতভেদ শুধু এ ব্যাপারে ছিল যে, এরা হযরত ঈসাকে মসীহ্ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর উপরে ঈমান এনেছিল এবং তারা তাঁকে মসীহ্ মানতে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে সেন্টপল্ যখন এ দলে (ঈসার অনুসারীদের দলে) যোগদান করে, তখন সে রোমীয়, গ্রীক এবং অন্যান্য অ-ইহুদী ও অ-ইসরাঈলী লোকদের মধ্যে এ ধর্মের প্রসার শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে সে নতুন ধর্মের প্রবর্তন করে যার আকীদা-বিশ্বাস, মৌলনীতি ও নির্দেশাবলী ঐ দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যা হযরত ঈসা (আ) পেশ করছিলেন। সেন্টপল্ হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো সাহচর্য লাভ করেনি। বরঞ্চ তাঁর সময়ে সে ছিল তাঁর চরম বিরোধী। তাঁর পরেও সে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের পরম দুশমন ছিল। তারপর সে এ দলে যোগদান করে যখন এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন শুরু করলো তখনও সে হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো বাণীকে সনদ হিসেবে পেশ করেনি। বরঞ্চ এ নতুন ধর্মের ভিত্তিই ছিল তার কাশ্‌ফ ও ইলহাম বা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস অনুপ্রেরণা। তার এ নতুন ধর্ম প্রবর্তনের লক্ষ্য ছিল এই যে, ধর্ম এমন হতে হবে যা দুনিয়ার অ-ইহুদী জনসাধারণ (Gentilie) গ্রহণ করবে। সে ঘোষণা করে যে, একজন খৃস্টান ইহুদী শরীআতের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত। সে পানাহারে হালাল-হারামের নিষেধাজ্ঞা রহিত করে। খাত্‌না প্রথাও সে উচ্ছেদ করে যা দুনিয়ার অ-ইহুদী লোকেরা অপছন্দ করতো। শেষ পর্যন্ত সে মসীহের

---

১. সূরা কাহাফের আয়াত ২১ একথা বলা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন এ ছিল শির্‌ক ও কবরপূজার ধারক-বাহক খৃস্টানদের বক্তব্য।

উলুহিয়াত, খোদার পুত্র হওয়ার এবং শূলবিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানব সন্তানের গোনাহের কাফ্‌ফারা হওয়ার ধারণা-বিশ্বাসও প্রণয়ন করে। কারণ সাধারণ মুশরিকদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এ ছিল সামঞ্জস্যশীল। মসীহের প্রাথমিক যুগের অনুসারীগণ এ নতুন বেদআত বা ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করে। কিন্তু সেন্টপল্ যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তার মধ্য দিয়ে অ-ইহুদী খৃস্টানদের এমন এক বিরাট প্লাবন এ নতুন ধর্মে প্রবেশ করে যে, তার মুকাবিলায় ঐসব মুষ্টিমেয় লোক টিকে থাকতে পারেনি। তথাপি তৃতীয় খৃস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এমন বহু সংখ্যক লোক ছিল যারা মসীহের উলুহিয়াতের আকীদা অস্বীকার করতো।

পুলুসী ধারণা-বিশ্বাসের প্রসার

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে (৩২৫ খৃঃ) নিকিয়া কাউন্সিল (Nicaea Council) পুলুসী ধারণা-বিশ্বাসকে খৃস্টবাদের অকাট্য ও সর্বজন স্বীকৃত ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে। অতপর রোমীয় সম্রাট খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং কায়সার থিওডোসিয়াস্-এর সময়ে এ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যে সকল গ্রন্থ এ ধারণা-বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল তা পরিত্যক্ত হলো এবং ঐসব নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হলো যা এ নতুন ধারণা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ৩৬৭ খৃস্টাব্দে প্রথম এথানীসিয়াস্ (Athanasius)-এর একটি পত্রের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থ সমষ্টির নাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর ডেমাসিয়াস্ (Damasius)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় তা অনুমোদিত করা হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে পোপ গেলাসিয়াস্ (Gelasius) এ গ্রন্থ সমষ্টিকে সর্বজন স্বীকৃত বলে ঘোষণা করার সাথে ঐসব গ্রন্থেরও তালিকা প্রস্তুত করে যা অ-গ্রহণযোগ্য। অথচ যে পুলুসী ধারণা-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্য হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়, সে সম্পর্কে কখনো কোনো খৃস্ট্রীয় পণ্ডিত এ দাবী করতে পারেনি যে, তার মধ্যে কোনো একটি আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন। বরঞ্চ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমষ্টির মধ্যে যেসব বাইবেল গ্রন্থ শামিল তন্মধ্যস্থ হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো উক্তি থেকেও এ নতুন ধারণা-বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৬৪]

বৈরাগ্যবাদের অবির্ভাব ও তার কারণ

হযরত ঈসা (আ)-এর পর দু'শ বছর পর্যন্ত খৃস্ট্রীয় গির্জাগুলোকে বৈরাগ্যবাদ স্পর্শ করেনি। কিন্তু সূচনা থেকে খৃস্টবাদের (বিকৃত) মধ্যে তার বীজ পাওয়া যেতো এবং এর ভেতরে ঐসব কল্পনা বিদ্যমান ছিল যা এ বস্তুর জন্মদান করে। বর্জন ও বস্তুনিরপেক্ষতাকে আদর্শ চরিত্র গণ্য করা, বিবাহ-শাদী ও পার্থিব জীবন-যাপন থেকে দরবেশী জীনপ যাপনকে উৎকষ্টকর মনে করাই বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি এ উভয় জিনিসই প্রথম থেকে খৃস্টবাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে কৌমার্যকে পবিত্রতার সমার্থবোধক মনে করার কারণে যারা গির্জায় ধর্মীয় কাজকর্ম করবে তাদের বেলায় একটা অবাঞ্ছিত ছিল যে, তারা বিয়ে-শাদী করবে এবং সন্তানাদির মাতা-পিতা হয়ে সংসারের ঝামেলা পোয়াবে। তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ এ একটা ফেৎনার আকার ধারণ করে এবং বৈরাগ্যবাদ মহামারী রূপে খৃস্টবাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তিনটি কারণ

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর তিনটি বড়ো বড়ো কারণ ছিল ঃ

এক ঃ প্রাচীন মুশরিক সমাজে যৌন অনাচার, পাপাচার এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রতিরোধকল্পে খৃস্টান পণ্ডিতগণ ভারসাম্য অবলম্বন না করে চরম পন্থা অবলম্বন করে। তারা সতীত্বের প্রতি এতোটা গুরুত্ব দেয় যে, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে তারা অপবিত্র গণ্য করে, তা সে বিবাহের মাধ্যমেই হোক না কেন। তারা দুনিয়াদারীর বিরুদ্ধে এমন কঠোরতা অবলম্বন করে যে, কোনো দীনদার লোকের জন্যে সম্পদ রাখাই পাপ হয়ে পড়ে এবং চরিত্রের মানও হয়ে পড়ে যে, মানুষ কপর্দকহীন ও সবদিক দিয়ে সংসারত্যাগী হবে। এভাবে মুশরিক সমাজের ভোগ-বিলাসের জবাবে তারা এমন এক চরমপন্থা অবলম্বন করে যে, ভোগ-লিপ্সা পরিহার, প্রবৃত্তি ধ্বংস এবং কামনা-বাসনা নির্মূল করা চরিত্রের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রকারের কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেয়াকে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা ও তার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

দুই ঃ খৃস্টবাদ সাফল্য অর্জন করে যখন জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে, তখন আপন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের আশায় গির্জা প্রতিটি পাপ কাজকে তার আওতাভুক্ত করতে থাকে যা জনগণের মনঃপূত ছিল। প্রাচীন মূর্তিপূজার স্থানে অলী-দরবেশ বা মনীষীদের পূজা শরু হয়। হোরাস (Horus) ও আয়েসিস (Isis)-এর মূর্তির স্থলে মসীহ ও মারইয়ামের মূর্তিপূজা শুরু হয়। সেটারনালিয়া (Saturnalia)-এর পরিবর্তে সামসের উৎসব পালন করা শুরু হয়। প্রাচীন যুগের তাবিজ-তুমার, আমালিয়াত, ফালগিরি, ভবিষ্যৎ গণনা এবং জ্বিন-ভূত তাড়ানোর আমল সকল খৃস্টান দরবেশগণ শুরু করে।

এভাবে যেহেতু জনসাধারণ এমন লোককে আল্লাহ প্রেরিত মনে করতো যে, নোংরা ও উলংগ থাকতো এবং কোনো গর্ত বা পাহাড়ের গুহায় বাস করতো, সে জন্যে খৃস্টান গির্জায় আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার এ ধারণাই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এ ধরনেরই লোকের অলৌকিক কাহিনীর বই-পুস্তক খৃস্টানদের মধ্যে রচনা করা হয়।

তিন ঃ দ্বীনের সীমারেখা নির্ধারণ করার জন্যে খৃস্টানদের নিকটে কোনো বিস্তারিত শরীআত এবং কোনো সুস্পষ্ট সুন্নাত বা ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল না। মূসার শরীআত তারা বর্জন করেছিল এবং শুধুমাত্র ইঞ্জিলের মধ্যে কোনো পরিপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যেতো না। এজন্যে খৃস্টান পণ্ডিতগণ বাইরের কিছু দর্শন ও রীতি-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং স্বয়ং নিজেদের কিছু ঝোঁক প্রবণতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বেদআত ধর্মের ভেতর প্রবিষ্ট করতে থাকে। এসব বেদআতের মধ্যে বৈরাগ্যবাদও একটি।

বৈরাগ্যবাদের উৎস ও তার নেতৃত্বদানকারী

খৃস্টধর্মের পণ্ডিত ও নেতৃবৃন্দ বৈরাগ্যবাদের দর্শন ও তার কর্মপন্থা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু-সন্নাসী এবং হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের নিকট থেকে, প্রাচীন মিসরের ফকীর সন্ন্যাসীদের (Anchorites) নিকট থেকে, ইরানের বৈরাগ্যবাদী এবং প্লেটো ও তার অনুসারীদের নিকট থেকে। একেই তারা আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম গণ্য করে।

কোনো সাধারণ স্তরের মানুষ এ ভুল করেনি। তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ কুরআন নাযিলের যুগ পর্যন্ত যাদেরকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে খৃস্টবাদের উচ্চস্তরের

ধর্মীয় পণ্ডিত, মনীষী ও নেতা বলে শ্রদ্ধা করা হতো–যথা সেন্ট্ এথানাসিয়াস্, সেন্ট বাসেরল, সেন্ট্ গ্রেগরী, সেন্ট্ ক্রাইসিস্টেম, সেন্ট্ এমব্রুজ, সেন্ট্ জেরুন, সেন্ট্ আগাস্টাস্ সেন্ট্ বেনেডিক্ট, গ্রেগরী দি গ্রেট প্রভৃতি সকলেই সংসার বিরাগী ও বৈরাগ্যবাদের ধ্বজাবাহী ছিল। তাদেরই প্রচেষ্টায় গির্জায় বৈরাগ্যবাদের প্রচলন হয়।

প্রথম সন্ন্যাসী ও প্রথম খানকাহ বা মঠ

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃস্টানদের মধ্যে প্রথম বৈরাগ্যবাদ শুরু হয় মিসর থেকে। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিল সেন্ট্ এন্টনী (২৫০ খৃঃ–৩৫০ খৃঃ)। সে-ই প্রথম খৃস্টান সন্নাসী। সে ফাইয়ুম অঞ্চলে পাস্পিয়ার নামক স্থানে (এখন দায়রুল মাইমুন নামে অভিহিত) তার প্রথম খানকাহ্ কায়েম করে। তারপর সে দ্বিতীয় খানকাহ্ বা মঠ (Monk) তৈরী করে লোহিত সাগরের তীরে যাকে এখন দায়র মার এন্টনিউস্ বলা হয়। খৃস্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের বুনিয়াদী নিয়ম পদ্ধতি তার লেখা ও হেদায়াত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

যেখানে সেখানে মঠ নির্মাণ

এ সূচনার পর সমগ্র মিসরে মঠ নির্মাণের হিড়িক শুরু হয় এবং স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মঠ নির্মিত। এ সবের কোনো কোনোটি একত্রে তিন হাজার সন্ন্যাসীর উপযোগী করে তৈরী করা হয়। ৩২৫ খৃস্টাব্দে মিসরে খুমিউস্ নামে এক খৃস্টান সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় যে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর জন্যে দশটি বড়ো বড়ো মঠ তৈরী করে। তারপর এর ধারাবাহিকতা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করে। এ বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে গির্জার ব্যবস্থাপকগণ প্রথম প্রথম ভয়ানক জটিলতার সম্মুখীন হয়। কারণ তারা সংসার ত্যাগ, কৌমার্য এবং দারিদ্র ও কপর্দকহীনতাকে তো আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ মনে করতো কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতো বিয়ে-শাদী করা, সন্তান জন্ম দেয়া ও সম্পদ রাখাকে পাপ মনে করতো না। অবশেষে এথানসিয়াস্ (মৃত্যু ৩০৩ খৃ), সেন্ট্ বাসেরল (মৃত্যু ৩৭৯ খৃঃ), সেন্ট্ অগাস্টাইন (মৃত্যু ৪৩০ খৃঃ) এবং গ্রেগরী দি গ্রেট (মৃত্যু ৬০৯ খৃঃ) প্রমুখ লোকদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের বহু রীতি-পদ্ধতি গির্জার ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথারীতি প্রবেশ করে।

বৈরাগ্যবাদের ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্য

এ বৈরাগ্যবাদী বিদআতের কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

এক ঃ তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঠোর তপস্যা এবং নতুন নতুন উপায়ে শরীরকে কষ্ট দেয়া।

দুই ঃ সর্বদা নোংরা ও অপরিষ্কার থাকা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকে। গোসল করা বা শরীরে পানি লাগানো তাদের নিকটে আল্লাহপুরস্তির পরিপন্থী। শরীরের পরিচ্ছন্নতাকে তারা মনের অপবিত্রতা মনে করে।

তিন ঃ বৈরাগ্যবাদ দাম্পত্য জীবনকে কার্যত একেবারে হারাম করে দিয়েছে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক নির্মমভাবে নির্মূল করেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর যাবতীয় প্রবন্ধ রচনা এ কথায় ভরপুর যে, কৌমার্য সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিকমান এবং সতীত্বের অর্থ এই যে, মানুষ যৌন

সম্পর্ক একেবারে বর্জন করে চলবে, তা স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারই হোক না কেন। পবিত্র জীবনের পূর্ণতা এটা মনে করা হতো যে মানুষ তার নফসকে একেবারে ধ্বংস করবে এবং তার মধ্যে দৈহিক ভোগের কোনো লিপ্সাই বাকী থাকবে না। তাদের মতে কামনা-বাসনা নির্মূল করা প্রয়োজন এজন্যে যে, তার দ্বারা পাশবিক প্রবৃত্তি সবল হয়। ভোগ ও পাপ তাদের নিকটে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি আনন্দ উপভোগ করাও তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ বিস্মৃতির অনুরূপ। সেন্ট্ বাসেল হাসি ও মৃদু হাসি উভয়কেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এসব ধারণার ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের নিকটে অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়। একজন সন্নাসীর বিয়ে করা তো দূরের কথা, নারী মূর্তি দর্শনও নিষিদ্ধ। বিবাহিত হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। নারীদের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল করা হতো যে, যদি তারা আকাশ রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় তাহলে আজীবন কুমারী থাকবে। বিয়ে হয়ে থাকলে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সেন্ট্ জেরুমের মতো একজন বিশিষ্ট খৃস্টান ধর্মীয় পণ্ডিত বলেন যে, যে নারী মসীহের জন্যে সন্ন্যাসিনী হয়ে সারাজীবন কুমারী থাকবে, সে মসীহের দুলহীন বা পাত্রী হবে এবং সে নারীর খোদার মায়ের অর্থাৎ মসীহের শাশুড়ী (Mother in Law of God) হওয়ার সৌভাগ্য হবে। তিনি আর এক স্থানে বলেন, এ পথের পথিকের (সালেকের) প্রথম কাজ হলো, সতীত্বের কুঠার দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের কাঠ কেটে ফেলা। এসব শিক্ষার ফলে ধর্মীয় প্রেরণা জাগ্রত হবার পর একজন খৃস্টান পুরুষ ও একজন খৃস্টান নারীর উপর প্রথম প্রতিক্রিয়া এ হয় যে, তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

গির্জার ব্যবস্থাপনা তিন শতক ধরে তাদের সাধ্যানুযায়ী এ চরম প্রান্তিক ধারণার প্রতিবন্ধকতা করতে থাকে। চতুর্থ শতকে ক্রমশঃ এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যে ব্যক্তি গির্জায় দায়িত্ব পালন করবে তার বিবাহিত হওয়াটা অতীব ঘৃণ্য কাজ। ৩৬২ খৃস্টাব্দে গেংরা কাউন্সিল (Council of Gengra) ছিল সর্বশেষ সংস্থা বা সভা সেখানে এ ধরনের ধারণা-বিশ্বাসকে ধর্মের পরিপন্থী মনে করা হয়। কিন্তু তার অল্পকাল পরেই ৩৮৬ খৃস্টাব্দে Roman Synod সকল পাদ্রীকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয় বছর Siricius নির্দেশ দেয় যে, যে পাদ্রী বিবাহ করবে অথবা বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে তাকে পদচ্যুত করা হবে।

চার ঃ বৈরাগ্যবাদের সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় এই যে, এ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতির সম্পর্কও ছিন্ন করে দিয়েছে। খৃস্টান সাধু-সন্নাসীদের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, ভাই-ভগ্নির প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা এবং সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসাও পাপ ছিল। তাদের কাছে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এটি অপরিহার্য যে, মানুষ যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এ ব্যাপারে বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ এ ছিল যে, যে খোদা প্রেম কামনা করবে, সে মানব প্রেমের সকল বন্ধন ছিন্ন করবে যা দুনিয়ায় তাকে পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি ও সন্তান-সন্ততির সাথে আবদ্ধ করে।

পাঁচ ঃ নিকট-আত্মীয়দের সাথে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা করার যে অভ্যাস তারা করতো, তার ফলে তাদের মানবীয় অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তার পরিণাম এ ছিল যে, যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় মতবিরোধ হতো, তাদের উপর চরম অত্যাচার-নির্যাতন চালাতো। চতুর্থ শতাব্দী অবধি খৃস্টবাদ আশি-নব্বইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে

পড়ে। সেন্ট্ অগাস্টাইন তার আপন যুগে এ দলের সংখ্যা ৮৮ গণনা করে। এ দলগুলো একে অপরের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতো। সন্ন্যাসীগণই এ ঘৃণার অগ্নি প্রজ্জলিত করতো। মতবিরোধ পোষণকারী প্রতিপক্ষকে আগুনে জ্বালিয়ে মারার ব্যাপারেও সন্ন্যাসীগণ অগ্রগামী ছিল। এ দলীয় দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের শীর্ষস্থান ছিল এক্সান্দারিয়া বা আলেকজান্দ্রিয়া।

ছয় ঃ বর্জন ও বস্তুনিরপেক্ষতা এবং ফকীরি-দরবেশির সাথে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনও কম করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অবস্থা এই হয়েছিল যে, রোমের বিশপ রাজারহালে আপন প্রাসাদে বাস করতো। তার যানবাহন যখন রাস্তায় বেরুতো তখন তার আড়ম্বর ও জাঁকজমক রোম সম্রাট অপেক্ষা কোনোদিক দিয়ে কম ছিল না। মঠ ও গির্জাগুলোতে সম্পদের প্রবাহ সপ্তম শতাব্দী (কুরআন নাযিলের যুগ) পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে প্রবল প্লাবনের আকার ধারণ করে। .... বিশেষ করে যে জিনিস এ অধঃপতনের কারণ ছিল তাহলো এই যে, সন্ন্যাসীদের অসাধারণ সাধনা ও তাদের প্রবৃত্তি-নিধনের পরাকাষ্ঠা দেখে জনসাধারণ যখন তাদের প্রতি অতি মাত্রায় শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে, তখন বহু ধনলিপ্সু ব্যক্তি দরবেশি পোশাক পরিধান করে সন্ন্যাসীদের দলে যোগদান করে এবং তারা সংসার বর্জনের ছদ্মবেশে দুনিয়া লাভের ব্যবসা এমন জমজমাট করে যে, বড়ো বড়ো দুনিয়া লিপ্সু তাদের কাছে হার মানে।

সাত ঃ সতীত্বের ব্যাপারেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বৈরাগ্যবাদ বার বার পরাজয় বরণ করে। ..... মঠগুলোতে রিপুদমনের কিছু কঠোর সাধনা এমনও ছিল যে, বৈরাগ্যবাদী পাদ্রী ও পাদ্রিনী একত্রে মিলিত হয়ে বাস করতো এবং কখনো কখনো কঠোরতর অনুশীলনের জন্যে উভয়ে একই শয্যায় রাত্রি যাপন করতো। সেন্ট্ ইভাগ্রিয়াস (St. Evagrius) ফিলিস্তিনের এ ধরনের পাদ্রীদের রিপুদমনের প্রশংসা করে বলেন, তারা অনুশীলনকারিনী নারীদের সাথে মিলিত হয়ে স্নান করতো, তারা পরস্পরকে দেখতো, স্পর্শ করতো এবং কোলাকোলিও করতো। কিন্তু তথাপি প্রকৃতি তার উপর জয়ী হতে পরতো না। .... প্রকৃতির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে, প্রকৃতি তাদের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না। বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে অবশেষে চরিত্রহীনতার যে গভীর গহ্বরে পতিত হয়, তার লজ্জাকর কাহিনী অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসের এক দুরপনেয় কলংক।.... মধ্যযুগের গ্রন্থকারদের লিখিত গ্রন্থাবলীতে এমন বহু অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে পাদ্রিনীদের খানকাহ্ বা মঠগুলো চরিত্রহীনতার লীলাক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল। তাদের চার প্রাচীরের মধ্যে নবজাত শিশুদের বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চলতো। পাদ্রী ও গির্জার ধর্মীয় কর্মীগণ যাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ তাদের সাথেও অবৈধ সম্পর্কস্থাপন করতো। মঠগুলোর প্রকৃতি বিরুদ্ধ অপরাধও ব্যাপক আকার ধারণ করে।[৪৬৫]

বাইবেল গ্রন্থাবলীর ঐতিহাসিক মর্যাদা

[ইহুদীদের ন্যায় খৃস্টানদের নিকটেও আসমানী গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকতে পারেনি। এ কারণেই দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির পথ ধরে ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও নির্দেশাবলী প্রবেশ করেছে। প্রকৃত বাইবেল (ইঞ্জিল) যদি সংরক্ষিত হতো তাহলে খৃস্টবাদ তার বর্তমান আকারে প্রকাশ লাভ করতো না। নিম্নে বাইবেল গ্রন্থাবলী সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর গবেষণা পেশ করা হচ্ছে।–[সংকলকবৃন্দ]

সূত্র সম্পর্কে গবেষণা

আজ আমরা যে গ্রন্থ সমষ্টিকে ইঞ্জিল বা বাইবেল বলি, আসলে তার মধ্যে চারটি বড়ো বড়ো গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট রয়েছে,—যথা, মথি (Mathew), মার্ক (Mark), লূক (Luke) এবং যোহন (John)। কিন্তু এ সবের মধ্যে কোনো একটিও হযরত ঈসা (আ)-এর উপরে অবতীর্ণ গ্রন্থ নয়। কুরআন শরীফে যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত আয়াত ও সূরা একত্রে সন্নিবেশিত আছে, যেসব মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তেমনি যেসব অহী হযরত ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তা একত্রে কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তার পর যেসব সদুপদেশ ও হেদায়াত হযরত ঈসা (আ) বিভিন্ন সময়ে দান করেন, তাও তাঁর আপন ভাষা ও শব্দাবলীতে কোথাও পাওয়া যায় না, এই যে গ্রন্থগুলো আমাদের নিকটে পৌঁছেছে, সেগুলো না আল্লাহর বাণী, আর না হযরত ঈসা (আ)-এর। বরঞ্চ এসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের দ্বারা অথবা হাওয়ারীদের শিষ্যবৃন্দের দ্বারা। এসব গ্রন্থে তাঁরা তাঁদের জানামতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থা ও তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সন্নিবেশিত করেছেন।

মথির প্রতি আরোপিত গ্রন্থ

উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর কোনো সূত্র জানা নেই বলে সেগুলো তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথম গ্রন্থটি হযরত মসীহের হাওয়ারী মথির প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তা মথি কর্তৃক লিখিত নয়। মথির প্রকৃত গ্রন্থ লুজিয়া (Logia) বিলুপ্ত হয়েছে। যে গ্রন্থ মথির প্রতি আরোপ করা হয়, তার গ্রন্থকার একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নে অন্যান্য পুস্তকের সাথে 'লুজিয়া' গ্রন্থেরও সাহায্য নিয়েছেন। এর মধ্যে স্বয়ং মথির বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যেমন কোনো অপরিচিত লোকের করা হয়।[1] তারপর এ গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তার অধিকাংশ বিষয়বস্তু মার্কের ইঞ্জিল থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ তার ১০৬৮ স্তোত্রের মধ্যে ৪৭০টি স্তোত্র অবিকল মার্কের ইঞ্জিলে আছে। এর গ্রন্থকার যদি হাওয়ারী হতো, তাহলে এমন এক ব্যক্তির সাহায্য নেয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, যে না হাওয়ারী ছিল এবং না সে কোনোদিন হযরত ঈসা (আ)-কে দেখেছে। খৃস্টান পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ গ্রন্থ ৭০ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর ৪১ বছর পর লেখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ গ্রন্থ ৭০ খৃস্টাব্দে প্রণীত হয়েছে।

---

১. মথি অধ্যায় ৯ – স্তোত্র ৯ – বলে ঃ
"ইয়াসু সামনে অগ্রসর হয়ে মথি নামে এক ব্যক্তিকে কর আদায়ের ফাঁড়িতে দেখতে পেলেন।" একথা ঠিক যে গ্রন্থকার নিজের বর্ণনা এভাবে দিতে পারেন না।

মার্কের প্রতি আরোপিত গ্রন্থ

দ্বিতীয় গ্রন্থ মার্কের প্রতি আরোপিত এবং সাধারণত স্বীকার করা হয় যে, মার্ক স্বয়ং এ গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, তিনি কখনো হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেননি এবং তাঁর মুরীদও তিনি হননি।[১] তিনি প্রকৃতপক্ষে হাওয়ারী পিটার্সের (St. Peters) মুরীদ ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে যা শুনতেন, তাই গ্রীক ভাষায় লিখে রাখতেন। এজন্যে খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ তাঁকে পিটার্সের মুখপাত্র বলতেন। অনুমান করা হয় যে এ গ্রন্থ ৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়।

লূকের প্রতি আরোপিত গ্রন্থ

তৃতীয় গ্রন্থটি লূকের প্রতি আরোপ করা হয়। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, লূক কখনো মসীহকে দেখেননি এবং তাঁর কাছে কোনো কিছু লাভও করেননি। তিনি ছিলেন সেন্ট্ পলের মুরীদ। তিনি সর্বদা পলের সহচর ছিলেন এবং তিনি তাঁর ইঞ্জিলে পলেরই মুখপাত্র হিসেবে সবকিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ স্বয়ং পল এ ইঞ্জিলকে নিজস্ব ইঞ্জিল বলেন। কিন্তু একথা প্রমাণিত যে, সেন্ট্ পল স্বয়ং মসীহের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং খৃষ্টানদের বর্ণনা মতে মসীহের শূলে চড়ানোর ঘটনার ছ' বছর পর তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এজন্যে লূক মসীহের মাঝখানে বর্ণনা পরম্পরার যোগসূত্র একেবারেই পাওয়া যায় না। লূকের ইঞ্জিল রচনার কোনো ইতিহাসও নির্ধারিত নেই। কারো মতে এর রচনাকাল ৫৭ খৃষ্টাব্দ এবং কারো মতে ৭৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু হারিংক মিকস্গিফার্ট এবং প্লুমারের ন্যায় গবেষণা বিশারদগণের মতে এ গ্রন্থ ৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয়নি।

ইউহান্নার প্রতি আরোপিত গ্রন্থ

চতুর্থ গ্রন্থ ইউহান্নার প্রতি আরোপিত হয়। আধুনিক গবেষণা মুতাবেক এ গ্রন্থ প্রখ্যাত হাওয়ারী ইউহান্না কর্তৃক রচিত নয়। বরঞ্চ এ এমন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির রচনা যার নাম ছিল ইউহান্না (ইয়াহ্ইয়া বা John) এ গ্রন্থটি মসীহের বহু পরে ৯০ খৃষ্টাব্দে অথবা তারও পরে লিখিত হয়। হেরিংক এটাকে বাড়িয়ে ১১০ খৃষ্টাব্দ বলেন। এ বইগুলোর কোনো একটিরও বর্ণনা পরম্পরা মসীহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। এ সবের সনদ সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, হযরত মসীহ্ কি বলেছিলেন এবং কি বলেননি। কিন্তু গভীরভাবে গবেষণা করলে জানা যায় যে, এ বইগুলোর দলিল-প্রমাণে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ইঞ্জিলসমূহের অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ছয়টি কারণ

প্রথম চারটি ইঞ্জিলের বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে। এমন কি যে পর্বতবাসীর ওয়ায খৃষ্টীয় শিক্ষা-দীক্ষার মূল তা মথি, মার্ক এবং লূকে এ তিনটিতেই বিভিন্নভাবে এবং বিপরীতার্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ চারটি ইঞ্জিলেই তাদের প্রণেতাদের চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। মথি ইহুদীদেরকে সম্বোধন করেছেন বলে মনে হয় এবং তিনি তাদেরকে চূড়ান্ত সুযোগ দান করেছেন দেখা যায়। মার্ক রোমীয়গণকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদেরকে ইসরাঈলী মতবাদের সাথে পরিচিত করতে চান। লূক সেন্ট্ পলের মুখপাত্র এবং অন্যান্য হাওয়ারীদের

---

১. অনেকে বলেন, হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়াবার সময় সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। অবশ্যি এরও কোনো প্রমাণ নেই।-গ্রন্থকার

বিরুদ্ধে তাঁর দাবীগুলো সমর্থন করতে চান। প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে যেসব দার্শনিক চিন্তাধারা খৃস্টানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত বলে মনে হয়। এভাবে এ চার ইঞ্জিলের মধ্যে অর্থগত মতভেদ শাব্দিক মতভেদ থেকে অধিক হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ঃ ইঞ্জিলের সব গ্রন্থগুলোই গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়। অথচ হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর সকল হাওয়ারীর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। ভাষার বিভিন্নতার জন্যে চিন্তাধারার ব্যাখ্যায়ও মতভেদ হওয়া অতি স্বাভাবিক।

চতুর্থ ঃ ইঞ্জিলগুলো লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর পূর্বে হয়নি। ১৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ ধারণা এ ছিল যে, মৌখিক বর্ণনা লিখিত বর্ণনা থেকে অধিকতর উপযোগী। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে লিপিবদ্ধ করার বাসনা জাগ্রত হয়। কিন্তু ঐ সময়ের লিখিত জিনিস নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। নিউ টেস্টামেন্টের (New testament) প্রথম নির্ভরযোগ্য মূলবচন ৩৯৭ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কার্থেজের কাউন্সিলে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চম ঃ বর্তমানে ইঞ্জিলের যেসব প্রাচীন সংস্করণ পাওয়া যায় তা চতুর্থ খৃস্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের। দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম শতাব্দীর এবং তৃতীয় অপূর্ণ সংস্করণ যা রোমীয় পোপের লাইব্রেরীতে আছে, তাও চতুর্থ শতাব্দীর অধিক পুরানো নয়। অতএব বলা মুশকিল যে প্রথম তিন শতাব্দীতে যেসব ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল তার সাথে বর্তমানে ইঞ্জিলের কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে।

ষষ্ঠ ঃ কুরআনের মতো ইঞ্জিল গ্রন্থগুলো হিফ্য্ করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। এ সবের প্রকাশনা নির্ভর করতো অর্থগত বর্ণনার উপরে। স্মৃতিশক্তির অভাব ও বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রভাব থেকে স্বাভাবিকভাবেই এসব মুক্ত হতে পারে না। পরে যখন লেখার কাজ শুরু হয় তখন তা নকল নবিশদের দয়ার উপর নির্ভর করতো। নকল করার সময়ে প্রত্যেকে যা কিছু তার চিন্তাধারার পরিপন্থী মনে করতো তা সহজেই বাদ দিতে পারতো এবং তার মনঃপূত কোনো কিছুর অভাব দেখলে তা সংযোজন করতে পারতো।

এসব কারণেই আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, ইঞ্জিল চারটিতে হযরত মসীহের সত্যিকার শিক্ষা রয়েছে।

এ গোটা আলোচনা নিম্নের গ্রন্থাবলীর আলোকে করা হয়েছে ঃ

Dumellow-Gmmentary on the HOLY BIBLE

W. K. Cheyne—ENCYCLOPAEDIA BIBLICA

Willman—History of Christianity.

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা

হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণলিপি

খৃস্টীয় গির্জা যে চারটি ইঞ্জিলকে নির্ভরযোগ্য ও সর্বস্বীকৃত ধর্মগ্রন্থ (Lanonical Gospels) বলে অভিহিত করে, হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন চরিত ও শিক্ষা-দীক্ষা অবগত হওয়ার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম তা নয়। বরঞ্চ অধিকতর নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বার্নাবাসের ইঞ্জিল, যাকে গির্জা বে-আইনী এবং সন্দেহযুক্ত (Apocryphal) বলে ঘোষণা করে। খৃস্টানগণ এটাকে গোপন রাখার বিশেষ চেষ্টা করে। কয়েক শতাব্দী যাবত এটা দুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যোতা না।[১]

অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের একটা ফটোস্ট্যাট কপি পড়ে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং তা আমি আগাগোড়া পুংখানুপুংখরূপে পড়েছি। আমি অনুভব করেছি এটি এমন এক বিরাট সম্পদ যার থেকে খৃস্টানগণ তাদের চরম গোঁড়ামির জন্যে জিদ করে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে।[২]

যে চারটি গ্রন্থকে আইনানুগ ও নির্ভরযোগ্য গণ্য করে বাইবেলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তার রচয়িতাগণের কেউই হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ এ দাবীও করেননি যে, তিনি হযরত ঈসার সাহাবীদের নিকট থেকে কিছু জেনে নিয়ে তা নিজের রচিত ইঞ্জিলে সংযোজিত করেছেন। যেসব সূত্রে তাঁরা ওসব জ্ঞান লাভ করেছেন তার কোনো উল্লেখ তাঁরা করেননি। যার থেকে এ কথা বলা যেতো যে বর্ণনাকারী স্বয়ং যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যা কিছু শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন, অথবা এক বা একাধিক সূত্রে এসব তাদের কাছে পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে বার্নাবাস ইঞ্জিলের

---

১. ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এ গ্রন্থের ইতালী অনুবাদের এক খণ্ড পোপ সিক্সটাসের (Sixtus) লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতো এবং তা পাঠ করার অনুমতি কারো ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তা জনটুকল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। তারপর বিভিন্ন হাত বদল হয়ে ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে তা ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌঁছে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ঐ বইয়ের ইংরেজী তরজমা অক্সফোর্ডের ক্লারিগুন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই খৃস্টীয় জগত অনুভব করে যে, এ বইখানা তো ঐ ধর্মেরই গোড়া কেটে দিচ্ছে যা হযরত ঈসার প্রতি আরোপ করা হয়। এজন্যে তার ছাপানো খণ্ডগুলো বিশেষ কৌশল করে উধাও করে দেয়া হয়। তারপর তার পুনঃমুদ্রণের কোনো সুযোগই হয়নি। আর একটি খণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যেতো যা ইতালি ভাষা থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। জর্জ সেল তাঁর ইংরাজী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করা গ্রন্থের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেন। তাও গুম্ করে দেয়া হয়েছে। এখন তার কোনো নাম নিশানা পাওয়া যায় না-(গ্রন্থকার) পাশ্চাত্য জগতের বুদ্ধিবৃত্তিক উদারতার এ এক নিদর্শন যে, নিছক গবেষণার জন্যে অথবা ঐতিহাসিক প্রমাণলিপি (রেকর্ড) হিসেবে কোনো গ্রন্থকে টিকে থাকতে দেয়া হয়নি।-সংকলকদ্বয়

সম্প্রতি ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত বার্নাবাস ইঞ্জিলের ইতালি ভাষায় পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন- Lonsdale এবং Laura Ragg। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে করাচীর বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াক্‌ফ্ কর্তৃক।-অনুবাদক

২. খৃস্টান সাহিত্যে যেখানেই উপরোক্ত ইঞ্জিলের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে এ বলে তা রদ করা হয়েছে যে, এ এক জাল ইঞ্জিল যা সম্ভবত কোনো মুসলমান রচনা করে বার্নাবাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ এক ভয়ানক মিথ্যা কথা। এ মিথ্যার কারণ এই যে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে সুস্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রথমতঃ সে বই পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ কোনো মুসলমানের রচনা নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তা

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থকার বলেন, মসীহের প্রাথমিক বারোজন হাওয়ারীর মধ্যে আমি একজন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি মসীহের সাথে ছিলাম এবং চোখে দেখা ঘটনা এবং কানে শুনা কথা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করছি।

শুধু তাই নয় গ্রন্থের শেষে তিনি বলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় হবার সময় মসীহ আমাকে বলেন, আমার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা দূর করা এবং প্রকৃত অবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরা তোমার দায়িত্ব।[১]

বার্নাবাস ইঞ্জিলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

সকল প্রকার অন্ধ বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে যদি কেউ স্বচ্ছ মন দিয়ে এ ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে এবং নিউ টেস্টামেন্টের চার ইঞ্জিলের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে তাহলে তার এ কথা মনে করা ছাড়া উপায় থাকবে না যে, এ চারটি ইঞ্জিল থেকে বার্নাবাস ইঞ্জিল বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এমনভাবে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মনে হবে কোনো ব্যক্তি বাস্তবে যেন সবকিছু দেখছে এবং ওসব ঘটনার সাথে জড়িত চার ইঞ্জিলের সামঞ্জস্যহীন কাহিনীর তুলনায় বার্নাবাসের এ সব ঐতিহাসিক বর্ণনা অধিকতর সুসংবদ্ধ এবং তার দ্বারা ঘটনা পরম্পরা ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়।

হযরত ঈসা (আ)-এর সঠিক শিক্ষা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভংগী

চার ইঞ্জিলের তুলনায় বার্নাবাস ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা বিস্তারিতভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের শিক্ষা, শির্‌কের খণ্ডন, আল্লাহর গুণাবলী, ইবাদাতের প্রাণশক্তি এবং মহান চরিত্র শীর্ষক বিষয়গুলো খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)
মুসলমানের লেখা হতো, তাহলে মুসলমানদের কাছে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো এবং মুসলমান আলেমগণের লিখিত বই-পুস্তকে তার উল্লেখ পাওয়া যেতো। কিন্তু অবস্থা এই যে, জর্জ সেলের ইংরেজী অনুবাদ কুরআনের ভূমিকায় পূর্বে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো মুসলমানেরই জানা ছিল না। তাবারী, ইয়াকুবী, মাসউদী, আল্-বিরুনী, ইবনে হাযম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ, যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টানদের সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউই খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বার্নাবাস ইঞ্জিলের প্রতি ইংগিত মাত্রও করেননি। ইসলামী জগতের লাইব্রেরীগুলোতে যেসব বই-পুস্তক পাওয়া যায়, তার সর্বোত্তম তালিকা ইবনে নাদীমের আল্ ফিক্‌রিস্ত এবং হাজী খলিফার 'কাশফুয্ যুন্বন' উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যেও এর কোনো উল্লেখ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো মুসলমান আলেম বার্নাবাস ইঞ্জিলের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, নবী (সা)-এর জন্মের ৭৫ বছর পূর্বে প্রথম Gelasius-এর যুগে যেসব বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে বার্নাবাস ইঞ্জিলই (Evangelium Barnabe) শামিল ছিল। প্রশ্ন এই যে, সে সময় কোন্ মুসলমান এ জাল গ্রন্থ রচনা করে ?–গ্রন্থকার

১. এ বার্নাবাস কে ছিলেন ? বাইবেলের আসল পুস্তকে বার বার এ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে– যিনি কুবরুসের এক ইহুদী পরিবারের লোক ছিলেন। খৃষ্টবাদের প্রচার এবং মসীহের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর অবদানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে তিনি কখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিলের মধ্যে প্রাথমিক বারোজন হাওয়ারীর যে তালিকা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তাঁর নাম নেই। এজন্যে বলা যায় না যে, এ ইঞ্জিলের প্রণেতা কি ঐ বার্নাবাস, না আর কেউ। মথি ও মার্ক হাওয়ারীদের (Apostles) যে তালিকা দিয়েছেন, বার্নাবাস প্রদত্ত তালিকার মধ্যে দুটি নাম নিয়ে মতভেদ আছে। এক হচ্ছে লূক যার স্থলে বার্নাবাস স্বয়ং নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শামউন কেনানী যার স্থলে তিনি ইয়াহুদা বিন ইয়াকুবের নাম বলেন। লূকের ইঞ্জিলে এ দ্বিতীয় নামটিও আছে। এজন্যে এ ধারণা করা সঠিক হবে যে, পরে কোনো এক সময়ে বার্নাবাসকে হাওয়ারীদের বহির্ভূত করার জন্যে লূকের নাম বসানো হয়েছে যাতে করে তাঁর ইঞ্জিলের হাত থেকে বাঁচা যায়। ধর্মীয় পুস্তকে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করা খৃষ্টান পণ্ডিতদের কাছে কোনো অবৈধ কাজ নয়।–গ্রন্থকার

বিশদভাবে বর্ণিত। যেসব শিক্ষামূলক দৃষ্টান্তের বর্ণনাভংগীতে হযরত মসীহ্ এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, তার দশ ভাগের এক ভাগও এ চার ইঞ্জিলে পাওয়া যায় না। এর থেকে পরিষ্কার এ কথাও জানা যায় যে, হযরত মসীহ্ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কত বিজ্ঞতার সাথে প্রদান করতেন। তাঁর ভাষা, বর্ণনাভংগী, স্বভাব প্রকৃতি ও রুচিবোধের সাথে যদি কারো সামান্য পরিচয় থাকে, তাহলে এ ইঞ্জিল পাঠ করার পর সে মানতে বাধ্য হবে এ কোনো জাল কাহিনী নয় যা পরে কেউ রচনা করে থাকতে পারে। বরঞ্চ ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়ের তুলনায় এ ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ তাঁর প্রকৃত মর্যাদাসহ আমাদের সামনে অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ লাভ করেছেন। ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়ে তাঁর বিভিন্ন বাণীতে যে গরমিল দেখা যায়, তার কোনো চিহ্ন এ গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সকল নবীর শিক্ষার সাথে ঐক্য

আলোচ্য ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন ও তাঁর শিক্ষা ঠিক একজন নবীর জীবন ও শিক্ষার অনুরূপ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করেন, পূর্ববর্তী সকল নবী ও কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করেন। তিনি পরিষ্কার বলেন যে, নবীগণের শিক্ষা ছাড়া সত্য উপলব্ধি করার অন্য কোনো উপায় নেই। যে নবীগণকে ত্যাগ করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ত্যাগ করে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের ঠিক ঐ ধারণাই পেশ করেন, যার শিক্ষা সকল নবী দিয়েছেন। নামায, রোযা ও যাকাতের প্রেরণা দান করেন। তাঁর নামাযের যে বর্ণনা বার্নাবাস বহু স্থানে দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় যে, এ ছিল ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময় যখন তিনি নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা নামাযের পূর্বে অযুও করতেন। হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী বলে স্বীকার করতেন, অথচ ইহুদী-খৃস্টান তাঁদেরকে নবীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। হযরত ইসমাইল (আ)-কে তিনি 'যবীহ্' বলে গণ্য করেন এবং একজন আলেমের দ্বারা এ স্বীকারোক্তি করান যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈলই 'যবহী' ছিলেন। ইসরাঈলীরা টানাখেঁচা করে হযরত ইসহাক (আ)-কে 'যবহী' বানিয়ে রেখেছে। আখেরাত, কেয়ামাত, জাহান্নাম ও জান্নাত সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা প্রায় কুরআনেরই অনুরূপ।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

উপরে বলা হয়েছে যে, এ গ্রন্থের লেখক সূচনাতে তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যারা শয়তানের প্ররোচনায় ইয়াসূকে আল্লাহর পুত্র বলে গণ্য করে, খাত্না করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, হারাম খাদ্যকে হালাল করে যাদের মধ্যে প্রতারিত 'পল'-ও একজন, তাদের চিন্তাধারার সংশোধন করাই এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, হযরত ঈসা (আ) যখন দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিলেন, তখন তাঁর সময়ে তাঁর মোজেযা দেখে প্রথমে সর্বাগ্রে রোমীয় সৈনিকগণ তাঁকে খোদা এবং কেউ কেউ খোদার পুত্র বলা শুরু করে। তারপর এর ছোয়াচ্ ইসরাঈলী জনসাধারণের উপর লাগে। তার ফলে হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি বার বার অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর সম্পর্কে এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন এবং যারা তাঁর সম্পর্কে এরূপ কথা বলে তাদের উপর লানৎ করেন। তারপর তিনি তাঁর শিষ্যগণকে গোটা ইয়াহুদিয়ায় এ

ধারণা বিশ্বাস খণ্ডনের জন্যে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর দোয়ায় শিষ্যগণ দ্বারাও ঐ মোজেযার প্রকাশ ঘটান যাতে করে লোক এ ধারণা পরিত্যাগ করে যে, যার দ্বারা এ মোজেযার প্রকাশ ঘটে সেই খোদা অথবা খোদার পুত্র। হযরত ঈসা (আ) এ ভ্রান্ত আকীদার যেভাবে কঠোরতার সাথে খণ্ডন করেন, তার বিশদ বিবরণ তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি স্থানে স্থানে এ কথাও বলেন যে, এ গোমরাহি প্রসার লাভ করার কারণে হযরত ঈসা (আ) কতখানি বিব্রত হয়ে পড়েন।

উপরন্তু তিনি সেন্ট পলের এ ধারণা-বিশ্বাসেরও খণ্ডন করেন যে, মসীহ শূলবিদ্ধ হয়ে জীবন ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর চাক্ষুস ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, যখন ইয়াহুদা স্ক্রিউতি ইহুদীদের প্রধান পাদ্রীর নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার করার জন্যে সিপাহীদেরকে সাথে করে নিয়ে আসে, তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে চারজন ফেরেশ্তা হযরত ঈসা (আ)-কে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং স্বয়ং ইয়াহুদা স্ক্রিউতির আকার-আকৃতি এবং গলার স্বর অবিকল হযরত ঈসা (আ)-এর মতো হয়ে যায়। শূলে তাকেই চড়ানো হলো, হযরত ঈসাকে নয়। এভাবে এ ইঞ্জিল সেন্ট্ পল প্রবর্তিত খৃষ্টবাদের মূল কর্তন করে দেয় এবং কুরআনে প্রদত্ত বিবরণের সত্যতা স্বীকার করে। অথচ কুরআন নাযিলের একশত পনেরো বছর পূর্বে তাঁর এ বিবরণের ভিত্তিতেই খৃস্টান পাদ্রী তা রদ করে দিয়েছিল।[১]৪৬৭

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা

যে অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাইয়েদুনা মসীহ (আ) ফিলিস্তিনবাসীদের সমনে হুকুমাতে ইলাহীয়ার দাওয়াত পেশ করেন, যেহেতু সে অবস্থার সাথে আমাদের বর্তমান অবস্থার মিল রয়েছে, সেজন্যে তাঁর কর্মপদ্ধতির মধ্যে আমাদের জন্যে পথনির্দেশ রয়েছে। নিম্নে তাঁর কিছু হেদায়াত উদ্ধৃত করছি ঃ

তাওহীদের দাওয়াত

"আর অধ্যাপকদের একজন .... তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্টা প্রথম ? যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটী এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু ; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে।' .... অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই ;"–মার্ক ১২ ঃ ২৮-৩২

"তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"–লূক ৪ ঃ ৮

---

১. খৃস্টানদের এটি অতি দুর্ভাগ্য যে, বার্নাবাস ইঞ্জিলের মাধ্যমে তাদের ধারণা-বিশ্বাসের সংশোধন এবং হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষালাভের যে সুযোগ তারা পেয়েছিল, শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে তারা তা হারিয়ে ফেলে।–গ্রন্থকার

হুকুমাতে ইলাহী

"অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হইক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হইক ;"-মথি ৬ ঃ ৯-১০

শেষ আয়াতে হযরত মসীহ (আ) তাঁর লক্ষ্য সুস্পষ্ট করে দেন। সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা এ ছিল যে. খোদার বাদশাহীর অর্থ আধ্যাত্মিক বাদশাহী। উপরোক্ত আয়াত তা ভ্রান্ত প্রমাণ করে। তাঁর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এ ছিল যে, খোদার আইন ও শরীআতের হুকুম তেমনি কার্যকর হোক যেমন সমগ্র সৃষ্টিজগতে তাঁর প্রাকৃতিক আইন কার্যকর আছে। এ বিপ্লবের জন্যে তিনি লোক তৈরী করছিলেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক

"মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি ; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি। কেননা আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি ; আর আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে। যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয় ; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়।"

সত্যের পথে পরীক্ষা অনিবার্য

"আর যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইসে,[১] সে আমার যোগ্য নয়। যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে ; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।"-মথি ১০ ঃ ৩৮-৩৯

"কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে[২] অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হইক।"-মথি ১৬ ঃ ২৪

"আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে ; এবং সন্তানেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাঁহাদিগকে বধ করাইবে। আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে ; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।"-মথি ১০ ঃ ২১-২২

"যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভ্রাতৃগণ, ও ভগিনীগণকে এমন কি, নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার শিষ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা হইলে তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না ? কি জানি ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে সমাপ্ত করিতে না পারে, তবে যত লোক তাহা দেখিবে, সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে, বলিবে, এ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,

১. ক্রুশ হাতে তুলে নেয়ার অর্থ বলে মৃত্যুর জন্যে তৈরী থাকা, যেমন ধারা উর্দুতে বলা হয়- মাথা হাতের তালুতে রাখা (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা)- গ্রন্থকার।

২. আমিত্ব অর্থ আত্মপূজা ও ব্যক্তিস্বার্থ- গ্রন্থকার।

কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারিল না। অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে সমাঘাত করিতে যাইবার সময়ে অগ্রে বসিয়া বিবেচনা করিবেন না, যিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া আমার বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আমি দশ সহস্র লইয়া কি তাঁহার স্মমুখবর্ত্তী হইতে পারি ? যদি না পারেন, তবে শত্রু দূরে থাকিতে তিনি দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা করিবেন। ভাল, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।"–লূক ১৪ ঃ ২৬-৩৪

একটি বিপ্লবী আন্দোলন

এসব আয়াত বা স্তোত্রগুলো পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা (আ) শুধু একটা ধর্ম প্রচারের জন্যেই আবির্ভূত হননি। বরঞ্চ গোটা তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যার জন্যে ইহুদী রাষ্ট্র, ফকীহ্ এবং ফিরিসীদের শাসনকর্তৃত্ব, মোটকথা যাবতীয় প্রবৃত্তি পূজারী ও স্বার্থ পূজারীদের বিরুদ্ধে সংঘাত সংঘর্ষের আশংকা ছিল। এজন্যে তিনি পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলে দিতেন যে, যে কাজ তিনি করতে যাচ্ছেন তা ভয়ানক বিপজ্জনক এবং তাঁর সাথে তারাই চলতে পারে যারা যাবতীয় বিপদ-আপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

সহনশীলতার প্রেরণা

"কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না ; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙ্রাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে,তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।"–মথি ৫ ঃ ৩৯-৪১

"আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না ; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন,"

–মথি ১০ ঃ ২৮

দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ ও আখেরাতের চিন্তা করার দাওয়াত

"তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না ; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর ; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না।"–মথি ৬ ঃ ১৯-২০

"কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না ; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে ; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না ; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয় ? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন ; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও ? আর তোমাদের

মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে ? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও ? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে ; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না ; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না ? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব ?' বা 'কি পান করিব ?' বা 'কি পরিব ?' কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে ; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।"–মথি ৬ ঃ ২৪-৩৩

"যাঞ্চা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে ; অন্বেষণ কর, পাইবে ; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।"–মথি ৭ ঃ ৭

কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য

সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা এই যে, হযরত ঈসা (আ) বৈরাগ্যবাদ বর্জন ও বস্তুনিরপেক্ষতার শিক্ষা দেন। অথচ এ বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনাতে মানুষকে ধৈর্য, সহনশীলতা, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল প্রভৃতির শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। যেখানে একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সর্বশক্তি দিয়ে দুনিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তার লাভ করে আছে এবং জীবন-যাপনের সমুদয় উপায় উপাদান যার মুষ্ঠিতে, এমন স্থানে কোনো দল বিপ্লবের জন্যে দাঁড়াতে পারে না, যতোক্ষণ না সে জান ও মালের মহব্বত মন থেকে দূর করে দেবে, কষ্ট স্বীকার করার জন্যে তৈরী না থাকবে এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করার জন্যে প্রস্তুত না হবে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে নিজের উপরে সকল প্রকার বিপদ-মুছিবত আহ্বান করা। এ কাজ যাদের করতে হয়, তাদেরকে এক চড় খেয়ে দ্বিতীয় চড়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। পরণের জামা হাত ছাড়া হলে, চোগা ছেড়ে দেয়ার জন্যেও তৈরি থাকতে হবে। ভাত-কাপড়ের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। রেযেকের ধনভাণ্ডার যাদের হাতে তাদের সাথে লড়াই করে রেযেক হাসিল করার আশা করা যায় না। অতএব যে উপায়-উপাদান থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে এ পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

হুকুমাতে ইলাহীয়ার ব্যাপক মেনিফেস্টো

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত ' তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।"–মথি ১১ ঃ ২৮-৩০

এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় হুকুমাতে ইলাহীয়ার মেনিফেস্টো সম্ভবত রচনা করা যেতে পারে না। মানুষের উপর মানুষের শাসনের জোয়াল বড়োই কঠিন ও ভারী। এ কঠিন ও ভারী বোঝার তলে পিষ্ট মানুষকে হুকুমাতে ইলাহীয়ার নকীব যে

পয়গাম দিতে পারেন তাহলো এই যে, যে হুকুমাতের জোয়াল বা গুরুদায়িত্ব তিনি তাদের উপর চাপাতে চান তা যেমন কোমল, তেমনি হালকাও।

শাসন ক্ষমতা বিরাট সেবা

"কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, জাতিগণের রাজারাই তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তারাই 'হিতুকারী' বলিয়া আখ্যাত হয়। কিন্তু তোমরা সেইরূপ হইও না ; বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক ; এবং যে প্রধান, সে পরিচারকের ন্যায় হউক।"–লূক ২২ ঃ ২৫-২৬

হযরত মসীহ এসব উপদেশ তাঁর হাওয়ারী এবং সাহাবীদেরকে দিতেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন বাণী ইঞ্জিলগুলোতে রয়েছে। সে সবের মর্ম এই যে, "ফেরাউন-নমরূদকে তাড়িয়ে তোমরা নিজেরা যেন ফেরাউন-নমরূদ না হয়ে পড়।"

ইহুদী আলেম-পীরদের সমালোচনা

"তখন যীশু লোকসমূহকে ও নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন, অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসে। অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না ; কেননা তাহারা বলে, কিন্তু করে না। তাহারা ভারী দুর্ব্বহ বোঝা বাঁধিয়া লোকদের কাঁধে চাপাইয়া দেয়, কিন্তু আপনারা অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরাইতে চাহে না। তাহারা লোককে দেখাইবার জন্যই তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম করে ; কেননা তাহারা আপনাদের কবচ প্রশস্ত করে, এবং বস্ত্রের থোপ বড় করে, আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজগৃহে প্রধান প্রধান আসন, হাটে বাজারে মঙ্গলবাদ, এবং লোকের কাছে রব্বি [গুরু] বলিয়া সম্ভাষণ, এ সকল ভাল বাসে।"–মথি ২৩ ঃ ২-৭

"কিন্তু, হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে ! কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাক ; আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে আইসে, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না। হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে ! কারণ এক জনকে যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পবিভ্রমণ করিয়া থাক ; আর যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তুল।"–মথি ঃ ২৩ ঃ ১৩-১৫

"অন্ধ পথ-দর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক।"

–মথি ২৩ ঃ ২৪

"হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে ! কারণ তোমরা চূর্ণ-কাম করা কবরের তুল্য ; তাহা বাহিরে দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ব্বপ্রকার অশুচিতা ভরা। তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ।"–মথি ২৩ ঃ ২৭-২৮

এ ছিল সে সময়ের শরীয়াতের ধারক ও বাহকদের অবস্থা। দ্বীনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তি পূজার কারণে নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিল এবং জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করছিল। এ বিপ্লবের পথে রোমীয় শাসকদের চেয়ে তারাই ছিল অধিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী।

হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতাদের ষড়যন্ত্র

"তখন ফরীশীরা গিয়া মন্ত্রণা করিল, কিরূপে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ফেলিতে পারে। আর তাহারা হেরোদীয়দের[১] সহিত আপনাদের শিষ্যগণকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন, কেননা আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। ভাল, আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কি ? কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না ? কিন্তু যীশু তাহাদের দুষ্টামি বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ ? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটী দীনার আনিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার ? তাহারা বলিল, কৈসরের। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও।"–মথি ২২ ঃ ১৫-২১

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এ ছিল প্রকৃতপক্ষে একটা অপকৌশল। এ আন্দোলন বানচাল করার জন্যে ফিরিসীয়গণ চাচ্ছিল যে, সময়ের পূর্বেই সরকারের সাথে হযরত ঈসা (আ)-এর সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়া যাক এবং আন্দোলন শক্তিশালী হবার পূর্বেই সরকারের শক্তি দিয়ে তা চূর্ণ করে দেয়া হোক। এ কারণেই হিরোদী সি-আই-ডির সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো যে, কায়সারকে কর দেয়া যাবে কিনা। জবাবে হযরত মসীহ যে অর্থবহ কথাটি বলেন তাকে খৃস্টান অ-খৃস্টান নির্বিশেষে সকলে এ অর্থেই গ্রহণ করে আসছেন যে, "ইবাদাত খোদার কর এবং আনুগত্য কর সরকারের যে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে না তিনি একথা বলেন যে, কায়সারকে কর দেয়া সংগত, কারণ, তাহলে এটা হতো তাঁর দাওয়াতের পরিপন্থী কথা। আর না তিনি একথা বলেন যে, তাকে কর দেয়া যাবে না। কারণ ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, কর বন্ধ করার আদেশ তিনি করবেন। এজন্যে তিনি এ সূক্ষ্ম কথাটি বলেন যে, "কায়সারের নাম ও তার প্রতিকৃতি ত তাকেই ফিরিয়ে দাও এবং যে স্বর্ণ আল্লাহ পয়দা করেছেন তা তাঁর পথেই ব্যয় কর।" তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর ফিরিসীগণ স্বয়ং মসীহের হাওয়ারীদের মধ্য থেকে আরেকজনকে ঘুষ দিয়ে এ কথায় রাজী করে যে, এমন এক সময়ে মসীহকে গ্রেফতার করতে হবে যখন কোনো গণ-সংঘর্ষের আশংকা না থাকে। এ কৌশল কাজে লাগে। ইহুদী স্ক্রিউতি মসীহকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়।

হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে গণ্যমান্য ইহুদীদের মোকদ্দমা

"পরে তাহারা দল শুদ্ধ সকলে উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের কাছে লইয়া গেল। আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা-(লূক ২৩ ঃ ১-২)। তখন পীলাত প্রধান যাজকগণকে ও সমাগত লোকদিগকে কহিলেন, আমি এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইতেছি না। কিন্তু তাহারা আরও

১. হযরত ঈসার যুগে ফিলিস্তিনের এক অংশে দেশীয় রাজ্যের ন্যায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র ছিল যা রোম সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতো। তার প্রতিষ্ঠাতা হিরোদের নামানুসারে সাধারণত তাকে হিরোদী রাষ্ট্র বলা হতো। এখানে হিরোদী অর্থে রাষ্ট্রের পুলিশ ও সি-আই-ডির লোক।–গ্রন্থকার।

জোর করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি সমুদয় যিহূদিয়ায় এবং গালীল অবধি এই স্থান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করে–(লূক ২৩ ঃ ৪-৫)। ...... কিন্তু তাহারা উচ্চ রবে উগ্র ভাবে চাহিতে থাকিল, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয় ; আর তাহাদের রব প্রবল হইল।–লূক ২৩ ঃ ২৩

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর মক্কী যুগের দাওয়াতের সাথে সাদৃশ্য

এভাবে দুনিয়াতে হযরত মসীহের মিশন ঐসব লোকের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় যারা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ)-এর ওয়ারিশ মনে করতো। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরিখে হযরত মসীহ (আ)-এর নবুওয়াতের মোট সময়কাল দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে ছিল। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি অতটুকু কাজই করেছিলেন, যতোটুকু নবী মুহাম্মাদ (সা) তাঁর মক্কী জীবনের প্রাথমিক তিন বছরে করেন। যদি কেউ ইঞ্জিলের উপরোক্ত কথাগুলো কুরআনের মক্কী সূরাগুলো এবং মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ের হাদীসগুলোর সাথে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন, তাহলে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাবেন।[৪৬৮]

খৃষ্টানদের গোমরাহীর প্রকৃত কারণ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ

وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ۝ المائدة ٧٧

"বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমাদের পূর্বে যারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের চিন্তাধারা অনুসরণ করো না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৭

খৃস্টানদের বাড়াবাড়ি এবং অন্যান্যদের অন্ধ অনুসরণের ব্যধি

এখানে ঐসব পথভ্রষ্ট জাতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, খৃস্টানগণ যাদের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস ও ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করে। বিশেষ করে গ্রীক দর্শনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে তারা সেই সীরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, যার দিকে প্রথমতঃ তাদেরকে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মসীহের প্রাথমিক অনুসারীগণ যে ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করতেন, তা অনেকাংশে ঐ সত্যেরই অনুরূপ ছিল যা তাঁরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন এবং যার শিক্ষা তাঁদের পথপ্রদর্শক ও নেতা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের খৃস্টানগণ একদিকে মসীহের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনে চরম বাড়াবাড়ি করে এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের অন্ধ-বিশ্বাস ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদাহ-বিশ্বাসের অতিরঞ্জিত দার্শনিক ব্যাখ্যা শুরু করে। তারপর একেবারে এক নতুন ধর্ম বানিয়ে নেয়, যার সাথে মসীহের প্রকৃত শিক্ষার কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকে না।

জনৈক খৃস্টান পণ্ডিতের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

এ বিষয়ে রেভারিণ্ড চার্লস্ এণ্ডারসন স্কট্ নামে জনৈক খৃস্টান ধর্মীয় পণ্ডিতের বর্ণনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'ঈসু মসীহ' (Jesus Christ) শীর্ষক লিখিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ ইন্‌সাইক্লোপ্যাডিয়া বৃটেনিকার চতুর্দশ সংস্করণে দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

"প্রথম তিন ইঞ্জিলে (মথি, মার্ক, লূক) এমন কিছু নেই যার থেকে এ ধারণা করা যেতে পারে যে এ ইঞ্জিল প্রণেতাগণ ঈসুকে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। এমন এক মানুষ যিনি খোদার 'রূহ্' লাভ করে ধন্য হন এবং খোদার সাথে এমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখতেন যার কারণে তাঁকে খোদার পুত্র বললে যথার্থ হবে। স্বয়ং মথি তাঁকে কাঠমিস্ত্রীর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন, আর এক স্থানে তিনি বলেন যে, পিটার্স তাঁকে মসীহ মেনে নেয়ার পর একদিকে ডেকে নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে"– (মথি ১৬ ঃ ২২)। লূকে আমরা দেখতে পাই যে, শূলবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর ঈসুর দুজন শিষ্য উমাউসের দিকে যাবার সময় তাঁর উল্লেখ এভাবে করেন যে, "তিনি ঈশ্বরের ও সকল লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে ও বাক্যে পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন ;"–লূক ২৪ ঃ ১৯

একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যদিও 'মার্ক' গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে খৃস্টানদের মধ্যে 'খোদাওন্দ্' (Lord) শব্দটি ঈসুর জন্যে ব্যবহার করার সাধারণ প্রচলন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মার্কের ইঞ্জিলে আর মথির ইঞ্জিলে ঈসুকে কোথাও এ শব্দে স্মরণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে এ উভয় গ্রন্থে এ শব্দ 'আল্লাহর' জন্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটি ইঞ্জিলই ঈসুর দুর্ভাগ্যের কথা জোরেশোরে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উল্লেখ করছে। কিন্তু 'মার্কের' মুক্তিপণ সম্পর্কিত কথাগুলো (মার্ক ১০, ৪৫) এবং শেষ দিকে কিছু শব্দ বাদ দিলে কোথাও এমন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় না যে, মানুষের গোনাহ্ ও তার কাফ্ফারার সাথে ঈসুর মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক আছে।"

তিনি আরও বলেন,

"ঈসু নিজেকে যে একজন নবী হিসেবে পেশ করতেন, তা ইঞ্জিলগুলোর বিভিন্ন ভাষণ থেকে সুস্পষ্ট হয়। যেমন, "অদ্য, কল্য ও পরশ্ব আমাকে গমন করিতে হইবে ; কারণ এমন হইতে পারে না যে, যিরূশালেমের বাহিরে কোন ভাববাদী বিনষ্ট হয়।"–(লূক ১৩ ঃ ৩৩)। তিনি অধিকাংশ সময়ে নিজেকে আদম সন্তান বলে উল্লেখ করেন....... ঈসু কখনো নিজেকে খোদার পুত্র বলে উল্লেখ করেননি। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লোক যখন তাঁর সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করে তখন তার অর্থ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তাঁকে মসীহ্ মনে করা হয়। অবশ্যি তিনি নিজেকে শুধু 'পুত্র' শব্দ দ্বারা বুঝাতে চাইতেন। .... উপরন্তু, তিনি খোদার সাথে তাঁর সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্যেও 'পিতা' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহার করেন .... এ সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি নিজেকে একক মনে করতেন না। বরঞ্চ খোদার সাথে এ গভীর সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের মানুষকেও তিনি তাঁর সাথী মনে করতেন। অবশ্যি পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও মানব প্রকৃতির গভীর অধ্যয়ন তাকে একথা মনে করতে বাধ্য করে যে, তিনি এ ব্যাপারে একক ও নিঃসংগ।"

এ গ্রন্থকার পুনর্বার বলেন,

"পেন্টিকস্ট্ (Pentecost) পর্বের সময় পিটার্সের উচ্চারিত এ শব্দগুলো 'একজন মানুষ যিনি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত'– ঈসুকে সে হিসেবেই পেশ করে যে হিসেবে তাঁর সমসাময়িক লোক তাঁকে জানতো এবং মনে করতো .... ইঞ্জিলগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈসু শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করে চলেছেন। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল, তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন এবং ঘুমোতেন। বিস্মিত ও দিশেহারা হতেন। লোকের কাছে হালহকীকত জেনে নেয়ারও তাঁর দরকার হতো। তিনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সব কিছু শুনতেন ও দেখতে পারতেন এ দাবী তিনি করেননি তাই নয়, বরঞ্চ এ কথা অস্বীকার করেন। .... প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাযের-নাযের (সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা) হওয়ার দাবী করা হলে তা সে গোটা ধারণারই পরিপন্থী হবে যা আমরা ইঞ্জিলগুলো থেকে লাভ করি। শুধু তাই নয়, Gathesmane এবং Calvary নামক স্থানগুলোতে অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাগুলোর সাথে এ দাবীর কোনো সামঞ্জস্যই থাকে না। সামঞ্জস্য দেখাতে হলে এ ঘটনাগুলোকে একেবারে অমূলক বলে গণ্য করতে হবে। এ কথা মানতে হবে যে, মসীহ্ যখন এসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তখন মানবীয় জ্ঞানের সাধারণ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন। আর এ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোনো

ব্যতিক্রম থাকলে তা এতোটুকু যে, নবীসুলভ দূরদৃষ্টি এবং খোদা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারপর মসীহ্‌কে সর্বশক্তিমান মনে করার অবকাশ ত ইঞ্জিলগুলোতে আরও কম। কোথাও এমন কথার ইংগিত পাওয়া যায় না যে, খোদা থেকে বেপরোয়া হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। পক্ষান্তরে তিনি যে বার বার এ ধরনের দোয়া করতেন,– "দোয়া ছাড়া এ বিপদ থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই"–তার দ্বারা তিনি পরিষ্কার একথা স্বীকার করতেন যে, তিনি খোদার উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল। একথা এসব ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য যে, যখন খৃস্টীয় গির্জা মসীহকে 'ইলাহ' মনে করা শুরু করে তার পূর্বে যদিও এসব ইঞ্জিল প্রণীত হয়নি, তথাপি এসব দলিল-পত্রে একদিকে মসীহের প্রকৃতপক্ষে মানুষ হওয়ার সাক্ষ্য সংরক্ষিত আছে এবং অপরদিকে তার মধ্যে এমন কোনো সাক্ষ্য এ বিষয়ে পাওয়া যায় না যে, মসীহ নিজেকে খোদা মনে করতেন।"

রেভারেণ্ড স্কট্ আরও বলেন ঃ

"একমাত্র সেন্ট্ পল একথা ঘোষণা করে যে, উত্তোলনের ঘটনার সময় এ উত্তোলন কার্যের মাধ্যমেই ঈসুকে পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে প্রকাশ্যে 'খোদার পুত্র' হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। .... 'খোদার পুত্র' শব্দটি প্রকৃত ঔরসজাত হওয়ার ইংগিতই বহন করে। সেন্টপল অন্যত্র ঈসুকে "খোদার আপন পুত্র' বলে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। মসীহের জন্যে সম্বোধনমূলক শব্দ 'খোদাওন্দ্' (প্রভু) প্রকৃত ধর্মীয় অর্থে কে ব্যবহার করেছিল প্রাথমিক খৃস্টানগণ, না সেন্ট্পল তার সিদ্ধান্ত এখন করা যায় না। সম্ভবত এ কাজ প্রথমোক্ত দলটিই করে থাকবে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পলই পুরোপুরি অর্থে এ সম্বোধন করা শুরু করে। তারপর তিনি প্রভু ঈসু মসীহ সম্পর্কে এমন বহু ধারণা ও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থসমূহে প্রভু জেহোবার (আল্লাহ) জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। এভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মসীহকে খোদার জ্ঞান-বুদ্ধি ও মহত্ত্বের সমতুল্য বলে গণ্য করেন এবং সহজ অর্থে খোদার পুত্র বলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন দিক দিয়ে মসীহ্‌কে খোদার সমতুল্য করে দেয়ার পরও তাঁকে একেবারে 'আল্লাহ' বলে প্রচার করতে তিনি বিরত থাকেন।"

অন্য একজন খৃস্টান বিশেষজ্ঞের পর্যালোচনা

ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকায় Christianity শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রেভারেণ্ড জর্জ উইলিয়াম ফক্স্ খৃস্টান গির্জার মৌলিক আকীদা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

"ত্রিত্ববাদের চিন্তামূলক কাঠামো গ্রীকদের থেকে গৃহীত। তার উপরে ইহুদী মতবাদ ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে এ আমাদের জন্যে এক আশ্চর্য ধরনের জগাখিচুড়ি। ধর্মীয় চিন্তাধারা বাইবেলের এবং তা ঢেলে সাজানো হয়েছে বিজাতীয় দর্শনের রূপে।"

"পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদুসের পরিভাষাগুলো ইহুদী সূত্রে গৃহীত। যদিও ঈসু শেষ পরিভাষাটি খুব কমই ব্যবহার করেছেন এবং সেন্ট্পল তা ব্যবহার করলেও তার অর্থ একেবারে অস্পষ্ট ছিল। তথাপি ইহুদী সাহিত্যে এ শব্দটি প্রায় ব্যক্তিত্বের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অতএব এ আকীদার উপাদান ইহুদী ধর্মের (যদিও ঐ যৌগিক পদার্থে শামিল

হবার পূর্বে তাও গ্রীক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল) এবং বিষয়টি নির্ভেজাল গ্রীক। যে কথার উপরে ভিত্তি করে এ আকীদাহর উৎপত্তি তা না ছিল নৈতিক আর না ধর্মীয়। বরঞ্চ তা ছিল একেবারে একটা দার্শনিক প্রশ্ন। অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রূহ্ এ তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপটা কি ? গির্জা এর যা জবাব দিয়েছে তা নিকিয়া কাউন্সিলে গৃহীত আকীদাহ অন্তর্ভুক্ত। তা সকল বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে গ্রীক চিন্তাধারারই প্রতীক।"

গির্জার ইতিহাসের সাক্ষ্য

এ ব্যাপারে ইনসাক্লোপেডিয়া বৃটেনিকায় Church History শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দী শেষ হবার আগেই মসীহকে সাধারণতঃ 'বাণীর' দৈহিক আত্মপ্রকাশ বলে মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বহু সংখ্যক খৃস্টান মসীহকে খোদা বলে স্বীকার করতো না। চতুর্থ শতাব্দীতে এ বিষয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। যার ফলে গির্জার ভিত্তিমূল আলোড়িত হয়। অবশেষ ৩২৫ খৃন্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিলে মসীহের খোদা হওয়ার ধারণাকে যথারীতি সরকারী পর্যায়ে খৃস্টীয় আকীদাহ্ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিশেষ শব্দ প্রয়োগে তা রচনা করা হয়। যদিও তারপরও কিছুকাল বিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিকিয়ার সিদ্ধান্তের জয় হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে একে এভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সঠিক আকীদাহ্ পোষণকারী খৃস্টানদের এর প্রতিই বিশ্বাস করা উচিত। পুত্রকে খোদা বলে স্বীকার করার সাথে রূহকেও খোদা বলে স্বীকার করা হয় এবং একে দীক্ষা দানের (Baptism) বাণী এবং প্রচলিত ধর্মীয় নিদর্শনাবলীর মধ্যে পিতা ও পুত্রের সাথে স্থান করে দেয়া হয়। এভাবে নিকিয়াতে মসীহের যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয় তার পরিণামে ত্রিত্ববাদের আকীদাহ্ খৃস্টান ধর্মের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে পড়ে।"

তারপর "পুত্রের খোদা হওয়া মসীহের ব্যক্তি সত্তায় রূপ পরিগ্রহ করেছে", এ দাবীও এক দ্বিতীয় সমস্যা সৃষ্টি করে। যা নিয়ে চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরে বেশ কিছুকাল যাবত তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। প্রশ্ন এ ছিল যে, মসীহের ব্যক্তি-সত্তায় খোদা ও মানুষ হওয়ার মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল ? ৪৫১ খৃস্টাব্দে ক্যাল্‌সিডন কাউন্সিল এ সমাধান পেশ করে যে, মসীহের ব্যক্তি-সত্তায় দুটি পরিপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতির একত্র সমাবেশ ঘটেছে। একটি খোদার স্বভাব প্রকৃতি, দ্বিতীয়টি মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি। দুটি একত্র হওয়ার পরও তাদের পৃথক বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন ব্যতিরেকেই অক্ষুণ্ন রয়েছে। ৬৮০ খৃস্টাব্দে কনস্‌ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে এতটুকু যোগ করা হয় যে, উভয় স্বভাব প্রকৃতি তাদের পৃথক পৃথক ইচ্ছাশক্তিও রাখে। অর্থাৎ মসীহ একই সময়ে ইচ্ছাশক্তি ধারণ করেন।.......... এ সময়ে পাশ্চাত্য গির্জা গোনাহ্ এবং অনুগ্রহ বিষয় দুটি নিয়ে বিশেষ চর্চা করে এবং মুক্তির ব্যাপারে খোদার কি ভূমিকা এবং মানুষের কি ভূমিকা এ বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরে বিতর্ক চলে। অবশেষে ৫২৯ খৃস্টাব্দে অরেঞ্জের দ্বিতীয় কাউন্সিলে ...... এ মতবাদ গৃহীত হয় যে, আদমের স্বর্গচ্যুত হওয়ার কারণে প্রত্যেক মানুষের অবস্থা এই যে, সে মুক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না যতোক্ষণ না সে খৃস্টীয় দীক্ষাগ্রহণে খোদার অনুগ্রহে নতুন জীবন লাভ করে। এ নতুন জীবন শুরু করার পরও ভালো অবস্থায় স্থিতিশীল হবে না যতোক্ষণ না খোদার অনুগ্রহ চিরন্তনের জন্যে তার সহায়ক হয়। আর খোদার এ চিরন্তন অনুগ্রহ একমাত্র ক্যাথলিক গির্জার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে।"

বিতর্কের ফল

খৃস্টান পণ্ডিতগণের এসব বর্ণনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রথমে যে জিনিস খৃস্টানদেরকে পথভ্রষ্ট করে তা হলো আকীদাহ্ এবং ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ির ভিত্তিতেই হযরত মসীহ (আ)-এর জন্যে 'প্রভু' ও 'খোদার পুত্র' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। তাঁর প্রতি খোদার গুণাবলী আরোপ করা হয় এবং কাফ্ফারার আকীদাহ্ উদ্ভাবন করা হয়। অথচ হযরত মসীহের শিক্ষার মধ্যে এসব কথার কোনো লেশমাত্র ছিল না। তারপর যখন দর্শনের বিষাক্ত আবহাওয়া খৃস্টানদের মনে-প্রাণে লাগে, তখন এ প্রাথমিক গোমরাহি উপলব্ধি করে তার থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে তারা তাদের পূর্ববর্তী পেশওয়াদের ভুল সমর্থন করে তার ব্যাখ্যা দান শুরু করে। মসীহের প্রকৃত শিক্ষার দিকে ফিরে না গিয়ে শুধু এক শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে নতুন নতুন আকীদাহ উদ্ভাবন করতে থাকে। কুরআন পাকের এ আয়াতগুলোতে এসব গোমরাহী সম্পর্কে খৃস্টানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।[৪৬৯]

মানুষের জন্মগত পাপী হওয়ার ধারণা-বিশ্বাস

আসমানী কিতাবগুলো মানুষের জন্মগত পাপী হওয়ার কোনো ধারণাই পেশ করেনি যাকে খৃস্ট ধর্ম দেড়-দু' হাজার বছর থেকে তাদের নিজেদের মৌলিক আকীদাহ্ হিসেবে গণ্য করে আসছে। আজ স্বয়ং ক্যাথলিক পণ্ডিতগণ বলা শুরু করেছেন যে, এ আকীদার কোনো ভিত্তি নেই। বাইবেলের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত রেভারেণ্ড হার্বার্ট হাগ (Haag) তাঁর সাম্প্রতিক "Is Original Sin In Scripture" গ্রন্থে বলেন, প্রাথমিক যুগের খৃস্টানদের মধ্যে অন্ততঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এ আকীদাহ্র কোনো অস্তিত্বই ছিল না যে, মানুষ জন্মগত পাপী। এ ধারণা মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে, তখন দু'শতাব্দী যাবত খৃস্টান পণ্ডিতগণ তার প্রতিবাদ করতে থাকেন। অবশেষে পঞ্চম শতাব্দীতে সেন্ট্ অগাস্টাইন তাঁর তর্কশাস্ত্রের জোরে একে খৃস্টানদের মৌলিক আকীদাহ্র মধ্যে শামিল করে দেন যে, মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে আদমের পাপের বোঝা লাভ করেছে। এখন মসীহের কাফ্ফারার বদৌলতে মুক্তি লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[৪৭০]

হযরত মারইয়ামকে খোদার মা বলা

চারশ' একত্রিশ খৃস্টাব্দে ইফ্সুসে খৃস্টান জগতের ধর্মীয় নেতাদের এক কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে হযরত ঈসা (আ)-এর খোদা হওয়ার এবং খৃস্টানগণ শুধু হযরত মারইয়ামের খোদার মা হওয়ার আকীদাহ্ গির্জার সরকারী আকীদায় পরিণত হয়। খৃস্টানগণ শুধু মসীহ এবং রূহুল কুদুসকে খোদা বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ মসীহের মাতাকেও এক স্থায়ী খোদা বানিয়ে ফেলে। হযরত মারইয়ামের খোদা হওয়ার অথবা তাঁর খোদাসুলভ পবিত্রতা সম্পর্কে বাইবেলে কোনো ইংগিত পাওয়া যায় না। মসীহের পর তিনশ' বছর পর্যন্ত খৃস্টান জগত এ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। তৃতীয় শতকের শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় কতিপয় ধর্মীয় পণ্ডিত প্রথম মারইয়ামের খোদা হওয়ার আকীদাহ এবং মারইয়াম পূজা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু প্রথমে গির্জা তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরঞ্চ মরিয়ম পূজাকে ভ্রান্ত আকীদাহ বলে গণ্য করতো। তারপর মসীহের সত্তার মধ্যে দুটি স্থায়ী পৃথক পৃথক সত্তার সমাবেশ রয়েছে—নাস্তরিয়াসের এ ধারণার উপর যখন খৃস্টজগতে বিতর্কের ঝড় শুরু হয় তখন তার মীমাংসার জন্যে ৪৩১ খৃস্টাব্দে ইফস্সু

শহরে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে প্রথমবার গির্জার সরকারী ভাষায় হযরত মারইয়ামের জন্যে 'খোদার মাতা' আখ্যা ব্যবহার করা হয়। এর পরিণামে যে মারইয়াম পূজা গির্জার বাইরে চলছিল তা এ অধিবেশনের পর গির্জার মধ্যেই দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে। এমন কি কুরআন নাযিলের সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে হযরত মারইয়াম এতো বড়ো দেবী হয়ে পড়েন যে, পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদুস তাঁর কাছে নগণ্য হয়ে পড়েন। স্থানে স্থানে গির্জায় তাঁর মূর্তি স্থাপন করা হয়। তার মূর্তির সামনে পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান করা হতে থাকে। তাঁর কাছে দোয়া চাওয়া হতো। তিনিই ফরিয়াদ শ্রবণকারিণী, বিপদ-আপদ দূরকারিণী এবং অসহায়ের সহায় ছিলেন। একজন খৃস্টান বান্দার জন্যে বিশস্তত্বতার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো এই যে, 'খোদার মাতার' সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা সে লাভ করেছে। কায়সার জাস্টিনিয়ন এক আইনের ভূমিকায় হযরত মারইয়ামকে তাঁর রাজ্যের সাহায্যকারিণী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর খ্যাতনামা জেনালের নার্সিস্ যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত মারইয়ামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সমসাময়িক কায়সার হিরাক্লিয়াস্ তাঁর পতাকায় 'খোদার মাতার' প্রতিকৃতি অংকিত করে রেখেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এ প্রতিকৃতির বরকতে এ পতাকা অবনমিত হবে না। যদিও পরবর্তীকালে সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণ মারইয়াম পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, তথাপি রোমান ক্যাথলিক গির্জা আজও সেই মতবাদে বিশ্বাসী।[৪৭১]

তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী[১]

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ

مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط ـ الصف : ٦

"আর স্মরণ কর মারইয়াম পুত্র ঈসার সে কথা যা সে বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমি সত্যতা স্বীকারকারী সেই তাওরাতের যা আমার পূর্বে এসেছে এবং বিদ্যমান আছে এবং আমি সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে এবং যার নাম হবে আহমদ।"−(সূরা আস্ সাফ্ ঃ ৬)[২]

হযরত ঈসা (আ)-এর এ কথা ঐ সুসংবাদের প্রতি ইংগিত করে যা যা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে হযরত মূসা (আ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেন।[৩] তাতে তিনি বলেন ঃ

এক নবীর আবির্ভাব ঘটাবো

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।"

−দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৫-১৯

তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী

এ হচ্ছে তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা নবী মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপিত হতে পারে না। এতে হযরত মূসা (আ) তাঁর জাতিকে আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন ঃ "আমি তোমার জন্যে তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাব করবো।" প্রকাশ থাকে যে, একটি জাতির ভাইয়ের অর্থ স্বয়ং সে জাতির কোনো গোত্র বা বংশ হতে পারে না। বরঞ্চ এমন এক জাতি হতে পারে যার সাথে বংশগত নিকট সম্পর্ক রয়েছে। এর অর্থ যদি স্বয়ং বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই কোনো

---

১. তাওরাতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ইহুদী অধ্যায়ে এবং ইঞ্জীলের বাণীগুলো পৃথক বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞ গ্রন্থকার উভয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে এমনভাবে একত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তা পৃথক করলে আলোচনার গুরুত্ব কমে যায়। তাই একত্রেই বর্ণনা করেছেন।

২. এ বিতর্কিত আয়াতটির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, আলোচনা সামনে আসবে।

৩. হযরত মূসা (আ)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও তাওরাতের উপর খৃষ্টানগণও বিশ্বাস পোষণ করেন।

নবীর আগমন হতো তাহলে এভাবে বলা হতো—'আমি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এক নবীর আবির্ভাব করবো।' অতএব বনী ইসরাঈলের ভাইয়ের অর্থ অনিবার্যরূপে বনী ইসরাঈলই হতে পারে যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তাদের বংশীয় আত্মীয়। উপরন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী বনী ইসরাঈলের কোনো নবী সম্পর্কে এজন্যে হতে পারে না যে, হযরত মূসা (আ)-এর পরে বনী ইরাঈলের মধ্যে কোনো একজন নবী নয়, বহু নবী এসেছেন যাদের উল্লেখ বাইবেলের সর্বত্র পাওয়া যায়।

এ সুসংবাদে দ্বিতীয় কথা যা বলা হয়েছে তা এই যে, "যে নবী পাঠানো হবে তিনি হবেন হযরত মূসার সদৃশ।" মুখের রূপ ও আকার-আকৃতি এবং জীবনের অবস্থার দিক দিয়ে এ সাদৃশ্য যে নয় তা অতি সুস্পষ্ট। কারণ এ দিক দিয়ে কোনো ব্যক্তিই অন্যের মতো হয় না। এর অর্থ নিছক নবুওয়াতের গুণাবলীর সাদৃশ্যও নয়। কারণ এ গুণ ঐসকল নবীর মধ্যে একই রকম পাওয়া যায় যাঁরা মূসা (আ)-এর পরে এসেছেন। অতএব কোনো একজন নবীর এ বৈশিষ্ট্য হতে পারে না যে, তিনি এ গুণের দিক দিয়ে মূসা (আ)-এর সদৃশ। অতএব এ দু দিক দিয়ে সাদৃশ্য বিতর্ক বহির্ভূত হওয়ার পর সাদৃশ্যের অন্য কোনো কারণ, যার ভিত্তিতে আগমনকারী নবীর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়, এ ছাড়া হতে পারে না যে, সে নবী (ভবিষ্যতে আগমনকারী নবী) একটা স্থায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীআত নিয়ে আসার ব্যাপারে হযরত মূসা (আ)-এর অনুরূপ। এ বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর পূর্বে বনী ইসরাঈলের মধ্যে যে নবীই এসেছেন, তিনি মূসার শরীআতেরই অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনও স্থায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীআত নিয়ে আগমন করেননি।

এ ব্যাখ্যা অধিকতর জোরালো হয় ভবিষ্যদ্বাণীর এ কথাগুলো থেকে, যথা–"এটা তোমার (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) সেই প্রার্থনা অনুসারে হবে যা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সমাবেশের দিন হোরেবে করেছিলে, যেন আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে এবং এই মহাগ্নি আর দেখতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালই বলছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিব।"

এখানে হোরেব বলতে সে পাহাড় বুঝানো হয়েছে, যেখানে হযরত মূসা (আ)-কে প্রথমবার শরীআতের নির্দেশাবলী দেয়া হয়। বনী ইসরাঈলের যে প্রার্থনার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে কোনো শরীআত যদি দেয়া হয় তাহলে যেন সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দেয়া না হয়, যা হোরেব পর্বত প্রান্তে শরীআত প্রদানকালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ অবস্থার উল্লেখ কুরআনেও আছে এবং বাইবেলেও আছে। (সূরা আল বাকারা আয়াত ৫৫-৫৬, ৬৩, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ১৫৫, ১৭১; বাইবেল, যাত্রা পুস্তক ১৯ঃ ১৭-১৮)। এর জবাবে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দোয়া কবুল করেছেন। তাঁর এরশাদ হচ্ছে, আমি তাদের জন্যে এমন নবী পাঠাবো যার মুখে আমার বাণী নিক্ষেপ করবো। অর্থাৎ ভবিষ্যত শরীআত দেবার সময় সে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করা হবে না যা করা হয়েছিল হোরেব পর্বত প্রান্তে। বরঞ্চ যখনই তাঁকে এ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হবে, তাঁর মুখে আল্লাহর বাণী নিক্ষেপ করা হবে। তা তিনি জনসাধারণকে শুনিয়ে দেবেন।

এ সুস্পষ্ট কথাগুলো বিবেচনা করার পর আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, যাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তিনি নবী মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। হযরত মূসা (আ)-এর পর স্থায়ী স্বয়ং সম্পূর্ণ শরীআত নবী মুহাম্মাদ (সা)-কেই দেয়া হয়েছে। এ শরীআত দেবার সময় কোনো জনসমাবেশও হয়নি, যেমন হোরেব পর্বত প্রান্তে বনী ইসরাঈলের হয়েছিল। শরীআতের বিধান দেয়ার সময়েই ঐরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়নি যা সেখানে করা হয়েছিল।[৪৭২]

সূরা আস সাফ্-এর উপরে উল্লিখিত আয়াতের বিশদ আলোচনা

সূরা আস সাফ্-এর যে আয়াতটির অনুবাদ এ অধ্যায়ের শুরুতেই করা হয়েছে তা কুরআন পাকের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ইসলাম বিরোধীগণ এ আয়াতটির উপর সাংঘাতিক আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং নিকৃষ্ট ধরনের বিশ্বাস ভংগের অপরাধ করেছে। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর নাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। এজন্যে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

এক ঃ এতে নবী (সা)-এর নাম আহ্‌মাদ বলা হয়েছে। আহ্‌মাদের দুটি অর্থ। এক হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তি যার সর্বাধিক প্রশংসা করা হয়েছে। অথবা বান্দাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক প্রশংসনীয়। সহীহ্ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত যে, এটাও ছিল নবী (সা)-এর একটা নাম। মুসলিম এবং আবু দাউদে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা)-এর বর্ণনামতে নবী (সা) বলেন, أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا حَاشِرٌ –"আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি হাশির। এ বিষয়বস্তুর বর্ণনা হযরত জুবায়ের বিন্ মুতয়িম (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী এবং নাসায়ী। নবী (সা)-এর এ নাম সাহাবায়েকিরামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা) তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

صلى الا له ومن يحف بعرشه   والطيبون على المبارك احمد

"আল্লাহ্, তাঁর আরশের চার পাশে ভিড় করা ফেরেশতারা এবং সকল পবিত্র সত্তাগণ বরকত বিশিষ্ট আহমাদের উপর দরূদ পাঠ করেন।"

ইতিহাস থেকেও একথা প্রমাণিত যে, হুযুর (সা)-এর নাম শুধু মুহাম্মাদই ছিল না বরঞ্চ আহমাদও ছিল। গোটা আরব সাহিত্যে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে নবী (সা)-এর পূর্বে কারো নাম আহমাদ ছিল। তাঁর পরে অসংখ্য অগণিত লোকের নাম আহমাদ, গোলাম আহমাদ রাখা হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, তাঁর নবুওয়াতের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত গোটা উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে তাঁর এ নাম এতো সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। তাঁর যদি এ নাম না হতো, তাহলে যারা আপন সন্তানদের নাম গোলাম আহমাদ রেখেছে, তারা কোন্ আহমাদের গোলাম তাদেরকে মনে করেছে?

দুই ঃ ইঞ্জিল যোহন (John) এ কথার সাক্ষী যে, মসীহের আগমনের সময় বনী ইসরাঈল তিন ব্যক্তির প্রতীক্ষা করছিল। এক, মসীহ্, দ্বিতীয়, ইলিয়া অর্থাৎ হযরত ইলয়াসের পুনরাগমন এবং তৃতীয় 'সেই নবী'।

ইঞ্জিলের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

"আর যোহনের সাক্ষ্য এই,-যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে ?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না ; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় ? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী ? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে ? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি কহিলেন, আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর," যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছেন। তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন ? "-যোহন ১ ঃ ১৯-২৫

এ কথাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈল হযরত মসীহ এবং হযরত ইলিয়াস ছাড়াও আর এক নবীর প্রতীক্ষা করছিল। আর তিনি হযরত ইয়াহ্ইয়াও ছিলেন না। সেই নবীর আগমনের বিশ্বাস বনী ইসরাঈলের মধ্যে এতো প্রসিদ্ধ সর্বজন বিদিত ছিল যে, 'সেই ভাববাদী' বলাই তাঁর প্রতি ইংগিত করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। 'যার সুসংবাদ তাওরাতে দেয়া হয়েছে'—একথা বলার প্রয়োজন ছিল না। উপরন্তু এটাও জানা গেল যে, যে নবীর প্রতি তারা ইংগিত করছিল তাঁর আগমন সুনিশ্চিত ছিল। কারণ যখন হযরত ইয়াহ্ইয়াকে এসব প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি একথা বলেননি যে, "আর কোনো নবী আসবেন না, তোমরা কার কথা বলছো ?"

যোহন লিখিত ইঞ্জিলের সুসংবাদ

তিন ঃ এখন ঐসব ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন যা যোহন ইঞ্জিলে ক্রমাগত অধ্যায় ১৪ থেকে অধ্যায় ১৬ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে ঃ "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন ; তিনি সত্যের আত্মা ; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকেও জানেও না ; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।"

-যোহন ১৪ ঃ ২৫-২৬

"আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না ; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই ;"-১৪ ঃ ৩০

"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন-যখন সেই সহায় আসিবেন —তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"-১৫ ঃ ২৬

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"-১৬ ঃ ৭

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার ; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।"–১৬ ঃ ১২-১৫

আগমনকারী বিশ্ব নেতা হবেন

যোহন লিখিত ইঞ্জিলের উপরোক্ত বক্তব্যগুলোতে হযরত ঈসা (আ) তাঁর পরে একজন আগমনকারীর সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি বলছেন যে, তিনি দুনিয়ার সরদার বা বিশ্বনেতা (সরওয়ারে আলম) হবেন, চিরদিন থাকবেন। সত্যের সকল পথ দেখাবেন এবং স্বয়ং তাঁর (হযরত ঈসার) সাক্ষ্য দান করেন। যোহনের এ সকল বক্তব্যে 'রুহুল কুদুস' এবং 'সত্যের আত্মা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে বিষয়বস্তুকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি সব কথাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়লে পরিষ্কার জানা যায় যে, যে আগমনকারীর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তিনি কোনো 'আত্মা' নন, বরঞ্চ কোনো মানুষ এবং বিশেষ মানুষ যাঁর শিক্ষা হবে ব্যাপক ও সার্বিক এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। ঐ বিশেষ ব্যক্তির জন্যে উর্দু অনুবাদে 'সাহায্যকারী' বলা হয়েছে এবং যোহন লিখিত মূল ইঞ্জিলে গ্রীক ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে খৃস্টানগণ জোর দিয়ে বলে যে, তা Paracletus ছিল।

প্যারাক্লিটাস্ শব্দ নিয়ে খৃস্টানদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি

এ শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে স্বয়ং খৃস্টান পণ্ডিতগণ চরম জটিলতার সম্মুখীন হন। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclete শব্দের কয়েকটি অর্থ হয়। যথা কোনো স্থানের দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করা, সতর্ককরণ, প্রেরণা দান, উত্তেজিত করা, দোয়া করা প্রভৃতি। আবার এ শব্দের গ্রীসীয় অর্থ এভাবেও করা হয়, যেমন—সান্ত্বনা দেয়া, শান্ত করা, উৎসাহিত করা। বাইবেলে এ শব্দটি যেখানে যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তার কোথাও তার অর্থ যথোপযুক্ত হয় না। Origen কোথাও তার অনুবাদে Consolator (সান্ত্বনা দানকারী) শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং কোথাও Deperecator। কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকারগণ এ দুটি বাতিল করেছেন। প্রথমতঃ গ্রীক ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি শুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়তঃ যেখানেই এ শব্দ পাওয়া যায়, তার এ অর্থ চলে না। অন্য কতিপয় ভাষ্যকার এ শব্দের অনুবাদে Teacher শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, গ্রীক ভাষায় ব্যবহার বিধি অনুযায়ী এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তার্তুলিয়ান এবং অগাস্টাইন Advocate শব্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ Assistant, Confortur এবং Consoler প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন-(Encyclopaedia of Biblical Literature—Word Paracleturs– দ্রষ্টব্য)।

একটা শাব্দিক হেরফেরের সম্ভাবনা

এখন মজার ব্যাপার এই যে, গ্রীক ভাষায় আর একটি শব্দ- Periclytos আছে। তার অর্থ "প্রশংসিত"। এ শব্দ একবারে 'মুহাম্মাদ' শব্দের সমার্থবোধক এবং উচ্চারণে

Periclytos এবং Paracletus- এর মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে। এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, যেসব খৃস্টান পণ্ডিত পাদ্রী তাঁদের ধর্মগ্রন্থে আপন মর্জিমতো অনায়াসে রদবদল করতে অভ্যস্থ ছিলেন, তাঁরা যোহন কর্তৃক উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীর এ শব্দটিকে তাঁদের আকীদাহ বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করে তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেছেন। যোহন লিখিত প্রাথমিক গ্রীক ভাষায় ইঞ্জিল এখন কোথাও বিদ্যমান নেই বলে প্রমাণ করা কঠিন যে, সেখানে এ দুটি শব্দের মধ্যে কোন্‌টি ব্যবহার করা হয়েছিল।

মূল সুরিয়ানী শব্দ

যোহন গ্রীক ভাষায় আসলে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করছিলেন, তার উপরেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ তা ছিল মূল ভাষার অনুবাদ। আর মসীহের ভাষা ছিল ফিলিস্তীনের সুরিয়ানী ভাষা। অতএব তিনি তাঁর সুসংবাদে যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা অনিবার্যরূপে কোনো সুরিয়ানী শব্দই হবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই মূল সুরিয়ানী শব্দ আমরা ইবনে হিশাম লিখিত জীবন চরিতে (সীরাতে ইবনে হিশাম) দেখতে পাই। সেই সাথে ঐ কিতাব থেকে এটাও জানা যায় যে, তার সমার্থবোধক গ্রীক শব্দ কি। মুহাম্মাদ বিন ইসহ-াকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম যোহন লিখিত ইঞ্জিলের অধ্যায় ১৫, স্তোত্র ২৩-২৭ এবং অধ্যায় ১৬ স্তোত্র ১-এর গোটা অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে তিনি গ্রীক শব্দ "ফারক্লিত্" (Paracletus/Periclytos) ব্যবহার করার পরিবর্তে 'মুন্‌হামান্না' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর ইবনে ইসহাক অথবা ইবনে হিশাম ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুন্‌হামান্নার অর্থ সুরিয়ানী ভাষায় "মুহাম্মাদ" এবং গ্রীক ভাষায় Periclytos—(ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮)।

এখন লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ফিলিস্তিনের সাধারণ অধিবাসীদের ভাষা খৃস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত সুরিয়ানী ছিল। এ অঞ্চল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইসলামের অধিকৃত অঞ্চলভুক্ত হয়। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃস্টাব্দে এবং ইবনে হিশাম ৮২৮ খৃস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তার অর্থ এই যে, তাঁদের উভয়ের যুগে ফিলিস্তিনের খৃস্টানগণ সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলতো। এ দুই ঐতিহাসিকের জন্যে আপন দেশের খৃস্টান প্রজাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। উপরন্তু যে সময়ে গ্রীক ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ খৃস্টান ইসলামী অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতো। এ জন্যে তাদের এটা জানা মোটেই কঠিন ছিল না যে, সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দের সমার্থবোধক গ্রীক শব্দ কি ছিল। এখন যদি ইবনে ইসহাকের অনুবাদে সুরিয়ানী শব্দ 'মুন্‌হামান্না' ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ইবনে ইসহাক তার ব্যাখ্যায় আরবীতে তার সমার্থবোধক শব্দ "মুহাম্মাদ" এবং গ্রীক ভাষায় Periclytos ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে, হযরত ঈসা (আ) নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নাম নিয়ে তাঁরই আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে এ কথাও জানা যায় যে, গ্রীক ভাষায় যোহন লিখিত ইঞ্জিলে মূল শব্দ Periclytos ব্যবহৃত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে খৃস্টান পণ্ডিতগণ পরিবর্তন করে Paracletus করে ফেলেছেন।

নাজ্জাশী বাদশাহ কর্তৃক সত্যতা স্বীকার

এর চেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস্‌উদ (রা)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণকে যখন নাজ্জাশী তাঁর দরবারে

ডেকে পাঠান এবং হযরত জা'ফর বিন আবু তালিবের নিকটে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষাদীক্ষার কথা শুনতে পান, তখন তিনি বলেন ঃ

"মুবারকবাদ তোমাদের জন্যে এবং সেই সত্তার জন্যে যাঁর কাছ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সুসংবাদ হযরত ঈসা বিন মারইয়াম দিয়েছেন।

এ কাহিনী বিভিন্ন হাদীসে স্বয়ং হযরত জা'ফর এবং হযরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আছে। এর থেকে শুধু এতোটুকুই প্রমাণিত হয় না যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে নাজ্জাশীর এটা জানা ছিল যে, হযরত ঈসা (আ) একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, বরঞ্চ এটাও প্রমাণিত হয় যে, সে নবীর সুস্পষ্ট ইংগিত ইঞ্জিলে রয়েছে যার কারণে নাজ্জাশীর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কষ্ট হয়নি যে, নবী মুহাম্মাদ (সা)-ই সেই নবী। অবশ্যি এ বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় না যে, হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ নাজ্জাশী যোহন লিখিত ইঞ্জিলের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, না জানার অন্য মাধ্যম ছিল।

বার্নাবাস ইঞ্জিলের সুসংবাদ

বার্নাবাস তাঁর ইঞ্জিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন তাতে কোথাও হযরত ঈসা (আ) নবী মুহাম্মাদ (সা) নাম নিয়েছেন, কোথাও 'রসূলুল্লাহ' বলেছেন, কোথাও তাঁর জন্যে মসীহ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোথাও প্রশংসা (Admirable) কোথাও এমন সুস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছেন যা একেবারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমার্থবোধক। তাঁর এসব সুসংবাদ পুরোপুরি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। কারণ, তা এতো অধিক এবং স্থানে স্থানে বিভিন্ন পূর্বাপর প্রসংগ বর্ণনার ভংগীতে বলা হয়েছে যে, তার থেকে একখানা গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করা হলো ঃ[১]

"যেসব নবীকে খোদা দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, তাঁরা দ্ব্যার্থবোধক কথা বলেছেন। কিন্তু আমার পরে সকল নবী ও পুণ্যাত্মাগণের জ্যোতি প্রকাশ লাভ করবে এবং নবীগণের কথার অন্ধকারকে আলোকিত করবে। কারণ সে খোদার রসূল।[২] (অধ্যায় ১৭)

"ফরিসী এবং লাভীগণ (Levites) বললো, আপনি যদি মসীহ্ নন, ইলিয়াস অথবা অন্য কোনো নবীও নন, তাহলে কেন আপনি নতুন শিক্ষা দান করছেন এবং নিজেকে মসীহ থেকেও বেশী করে পেশ করছেন ?"

---

১. বার্নাবাসের ইঞ্জিল (The Gospel of Barnabas) ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন LONSDALE এবং LAUR RAAG এবং তা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ক্লারেণ্ডন প্রেস অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকদের জন্যে উক্ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি ইংরাজী ভাষায় দেয়া হলো- (অনুবাদক)।

২. For all the Prophets, that are one hundred and forty-four thousand, whom God hath sent into the world, have spoken darkly. But after me shall come the Splendour of all the Prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all that the Prohets have said. because he is the Messenger of God-(Chapter 17, Gospal of Barnabas).

যিশু জবাবে বললেন, খোদা আমার হাত দিয়ে যেসব মোজেযা দেখাচ্ছেন তা এ কথাই প্রকাশ করে যে, খোদা যা চান আমি তাই করি। নতুবা প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে তাঁর (মসীহ্) থেকে বড়ো হবার যোগ্য মনে করি না, যার কথা তোমরা বলছো। আমি তো খোদার সেই রসূলের মোজার বন্ধন অথবা জুতার ফিতা খোলার যোগ্য নই, যাকে তোমরা মসীহ্ বল, যাকে আমার পূর্বে তৈরী করা হয়েছে এবং যে আমার পরে আসবে এবং সত্যকথা নিয়ে আসবে যাতে করে তার দ্বীনের কোনো সমাপ্তি না হয়।"

–আয়াত ঃ ৪২।[১]

"আমি নিশ্চয় তার সাথে তোমাদেরকে বলছি যে, আগত প্রত্যেক নবী শুধু একটি মাত্র জাতির জন্যে খোদার রহমতের নিদর্শন হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্যে নবীদের কথা, যাদের জন্যে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে, তাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে পৌঁছে না। কিন্তু খোদার পয়গম্বর যখন আগমন করবেন, খোদা যেন তাঁকে তাঁর আপন হাতের মোহর দান করবেন। তিনি খোদাহীন লোকের উপর শাসন ক্ষমতা নিয়ে আসবেন এবং প্রতিমা পূজার এমনভাবে উচ্ছেদ করবেন যে, শয়তান বিব্রত হয়ে পড়বে। (শিষ্যদের সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের পর) হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সে নবী বনী ইসমাইলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন, বনী ইসহাকের মধ্যে নয়।–অধ্যায় ঃ ৪৩।[২]

"এজন্যে আমি তোমাদেরকে বলি যে, খোদার রাসূল এমন এক দীপ্তি যার দ্বারা খোদার সৃষ্টি প্রায় প্রতিটি বস্তুই সন্তোষ লাভ করবে। কারণ, তিনি বোধশক্তি ও উপদেশ, বিজ্ঞতা ও শক্তি, ভয় ও ভালোবাসা, সতর্কতা ও সংযমের প্রাণশক্তিতে ভূষিত। তিনি দানশীলতা ও দয়া, ইনসাফ ও খোদাভীতি, শালীনতা ও সহনশীলতার প্রাণশক্তিতে মণ্ডিত। খোদা তাঁর যেসব সৃষ্টিকে এ গুণাবলী দান করেছেন, তাদের তুলনায় তিনি তিনগুণ লাভ করেছেন। সে সময়টা কত মুবারক হবে যখন তিনি দুনিয়ায় আগমন করবেন। বিশ্বাস কর যে, আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি। এভাবে সকল নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহ্ দেখামাত্রই খোদা তাঁকে নবুওয়াত দান করেছেন এবং যখন আমি তাঁকে দেখি

---

১. They said : 'If thou be not the Messiah nor Elijah, or any Prophet, wherefore, dost thou preach new doctrine, and make thyself of more account than the Messiah ?

Jesus answered : 'The miracles which God worketh by my hands show that speak that which God willeth ; nor indeed do I make myself to be accounted as him of whom ye speak, for I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the latchets of the shoes of the Messenger of God whom ye call "Messiah," who was made before me, and shall come after me, and shall bring the words of truth, so that his faith shal have no end—(Chapter 42) . the Gospal of Barnabas).

২. Verly I say unto you, that every Prophet when he is come hath borne to one nation only the mark of the mercy of God. And so their words were not extended save to that people to which they were sent. But the messenger of God, when he shall come, God shall give to him as it were the seal of his hand, insomuch that he shall carry salvation and mercy to all the nations of the world that shall receive his doctrine. He shall come with power upon the ungodly, and shall destroy idolatry, insomuch that he shall make Satan confounded .... Believe me, for verily I say to you, that the promise was made in Ishmael, not in Isaac— (Chapter 43— Gospel of Barnabas).

তখন আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। তখন আমি একথা বলি, হে মুহাম্মাদ! খোদা তোমার সাথে থাকুন এবং তোমার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্য তিনি আমাকে করুন। কারণ, এ মর্যাদা যদি আমি লাভ করি তাহলে আমি একজন বড়ো নবী এবং খোদার এক পবিত্র সত্তা হয়ে যাব।"–অধ্যায় ৪৪[১]

"তোমাদের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত করো না এবং ভীত হয়ো না। কারণ আমি তোমাদেরকে পয়দা করিনি। বরঞ্চ খোদাই আমাদের স্রষ্টা এবং তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তারপর আমার কথা, তো আমি এখন সেই খোদার রাসূলের জন্যে পথ সুগম করার জন্যে দুনিয়ায় এসেছি—তিনি দুনিয়ার মুক্তি নিয়ে আসবেন। কিন্তু সাবধান, যেন প্রতারিত না হও। কারণ অনেক মিথ্যা নবী আসবে এবং আমার নাম করে আমার বাইবেল বিকৃত করবে।"

তখন Andrew বললো, ওস্তাদ, তাঁর কিছু নিদর্শন বলুন, যাতে করে তাঁকে আমরা চিনতে পারি।

যিশু বললেন, তিনি তোমাদের যুগে আসবেন না। তোমাদের কয়েক বছর পর তিনি আসবেন, যখন আমার ইঞ্জিল (বাইবেল) এমন বিকৃত হয়ে পড়বে যে, বড়ো জোর ত্রিশজন মুমেন টিকে থাকবে। সে সময়ে খোদা দুনিয়ার উপর দয়া করবেন এবং তাঁর রসূল পাঠাবেন যাঁর উপরে মেঘ ছায়া করবে। যার থেকে তাঁকে খোদার মনোনীত মনে করা হবে এবং তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ায় খোদার পরিচিতি হবে। তিনি খোদাহীন লোকের বিরুদ্ধে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং দুনিয়ায় প্রতিমা পূজার মূলোৎপাটন করবেন। আমার বড়ো আনন্দ লাগে– কারণ তাঁর মাধ্যমে আমাদের খোদাকে চিনতে পারা যাবে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা হবে। আমার সত্যতা দুনিয়ায় জানতে পারবে। যারা আমাকে মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু মনে করবে, তিনি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন.....তিনি এমন সত্যতা নিয়ে আসবেন যা সকল নবীর সত্যতা থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট হবে।-(অধ্যায় ৭২)[২]

---

১. "I therefore say unto you that the Messenger of God is a splendour that shall give gladness to nearly all that God hath made, for he is adorned with the spirit of understanding and of counsel, the spirit of wisdom and might, the spirit of fear and love, the spirit of prudence and temperance, he is adorned with the spirit of charity and mercy, the spirit of justice and piety, the spirit of gentleness and patience, which he haht received from God three times more then he hath given to all his creatures O blessed time, when he shall come to the world! Believe me that I have seen him and have done him reverence, even as every prophet hath seen him : Seeing that of his spirit God giveth to them prophecy. And when I saw him my soul was filled with consolation, saying : "O Mohammed, God be with thee and may He make me worthy to unite thy shoelatchet, for obtaining this I shall be a great Prophet and holy one of God"-(Chapter-44).

২. "Let not your heart be troubled, nether be ye fearful : for I have not created you, but God our creator who hath created you will protect you. As for me, I am now come to the world to prepare the way for the messenger of God, who shall bring salvation to the world. But beware that ye be not deceived for many false Prophets shall come who shall take my words and contaminate my gospel.

"খোদার শপথ জেরুশালেমে সুলায়মানের মসজিদে নেয়া হয়েছিল, অন্য কোথাও নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, এমন এক সময় আসবে যখন খোদা তাঁর রহমত অন্য এক শহরে নাযিল করবেন। তারপর প্রত্যেক স্থানে তাঁর সত্যিকার এবাদত সম্ভব হবে এবং খোদা প্রত্যেক স্থানে তাঁর রহমতে সঠিক নামায কবুল করবেন।"

যিশু বললেন, "আমি প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈল বংশের মুক্তির নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমার পরে মসীহ্ আসবেন তিনি খোদা প্রেরিত সারা দুনিয়ার জন্যে, যাঁর জন্যে খোদা এ সারা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহর এবাদত করা হবে এবং তাঁর রহমত নাযিল হবে।"–(অধ্যায় ৮২)[১]

যিশু বললেন,– "চিরঞ্জীব খোদার কসম, যাঁর মুষ্ঠিতে আমার জীবন, আমি সে মসীহ্ নই যাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছে দুনিয়ার সকল জাতি, খোদা যাঁর সম্পর্কে আমাদের পিতা ইবরাহীমের কাছে এ বলে ওয়াদা করেছিলেন, তোমার বংশের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল জাতি বরকত লাভ করবে।"

কিন্তু খোদা যখন আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন, যখন শয়তান এভাবে বিদ্রোহ করবে যে, ধর্মহীন লোকেরা আমাকে খোদা এবং খোদার পুত্র বলে মানবে। এ কারণে আমার বাণী ও শিক্ষা তারা বিকৃত করবে। এমন কি বহু কষ্টে তখন ত্রিশজন ঈমানদার থাকবে। যে সময়ে খোদা দুনিয়ার উপর দয়া প্রদর্শন করবেন এবং স্বীয় রসূল পাঠাবেন যাঁর জন্যে দুনিয়ার এ যাবতীয় বস্তু তিনি পয়দা করেছেন, যিনি দক্ষিণ দিক থেকে শক্তি সহকারে আগমন করে প্রতিমাসহ্ প্রতিমা পূজারীদের ধ্বংস করবেন। তিনি শয়তানের নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেবেন যা সে মানুষের উপর লাভ করেছে। যারা তাঁর

Then said Andrew Master tell us some sign, that we may know him. Jesus answered : 'He will not come in your time, but will come some years after you, when my gospel shall be annulled, insomuch that there shall be scarcely thirty faithful. At that time God will have mercy on the world, and so he will send his messenger, over shose head will rest a white cloud, whereby he shall be known of noe elect of God, and shall be by him Manifesto to the world. He shall come with great power against the ungodly, and shall destroy idolatory upon the earth. And it rejoiceth me, because that through him our God shall be known of one elect of God, and shall be known and glorifed and I shall he known to be true; and he will execute vegeance against thoes who shall say that I am more than man .... He shall come with truth more clear then that of all the Prophets— (Chapter 72)– The gospel of Barnabas).

১. For the promise of God was made in Jerusalem, in the temple of Solomon, and not elsewhere. But believe me, a time will come that God will give his mercy in another city, and in every place it will be possible to worship Him in truth. And God in every place will have accepted true prayer with mercy ,... I am indeed sent to the house of Israel as Prophet of salvation but after me shall come the Messiah, sent of God to all the world, for whom God hath made the world. And then through all the world will God be worshepped, and mercy received—Chapter 82–The Gospel of Barnabas).

উপরে ঈমান আনবে তাদের জন্যে খোদার রহমত নিয়ে আসবেন। যারা তাঁর কথা মেনে নেবে তাদের জন্যে মুবারকবাদ।"-(অধ্যায়-৯৬)[১]

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলো,-"সেই মসীহকে কি নামে ডাকা হবে এবং কোন্ সব নিদর্শন তাঁর আগমনী ঘোষণা করবে।"

"যিশু জবাবে বলেন, সে মসীহের নাম "প্রশংসনীয়"। কারণ খোদা যখন তাঁর রূহ্ পয়দা করেন, তখন তিনি স্বয়ং এ নাম রেখেছিলেন এবং সেখানে এক স্বর্গীয় মর্যাদায় রেখেছিলেন। খোদা বলেন, হে মুহাম্মদ! অপেক্ষা কর। কারণ তোমারই জন্যে আমি জান্নাত, দুনিয়া এবং অন্যান্য বহু কিছু পয়দা করবো এবং এসব তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করবো। তোমার প্রতি অনুগ্রহ যারা করবে তাদেরকে অনুগৃহীত করা হবে। তোমাকে যারা অভিসম্পাৎ করবে, তারা অভিশপ্ত হবে। তোমাকে যখন দুনিয়ায় পাঠাবো, তখন ত্রাণের নবী হিসেবে পাঠাবো। তোমার কথা সত্য হবে। এমন কি যমীন ও আসমান টিকে থাকবে না কিন্তু তোমার দ্বীন টিকে থাকবে। অতএব তাঁর মুবারক নাম হচ্ছে "মুহাম্মদ।
– (অধ্যায়-৯৭)[২]

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলো, "খোদার ঐ রসূলের পর অন্য নবীও কি আসবেন?" যিশু জবাবে বলেন, "তাঁর পরে খোদার প্রেরিত কোনো সত্য নবী আসবেন না। কিন্তু অনেক মিথ্যা নবী আসবে, যার জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। কারণ শয়তান খোদার সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে তাদেরকে আবির্ভূত করবে এবং তারা আমার বাইবেলের পর্দার অন্তরালে আত্মগোপন করবে।"-(অধ্যায়-৯৭)[৩]

---

১. Jesus answered, "As God liveth in whose presence my soul standeth, I am not the Messiah whom all the tribes of the earth except, even as God promised to our father Abraham, saying, "In thy seed will bless all the tribes of the earth." But when God shall take me away from the world, satan will raise again this accursed sedition, by making the impious believe that I am God and son of God, whence my words and my doctrine shall be contaminated, insomuch that scarcely shall their remain thirty faighful ones; whereupon God, will have mercy upon the world, and will send his Messenger for whom he hath made all things, who shall come from the south with power, and shall destroy the idols with the idolators who shall take away the dominion from Satan which he hath over men. He shall bring with him the mercy of God for salvation of them that shall believe in him, and blessed is he who shall belive his words—(Chapter 96—The Gospel of Barnabas).

২. Then said the priest : "How shall the Messiah be called, and what sign shall peveal his coming?"
Jesus Answered : The name of the Messiah is 'Admirable, for God Himself gave him the name when he had created his soul, and placed it in a celestial splendour. God said "Wait Mohammed; for thy sake I will to create paradise, the world, and a great multitude of creatures, whereof I make thee a present, insomuch that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse thee shall be accursed. When I shall send thee into the world I shall send thee as my messenger of salvation, and thy word shall be true insomuch that heaven and earth shall fail, but thy faith shall never fail." Mohammad is his blessed name, (Chapter 97–The Gospel of Barnabas).

৩. The priest answered, "After the coming of the messenger of God shall other prophets come ?" Jesus answered, "There shall not come after his true prophets sent by God, but there shall come a great number of false Prophets, whereat I sorrow, for satan shall raise them up by the just judgment of God, and they shall hide themselves under the pretext of my gospel"– (Chapter 97– The Gospel of Barnabas).

"যিশু বলেন", জেনে রাখো বার্নাবাস, আমার শিষ্যদের মধ্যেই একজন মাত্র ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে দুশমনের কাছে বিক্রি করবে। আমি নিশ্চিত যে, যে আমাকে বিক্রি করবে, সেই আমার নামে নিহত হবে। কারণ খোদা আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে উঠিয়ে নেবেন এবং সে বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এমনভাবে বদলিয়ে দেবেন যে, প্রত্যেকেই মনে করবে যে সেই আমি। তথাপি যখন সে এ লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করবে, তখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমারই লাঞ্ছনা বর্ণনা করা হবে। কিন্তু যখন খোদার পবিত্র রাসূল মুহাম্মদ আসবেন, তখন আমার বদনাম দূর হবে। খোদা এটা এজন্যে করবেন যে, আমি তাঁর (মুহাম্মদের) সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছি। তিনি আমাকে এভাবে পুরস্কৃত করবেন যে, মানুষ জানতে পারবে যে, আমি জীবিত আছি এবং এ লাঞ্ছনাময় মৃত্যুর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।-(অধ্যায় ১১২)[১]

"বস্তুত আমি তোমাদেরকে বলি যে, যদি মূসার কিতাব থেকে সত্যকে বিকৃত করা না হতো, তাহলে খোদা আমাদের পিতা দাউদকে দ্বিতীয় কেতাব দিতেন না। আর যদি দাউদের কেতাবে বিকৃতি সাধন করা না হতো, তাহলে খোদা আমাকে ইঞ্জিল দিতেন না। কারণ আমাদের খোদা পরিবর্তনশীল নন এবং তিনি সকল মানুষের জন্যে একই পয়গাম দিয়েছেন। অতএব যখন আল্লাহর রসূল আসবেন, খোদাহীন লোকরা আমার কিতাবের যে বিকৃতি করেছে, তা তিনি পরিষ্কার করে দেবেন।"-(অধ্যায় ১২৪)[২]

---

১. "Know O Barnabas ...... and I shall be sold by one of my disciples for thirty pieces of money, Whereupon I am sure that he who shall sell me shall be slain in my name, for that God shall take me up from the earth, and shall change the appearance of the traitor so that every one shall believe him to be me ; nevertheless when he dieth an evil death. I shall abide in that dishonour for a long time in the world. But when Mohammed shall come, the sacred Messenger of God, that infamy shall be taken away. And this shall God do because I have confessed the truth of the Messiah, who shall give me this reward, that I shall he known to be alive and to be a stanger to that death of infamy". (Chapter 112 – The Gospel of Barnabas).

২. "Verily I say unto you that if the truth had not been erased from the book of Moses, God would not have given to David our father the second. And if the book of David had not been contaminated, God would not have committed the Gospel to me; seeing that the Lord our God is unchangeable, and hath spoken but one message to all men. Wherefore, when the Messenger of God shall come, he shall come to cleanse away all wherewith the ungodly have contaminated my book" (Chapter 124—The Gospel of Barnabas).

আরবে খৃস্টবাদ

সংকলকদ্বয় কর্তৃক সংযোজন

[এ শিরোনামায় যখন কিছু উপাদান বা মাল-মসলা জোগাড় করা হলো, তখন এ অভাব অনুভূত হলো যে, আলোচনা শুরু করার জন্যে যেসব বিষয়বস্তুর প্রয়োজন তা নেই। অন্যান্য গ্রন্থকারের রচনাবলী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই এ শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব ছিল। সে সবকে নিম্নে উদ্ধৃতি হিসেবে প্রদত্ত হলো।–[সংকলকদ্বয়]

এক ঃ "খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে খৃস্টধর্ম আরব দেশে প্রবেশ করে যখন প্রাচ্যের গির্জাগুলোতে অনাচার এবং বেদআত (উদ্ভাবিত নতুন মতবাদ) ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন, এ ছিল যু-নওয়াসের যুগ। কিন্তু আমি এর সাথে একমত নই। কারণ তিনি প্রায় ছয়শত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। এ ধর্মের প্রসার নাজরানেই অধিক হয়েছিল। আর আরবে তার বেশী প্রচলন হয়নি। অবশ্যি বনী রাবিয়া, গাস্‌সান গোত্রগুলোর মধ্যে এবং কিছুটা কোযায়ার মধ্যে খৃস্টধর্মের প্রসার হয়েছিল।"–ইবনে খল্‌দুনের ইতিহাসের উর্দু অনুবাদ প্রথম খণ্ড-এর টীকা, আল্লামা হাকীম আহমদ হোসাইন এলাহাবাদী।

দুই ঃ "খৃস্টধর্মের প্রচলন রাবিয়া ও গাস্‌সান এবং কোযায়ার কিছু অংশে হয়েছিল। মনে হয় তারা রোমীয়দের নিকট থেকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে আরববাসী তাদের দেশে প্রায় যাতায়াত করতো। হীরায় আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলো একত্রে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদেরকে 'আব্বাদ' বলা হতো। তাদের মধ্যে আদী বিন যায়েদ আব্বাদীও ছিল। বনু আগলেরও আরবের খৃস্টধর্মাবলম্বী ছিল।"-(বুলুগুল আদবের উর্দু অনুবাদ–পীর মুহাম্মাদ হাসান তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫২।

তিন ঃ "বনু গাস্‌সান ৩৩০ খৃস্টাব্দে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। তারপর ইরান, আরব, বাহ্‌রাইন, ফারান মরুভূমি, দুমাতুল জান্দাল্‌ এবং ফোরাত ও দাজলার উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে এ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। এ ধর্ম প্রচারের জন্যে নাজ্জাশী এবং কায়সার সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেন। ৩৯৫ খৃস্টাব্দ থেকে ৫১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ ধর্ম প্রচারে বিশেষ জোর দেয়া হয় এবং ইয়ামেনে বহুসংখ্যক ইঞ্জিল গ্রন্থ ছড়িয়ে পড়ে।"

–রাহমাতুল্‌লিল্‌ আলামীন প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১ টীকা।

চার ঃ তাবাবেয়ার পূর্বে সাবার সকল শ্রেণী নক্ষত্র পূজারী ছিল। তাদের সর্ববৃহৎ দেবতা ছিল 'শাম্‌স' এবং "আল্‌ মাক্কা"। হেমইয়ারী ভাষায় চাঁদকে "আল্‌ মাক্কা" বলে।

৩৩০ খৃস্টাব্দে ইয়ামেনের পেছনে আফ্রিকার উপকূলে মিসরী রোমীয়দের প্রভাবে খৃস্টবাদ উপদ্রব সৃষ্টি করে। সিরিয়ার রোমীয়দের সাহায্যে ইয়ামেন প্রান্তে নাজরান শহর খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। চার পাশের প্রভাবে ইয়ামেনের তাবাবেয়াও খৃস্টবাদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

নক্ষত্র পূজা বন্ধ হলেও তাদের মূর্তি অপসারিত হয়নি। এখন 'শামস্', 'আল মাক্কা' এবং 'আশ্তার'-এর পাশে পাশে 'রহমানের' নামও দেখা যেতে লাগলো, যে নাম প্রাক ইসলাম যুগে ইহুদী-নাসারাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

পাঁচ ঃ এ অঞ্চলে ইহুদী ও খৃস্টধর্ম এ দুটিই সভ্য এবং ঐশী ধর্ম ছিল। তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জানতে পারা গেছে যে, রোমীয় এবং হাবশীদের সাথে হেমইয়ারের সাবা জাতির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলতো। এজন্যে হেমইয়ারের তাবাবেয়া খৃস্টধর্মের চেয়ে ইহুদী ধর্মকে প্রাধান্য দিত। আবদে কালীল ছাড়া আর কোনো তোব্বা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরবদের বর্ণনামতে আবদে কালীলও খৃস্টধর্মাবলম্বী ছিল। একটি প্রস্তরলিপি থেকেও তাদের খৃস্টান হওয়া প্রমাণিত হয়। অবশিষ্ট তাবাবেয়ার মধ্যে অল্প সংখ্যক নক্ষত্র পূজক এবং অধিকসংখ্যক ইহুদী ছিল। তাবারীর ইতিহাস বলে যে, সকলের আগে আসয়াদ আবু কারব (ابو كرب) ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। রাজকীয় ধর্ম প্রজাসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ইয়ামেনে ইহুদী ও খৃস্টধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।

ছয় ঃ রোমীয়গণ সামুদ্রিক পথ তৈরী করে সাবার বাজার মন্দা করে দেয়। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে খৃস্টপূর্ব ২০ সালে তারা ইয়ামেন আক্রমণ করে। হাবশী একসুমী, যে প্রথমে রোমীয় মিসরীয়দের মতো একই দেশে জন্মগ্রহণ করে এবং পরে একই ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়ে, রোমীয়দের উত্তেজনা সৃষ্টিতে বার বার বিরক্ত প্রকাশ করতো। হেমইয়ার সুযোগ ছেড়ে দিত না। সুযোগ পেলেই সমুদ্রে রোমীয় বণিকদের লুণ্ঠন করতো। উত্তর আরবে ইরান ও রোম পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ইরানীদের সাথে হেমইয়ারের সহানুভূতি হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

রোমীয়গণ সন্ধির দ্বারা এ দ্বন্দ্ব শেষ করতে চাইলো। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমের কায়সার জাস্টি নাইস্ ইয়ামেনে তোব্বা সমীপে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। .... রাষ্ট্রদূত কায়সারের পত্র এবং অন্যান্য উপঢৌকন পেশ করেন। .... এ সন্ধি প্রস্তাব বিদ্বেষাগ্নি নির্বাপিত করতে পারেনি। সে সময়ে যু-নোয়াস শাসক ছিল।

সাত ঃ রোমীয় বণিকগণ ইয়েমেনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসার পণ্যদ্রব্যসহ পৌঁছতো এবং যে দিক দিয়ে তারা অতিক্রম করতো পণ্যদ্রব্যের সাথে খৃস্টধর্মের সওগাতও বিতরণ করতো। খৃস্টান পাদ্রীও বিশেষ উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করতো। প্রথমে আদনে এবং তারপর আদনানে, যেখানে আগে বৃক্ষ পূজা হতো, খৃস্টধর্ম ফুলেফলে সুশোভিত হলো। ইউরোপের যা কলাকৌশল আজ দেখা যাচ্ছে, তা অতীতেও ছিল। ব্যবসার আড়ালে সর্বদাই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল করা হয়েছে। সে কালেও এ ব্যবসার আড়ালে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল করা হয়েছে। এসব কলাকৌশলের দ্বারা ইয়ামেনে নাজরান খৃস্টধর্মের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ রোমীয় ও হাবশীদের এটি হয়ে পড়েছিল আশা-ভরসার স্থল। হেমইয়ারী ইহুদীরা তা দেখে ক্রোধে জ্বলতো।

আসহাবে উখদুদের কাহিনী

(গ্রন্থকারের নিজের লেখা এখান থেকে শুরু হচ্ছে)

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে ঈমানদারদের নিক্ষেপ করার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। তাতে জানা যায় যে, দুনিয়ায় বহুবার এ ধরনের পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

হযরত সুহাইব রোমী (রা)-এর বর্ণনা

এসবের মধ্যে একটি ঘটনা হযরত সুহাইব রোমী (রা) নবী (সা)-এর নিকটে বর্ণনা করেন তা এই যে, এক বাদশাহর এক যাদুকর ছিল। সে তার বার্ধক্যে বাদশাহকে বললো, এমন একটি বালক আমাকে দিন, যে আমার নিকটে যাদু শিক্ষা করবে। বাদশাহ একটি বালককে এ কাজে লাগিয়ে দিল। বালকটি যাদুকরের নিকটে যাতায়াতকালে একজন পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকে এবং সম্ভবত সে পাদ্রী ছিল হযরত মসীহ (আ)-এর অনুসারী। পাদ্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে বালকটি ঈমান আনে। তারপর পাদ্রীর তরবিয়ত লাভ করে সে কারামাতের (অলৌকিক শক্তির) অধিকারী হয়। তার দ্বারা অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ এবং কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকে। বাদশাহ যখন জানতে পারলো যে, বালকটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, তখন সে প্রথমে পাদ্রীকে হত্যা করে এবং তারপর বালককে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোনো যন্ত্র দ্বারাই তাকে হত্যা করা সম্ভব হলো না। অবশেষে বালকটি বললো, "যদি আপনি আমাকে কতল করতে চান তাহলে জনসমাবেশে 'এ বালকের রবের নামে'—একথা বলে তীর নিক্ষেপ করুন।"

বাদশাহ এভাবে বালকটিকে হত্যা করলো। এ ঘটনার পর জনতা সমস্বরে বললো, আমরা এ বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম। বাদশাহের পারিষদগণ বললো, এ তো তাই হলো যার থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। মানুষ আপনার দ্বীন পরিত্যাগ করে ঐ বালকের দ্বীন গ্রহণ করেছে। বাদশাহ এ অবস্থা দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর সে রাজপথের ধারে গর্ত খনন করালো এবং তা জ্বলন্ত অগ্নিতে পূর্ণ করলো। তারপর যে ব্যক্তিই ঈমান পরিত্যাগ করতে রাজী হলো না তাকে আগুনে ফেলে দেয়া হলো— (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযি, ইবনে জারীর, আবদুর রায্যাক, ইবনে আবি শায়বা, তাবারানী আবদ বিন হুমাইদ)।

হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা

দ্বিতীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন হযরত আলী (রা)। তিনি বলেন, ইরানের এক বাদশাহ মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে আপন ভগ্নির সাথে ব্যভিচার করে। ফলে তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে বাদশাহ ঘোষণা করে যে, খোদা ভগ্নির সাথে বিবাহ হালাল করে দিয়েছেন। লোকে সে কথা মানলো না, বাদশাহ তখন বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দ্বারা জনগণকে একথা মেনে নিতে বাধ্য করে। যারা এ কথা মানতে অস্বীকার করলো, তাদেরকে অগ্নিময় গর্তে নিক্ষেপ করা হতে থাকলো। হযরত আলী (রা) বলেন, তখন থেকে মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) মধ্যে মুহাররাম নারীদের বিয়ে করার প্রচলন শুরু হয়।—ইবনে জারীর

ইসরাঈলী বর্ণনা

তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস (রা)। সম্ভবত তিনি এ ঘটনা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, বেবিলনবাসী বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আ)-এর দ্বীন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। যারা এ দ্বীন পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাদেরকে তারা অগ্নিপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করে।−ইবনে জারীর, আবদ বিন হুমাইদ।

নাজরানের ঘটনা

নাজরানের ঘটনাটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে খালদুন, মুয়া'যামুল বুলদান গ্রন্থ প্রণেতা প্রমুখ ইসলামী ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তার সারকথা এই যে, হেমইয়ারের (ইয়েমেন) বাদশাহ তুব্বান আসয়াদ আবু কারব একবার ইয়াসরেব গমন করে এবং ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর বনী কুরায়যার দুজন আলেমকে ইয়ামেনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপক আকারে ইহুদী ধর্ম প্রচার করে। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র যু-নোয়াস তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে দক্ষিণ আরবে খৃস্টানদের মজবুত দুর্গ নাজরান আক্রমণ করে যাতে করে সেখান থেকে খৃস্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করে অধিবাসীদেরকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যায়। [ইবনে হিশাম বলেন এসব লোক হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত দ্বীনের অনুসারী ছিল]। সে নাজরান পৌঁছে জনগণকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। তখন বহু সংখ্যক লোককে অগ্নিপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে মারা হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে নিহত করা হয়। মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়। নাজরানবাসীর মধ্যে যু-সা'লাবান নামে এক ব্যক্তি পালিয়ে যায়। একটি বর্ণনাতে বলা হয় যে, সে রোমের কায়সারের নিকটে এবং অন্য বর্ণনামতে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকটে গিয়ে এ অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করে। প্রথম বর্ণনামতে কায়সার নাজ্জাশীকে জানিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় বর্ণনামতে নাজ্জাশী একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবার জন্যে কায়সারকে অনুরোধ জানায়। যা হোক অবশেষে আরইয়াত নামক একজন অধিনায়কের অধীন আবিসিনিয়ার সত্তর হাজার সৈন্য ইয়ামেন আক্রমণ করে। যু-নোয়াস নিহত হয়। ইহুদী রাষ্ট্রের অবসান ঘটে এবং ইয়ামেন আবিসিনিয়ার খৃস্টান রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়।

ইয়ামেনে খৃস্টান মিশনারী

ইসলামী ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রে শুধু সত্যায়িতই হয় না বরঞ্চ তার থেকে অনেক বিশদ বিবরণ জানা যায়। ইয়ামেনের উপর খৃস্টান হাবশীদের সর্বপ্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৪ খৃস্টাব্দে এবং তা অক্ষুণ্ন থাকে ৩৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। সে সময় থেকে খৃস্টান মিশনারী ইয়ামেনে প্রবেশ করতে থাকে। তখনকার নিকটবর্তী যুগে ফেমিয়ুন (Faymiyun) নামে একজন খোদাভীরু আবেদ এবং কাশ্‌ফ্‌-কারামাতের অধিকারী খৃস্টান পরিব্রাজক নাজরান আগমন করেন। মূর্তিপূজা যে কত খারাপ একথা তিনি সেখানকার লোকজনকে বুঝিয়ে দেন। তাঁর এ প্রচারণায় নাজরানবাসী খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাদের শাসনব্যবস্থা তিন প্রধান চালাতো। একজন উপজাতীয় দলপতিদের ন্যায় শক্তিশালী প্রধান। বৈদেশিক বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকতো। দ্বিতীয়জন সংরক্ষক, যে আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির দেখাশুনা করতো। তৃতীয়জন ছিল উস্‌কুফ্‌ বা বিশ্‌প, তার কাজ ছিল ধর্মীয় নেতৃত্ব দান করা।

দক্ষিণ আরবে নাজরান অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। এটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। তসর, চামড়া এবং অস্ত্রের কারখানা এখানে ছিল। প্রসিদ্ধ ইয়ামেনী হোল্লা (পোশাক) এখানে তৈরি হতো। এজন্যে শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, বরঞ্চ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও যু-নোয়াস এ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রমণ করে। সে নাজরানের প্রধান ব্যক্তি হারেসাকে (সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণের মতে Arethas) হত্যা করে। তার স্ত্রী রুমার সামনে তার দু' কন্যাকে হত্যা করা হয় এবং তাদের রক্ত পান করতে তাকে বাধ্য করা হয়। তারপর তাকেও হত্যা করা হয়। উস্‌কুফ্‌ পলের হাড় কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অগ্নিপূর্ণ গর্তে নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, পাদ্রী-পুরোহিত সকলকে নিক্ষেপ করা হয়। মোট বিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক নিহত হয় বলে বর্ণনা করা হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৫২৩ খৃস্টাব্দে এবং ৫২৫ খৃস্টাব্দে হাবশীগণ ইয়ামেন আক্রমণ করে যু-নোয়াসকে হত্যা করে ও তার হেমইয়ারী রাজ্যের অবসান ঘটায়। এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক ইয়ামেনে আবিষ্কৃত হিস্‌নে গোরাবের শিলালিপি থেকে।

আসহাবে উখদুদ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা ও প্রবন্ধাদিতে আসহাবে উখদূদের এ ঘটনার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে কিছু ঘটনা ঐ কালেরই লেখা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনে লেখা। এদের মধ্যে তিনজন গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন এ ঘটনার সমসাময়িক। একজনের নাম প্রকোপিউম্‌ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি Cosmos Indico-Pleustis। সে নাজ্জাশী Elesboan-এর নির্দেশে বাত্‌লিমুসের গ্রীক গ্রন্থাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করতো এবং আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী শহর Adolis এ বসবাস করতো। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল উইহান্নাস্‌ মালালা (Johannes Malala)। তার থেকে পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তারপর Johannes of Ephesus (মৃত্যু ৫৮৫ খৃঃ) তার লিখিত গির্জার ইতিহাসে নাজরানবাসী খৃস্টানদের নির্যাতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক বর্ণনাকারী বিশ্‌প্‌ Simeon-এর একখানা পত্র থেকে এ ঘটনা তিনি উদ্ধৃত করেছে। এ পত্র লেখা হয়েছিল Abbot Von Gabula-এর নামে। Simeon তাঁর পত্রে এ ঘটনা ইয়ামেনবাসীর চোখে দেখা বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ পত্রটি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃস্টাব্দে রোম থেকে এবং ১৮৯০ খৃস্টাব্দে খৃস্টান শহীদানের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে প্রকাশিত হয়। Patriarch Dionysius এবং Zacharia of Mitylene তাঁদের সুরিয়ানী ইতিহাসেও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। Edessa-এর উস্‌কুফ্‌ Pulus নাজরানে নিহতদের শোকসূচক কবিতা বা মর্সিয়া লিখেছেন যা আজও পাওয়া যায়। সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'আল হিম্‌ইয়ারে' এবং ইংরাজী অনুবাদ Book of Himyarites ১৯২৪ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে। বৃটিশ যাদুঘরে ঐ যুগের এবং তার নিকটবর্তী যুগের কিছু হাবশী হস্তলিপি বিদ্যমান আছে যার থেকে এ কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। ফিল্‌বী তাঁর ভ্রমণকাহিনী Arabian Highlands-এ লিখেছেন যে, নাযরানের যে স্থানে আস্‌হাবে উখ্‌দূদের ঘটনা সংঘটিত হয় তা আজ পর্যন্ত লোকের নিকটে সুবিদিত। উম্মে খারকের নিকটে একস্থানে পাথরে খোদাই করা কিছু ছবি পাওয়া যায় এবং যে স্থানে নাজরানের কাবা[১] অবস্থিত ছিল তা বর্তমান কালের নাজরানবাসী জানে।

---

১. তার নামই তারা কাবা রেখেছিল এবং তা নাজরানের কাবা নামে অভিহিত ছিল।-গ্রন্থকার

কা'বার আকৃতিতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ

হাবশী খৃস্টানগণ নাজরান অধিকার করার পর সেখানে কা'বার আকৃতিতে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে। তাকে তারা মক্কায় অবস্থিত কা'বা ঘরের স্থলে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। তার পুরোহিতগণ পাগড়ী বাঁধতো এবং একে তারা হেরেম বলে গণ্য করতো। রোম সাম্রাজ্য থেকে এ কা'বার জন্যে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হতো। এ নাজরানের কা'বায় পাদ্রীগণ তাদের প্রধান বিশপ প্রভৃতির নেতৃত্বে তর্ক-বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দরবারে হাজির হয় এবং মুবাহেলার সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে যা সূরা আলে ইমরানের ৬১ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৭৪]

ইয়ামেনে খৃস্টানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

নাজরানে ইয়ামেনের ইহুদী শাসক যু-নোয়াস মসীহ (আ)-এর অনুসারীদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল তার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ার খৃস্টান সরকার ইয়ামেন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটায় এবং ৫২৫ খৃস্টাব্দে এ গোটা অঞ্চলের উপরে হাবশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কিছু হয়েছিল কন্সস্ট্যান্টিনোপলের রোমীয় সরকার এবং আবিসিনিয়া সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায়। কারণ হাবশীদের নিকটে সে সময়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক রণতরী ছিল না। রোমীয়গণ রণতরী সরবরাহ করে এবং হাবশীগণ সে রণতরীর সাহায্যে সত্তর হাজার সৈন্যসহ ইয়ামেন উপকূলে অবতরণ করে। প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যেসব কিছু নিছক ধর্মীয় প্রেরণার ফলশ্রুতি নয়। বরঞ্চ এসবের পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। আর এটাই তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উৎপীড়িত খৃস্টানদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ একটা বাহানা ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না। রোম সাম্রাজ্য যে দিন থেকে মিসর ও সিরিয়ার উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, সে দিন থেকেই তার প্রচেষ্টা এ ছিল যে, পূর্ব আফ্রিকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ এবং রোম সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর আরবগণ কয়েক শতাব্দী যাবত একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছিল, তা আরবদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের হাতে গ্রহণ করবে। ফলে তার পুরোপুরি মুনাফা সে ভোগ করতে পারবে এবং আরব ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতা বিনষ্ট হবে। এ উদ্দেশ্যে খৃস্টপূর্ব ২৪ অথবা ২৫ সালে কায়সার অগাস্টাস্ জেনারেল আলিয়াস গালুস (Aelius Gallus)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট রণতরী আরবের পশ্চিম উপকূলে প্রেরণ করে, যাতে করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে স্থল ভাগ রয়েছে তা আপন অধিকারভুক্ত করতে পারে। কিন্তু আরবের কঠিন ভৌগলিক অবস্থা এ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। অতপর রোমীয়গণ তাদের রণতরী লোহিত সাগরে স্থাপন করে, যার ফলে আরবদের সমুদ্র পথে যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র স্থল পথেই তাদের ব্যবসার সুযোগ রয়ে গেল। এ স্থল পথও অধিকার করার জন্যে তারা আবিসিনিয়ার খৃস্টান সরকারের সাথে জোট গঠন করে এবং রণতরী দিয়ে তাদেরকে ইয়ামেন অধিকার করতে সাহায্য করে।

আবরাহা কিভাবে ইয়ামেনের শাসক হলো

ইয়ামেনে যে হাবশী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায় সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, আক্রমণ অভিযান দুজন অধিনায়কের নেতৃত্বে

হয়েছিল। একজন আরইয়াত এবং অপরজন আবরাহা। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, এ উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহা পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং আরইয়াত নিহত হয়। আবরাহা দেশের উপর শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়। অতপর সে নিজেকে ইয়ামেনে আবিসিনিয়া সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত করার জন্যে সম্রাটকে রাজী করে। পক্ষান্তরে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইয়ামেন বিজয়ের পর হাবশীরা যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ইয়েমেনী সরদারদেরকে একে একে হত্যা করা শুরু করে, তখন জনৈক সরদার (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম Esymphaesus বলেছেন) হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে কর দিতে রাজী হয় এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট থেকে তার জন্যে ইয়ামেনের গভর্নর পদের নিয়োগপত্র লাভ করে। কিন্তু হাবশী সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার স্থলে আবরাহাকে গভর্নর বানিয়ে দেয়। এ ব্যক্তি ছিল আবিসিনিয়ার বন্দর উদুলিসের জনৈক গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। ইয়েমেন আক্রমণকারী হাবশী সেনাবাহিনীতে সে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তাকে দমন করার জন্যে আবিসিনিয়া সম্রাট যে সেনাবাহিনীই পাঠায়, তারা হয় তার সাথে মিলিত হয় অথবা পরাজিত হয়। অবশেষে আবিসিনিয়া সম্রাটের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত আবরাহাকে ইয়ামেনে তার প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরামিস্ (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ আবরাহাম (Abraham) বলে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত হাবশী উচ্চারণ, আরবীতে তার উচ্চারণ ইবরাহীম।

ক্রমশ এ ব্যক্তি (আবরাহা) ইয়েমেনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে পড়ে। কিন্তু আবিসিনিয়া সম্রাটের নামমাত্র আধিপত্য স্বীকার করে। সে নিজেকে সম্রাটের প্রতিনিধি বলে প্রকাশ করতো। সে যে কতখানি তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার অনুমান এ ঘটনা থেকে করা যায় যে, যখন সে মারেব প্রাচীর মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার পর এক বিরাট উৎসব পালন করে, তখন সে উৎসবে রোম সম্রাট, ইরান সম্রাট, হীরার শাসক, গাস্সানের শাসক প্রভৃতির রাষ্ট্রদূতগণ যোগদান করে। তার বিবরণ মারের প্রাচীরে স্থাপিত শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এ শিলালিপি এখনও বিদ্যমান এবং গ্লেজার (Glaser) তা উদ্ধৃত করেছেন।

আরববাসীদের উপর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযান

ইয়ামেনে শাসনক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করার পর আবরাহা সে উদ্দেশ্যেই কাজ শুরু করে যা এ অভিযানের সূচনা থেকেই রোম সাম্রাজ্য এবং তার মিত্র হাবশী খৃস্টানদের অভিপ্রেত ছিল। অর্থাৎ একদিকে আরবে খৃস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং অন্য দিকে ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তগত করা যা প্রাচ্যের দেশগুলো এবং রোমীয় অধিকারভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আরবদের মাধ্যমে চলতো। এ প্রয়োজন তীব্র হয়ে পড়ে এ কারণে যে, ইরানের সাসানী রাজ্যের সাথে রোমের ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ফলে প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে রোমীয়দের সকল বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্যে আবরাহা ইয়ামেনের রাজধানী সান্‌আতে এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ তাকে আল-কালিস্‌, আল্‌-কুলাইস্‌ অথবা আল্‌-কুলাইয়াস্‌ নামে অভিহিত করেছেন। এ হচ্ছে গ্রীক শব্দ Ekklesia/Ecclesia-এর আরবী উচ্চারণ। উর্দু কালিসা, গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সে আবিসিনিয়া সম্রাটকে জানিয়ে দেয় যে, আরবদের হজ্ব কাবা থেকে এ গির্জার দিকে ঘুরিয়ে না দিয়ে সে ছাড়বে না।[১] ইবনে কাসীর বলেন, আবরাহা ইয়ামেনে তার অভিলাষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এবং তা জনসাধারণ্যে প্রচার করে। তার এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল আরবদেরকে ক্রুদ্ধ করে তোলা, যাতে করে তারা এমন কিছু করে বসে, যাকে বাহানা করে মক্কা আক্রমণ করে কা'বাঘর ধ্বংস করে দেয়া যাবে। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, তার এ ধরনের ঘোষণার পর একজন আরব কোনো প্রকারে তার গির্জার মধ্যে প্রবেশ করে মলমূত্র ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজ একজন কুরাইশী করে। মুকাতিল বিন সুলায়মান বলেন, কুরাইশদের কতিপয় যুবক গিয়ে গির্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কারণ আবরাহার এ ধরনের ঘোষণা তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে এ অবস্থায় কোনো আরব, কোনো কুরাইশী অথবা কতিপয় যুবকের উত্তেজিত হয়ে গির্জা অপবিত্র করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া অবোধগম্য ছিল না। আবার এমন হওয়াটাও অসম্ভব নয় যে, আবরাহা নিজে কোনো লোককে দিয়ে গোপনে এ কাজ করিয়েছে যাতে করে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি হয়। এভাবে সে কুরাইশদেরকে ধ্বংস করে এবং সমস্ত আরববাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তার উভয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চেয়েছিল। যা হোক, উভয় ঘটনার মধ্যে যে কোনোটাই হোক না কেন, যখন আবরাহা জানতে পারলো যে, কা'বার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তার গির্জার অবমাননা করেছে, তখন সে শপথ করে যে, যতোক্ষণ সে কা'বা ধূলিসাত না করেছে ততোক্ষণ সে নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না।

মক্কার উপর আবরাহার আগ্রাসন

তারপর সে ৫৭০ অথবা ৫৭১ খৃস্টাব্দে ষাট হাজার সৈন্য, একত্রিশটি হাতি (মতান্তরে নয়টি হাতি) সহ মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে প্রথমে ইয়ামেনের যু-নফর নামক

---

১. ইয়ামেনের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের পর খৃস্টানদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা এ ছিল যে, তারা কাবার মুকাবিলায় এক দ্বিতীয় কা'বা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তা আরবদের কেন্দ্রীয় স্থল বানাবে। অবশ্যি তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করে যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে।—গ্রন্থকার

এক সরদার আরবদের একটা সেনাবাহিনী নিয়ে বাধা দান করে। কিন্তু পরাজিত হয়ে গ্রেফতার হয়। অতপর খাশ্‌য়াম অঞ্চলে নুফাইল বিন হাবীব খাশ্‌য়ামী নামক একজন আরব সরদার তার গোত্রীয় লোকজনসহ মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সেও পরাজিত হয় এবং গ্রেফতার হয়। সে তার জীবন রক্ষার জন্যে পথ দেখাবার কাজ করতে রাজী হয়। তারা যখন তায়েফের নিকটে পৌঁছে তখন বনী সাকীফ্ মনে করলো যে, এ বিরাট বাহিনীর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের আশংকা হলো যে, কি জানি তারা তাদের লাত মন্দির ধ্বংস করে না দেয়। অতএব তাদের সরদার মাস্‌উদ একটি প্রতিনিধি দলসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, আপনি যে মন্দির ধ্বংস করতে এসেছেন সে তো এটা নয়, তা মক্কায়। আপনি এ মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্যে আপনাকে প্রহরী স্বরূপ লোক (Escort) দিচ্ছি। আবরাহা তাদের কথা মেনে নেয়। তখন বনী সাকীফ আবু রেগাল নামে এক ব্যক্তিকে আবরাহার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা তিন ক্রোস দূরে থাকতে মুগাম্মাস বা মুগাম্মেস্ নামক স্থানে আবু রেগাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরববাসী বহুকাল ধরে তার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা বছরের পর বছর ধরে বনী সাকীককে ভর্ৎসনা করতে থাকে। কারণ তারা লাত মন্দির রক্ষা করার জন্য মক্কা আক্রমণকারীদের সাহায্য করে।

মক্কাবাসীদের প্রতিক্রিয়া

ইবনে ইসহাক বলেন, আবরাহা মুগাম্মাস থেকে তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বলে। তারা তেহামাবাসী এবং কুরাইশদের বহু গৃহপালিত পশু লুট করে। তার মধ্যে নবী (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালেবের দুশ' উট ছিল। তারপর আবরাহা তার একজন প্রতিনিধি মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। তার মাধ্যমে সে এ কথা বলে, আমি তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। কা'বার ঐ ঘর ধ্বংস করতে এসেছি। তোমরা যদি লড়াই না কর, তাহলে তোমাদের জান-মালে হাত দিব না।

সে তার প্রতিনিধির দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, মক্কাবাসীর কিছু বলার থাকলে যেন তাদের সরদারকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তৎকালে মক্কার শ্রেষ্ঠ সরদার ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। আবরাহার প্রতিনিধি তাঁর সাথে দেখা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আবরাহার সাথে লড়াই করার শক্তি আমাদের নেই। এ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। প্রতিনিধি বললো, আপনি আমার সাথে আবরাহার নিকটে চলুন। তিনি রাজী হলেন এবং তার সাথে রওয়ানা হলেন।

আবদুল মুত্তালিব এতটা আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন যে, আবরাহা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলো এবং তার আসন থেকে উঠে তাঁর কাছে এসে বললো, আপনি কি চান ? তিনি বললেন, আমার যে উটগুলো ধরে এনেছেন তা আমাকে ফেরত দিন। আবরাহা বললো, আপনাকে দেখে তো আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি উট ফেরত পাওয়ার দাবী জানালেন অথচ যে ঘরটি আপনাদের এবং আপনাদের পূর্বপুরুষদের দ্বীনের আশ্রয়স্থল তার সম্পর্কে কিছুই বললেন না। এতে করে আমার কাছে আপনার মর্যাদা কমে গেল। তিনি বললেন, আমি তো শুধু আমার উটের মালিক এবং তার জন্যেই আপনার

কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তারপর এ ঘরের কথা বলছেন ? তো এ ঘরের একজন প্রভু আছেন, তিনি স্বয়ং তার হেফাযত করবেন। আবরাহা বললো, সে আমার আক্রমণ থেকে তার ঘরকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনি জানেন এবং তিনি জানেন। এ কথা বলে তিনি উঠে পড়লো, আবরাহা তাঁর উটগুলো তাঁকে ফেরত দিল।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা ভিন্নরূপ। তাতে উট দাবী করার কোনো উল্লেখ নেই। আবদ বিন হুমাইদ, ইবনুল মুন্‌যের, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নাঈম এবং বায়হাকী তাঁর থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, যখন আবরাহা আসসেফাহ্‌ নামক স্থানে পৌঁছলো এবং এ স্থানটি ছিল আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মাঝখানে হারাম সীমার নিকটে অবস্থিত, তখন আবদুল মুত্তালিব স্বয়ং তার কাছে গিয়ে বলেন, এখান পর্যন্ত আসার আপনার কি প্রয়োজন ছিল ? আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাদেরকে জানাতেন, আমরা তা আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতাম। সে বললো, আমি শুনেছি এ ঘরটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি তার নিরাপত্তা শেষ করে দিতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি এ ঘরের উপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেননি। আবরাহা বললো, আমরা তাকে ধূলিসাত না করে ছাড়বো না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনি যা চান, আমাদের থেকে নিন এবং ফিরে যান। কিন্তু আবরাহা তা মানলো না এবং আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে ফেলে তার সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিল।

এ দুটি বর্ণনার গরমিল যদি তার আপন জায়গায় থাকতে দিই এবং কোনোটার উপরে কোনোটার প্রাধান্য না দিই, তাহলে এর থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, এমন বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কা'বাঘর রক্ষা করার শক্তি মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলোর ছিল না। অতএব বুঝতে পারা যায় যে, কুরাইশগণ তার প্রতিরোধের কোনো চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদী গোত্রগুলো সমেত মাত্র দশ বারো হাজার লোক সংগ্রহ করতে পেরেছিল। তারা ষাট হাজার সৈন্যের মুকাবেলা কিভাবে করবে ?

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সেনাবাহিনীর স্থান থেকে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে আপন আপন বাল-বাচ্চাসহ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বলেন, যেন তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে না পারে। তারপর তিনি এবং কয়েকজন কুরাইশ সরদার মিলে হারামে হাজির হন এবং কা'বার দরজার শিকল ধরে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তার খাদেমদেরকে রক্ষা করেন। তখন কাবার মধ্যে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল। কিন্তু এ চরম মুহূর্তে তারা তাদেরকে ভুলে গেল এবং শুধুমাত্র আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্যে হাত উঠালো। তাদের যেসব দোয়া ইতিহাসে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়নি। ইবনে হিশাম আবদুল মুত্তালিবের জীবন চরিত থেকে যেসব কবিতা নকল করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

لاهم ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك

"হে আল্লাহ ! বান্দাহ নিজের ঘরের হেফাজত করে, তুমিও তোমার ঘরের হেফাযত কর।"

لايغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

"কাল তাদের ক্রুসেড্ ও কলাকৌশল তোমার কলাকৌশলের উপর যেন বিজয়ী না হয়।"

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك

"যদি তুমি তাদেরকে ও আমাদের কেবলাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাও, তাহলে তুমি যা চাও তাই কর।"

সুহায়লী 'রাওদুল আন্‌ফে' এ সম্পর্কে একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك

"ক্রুসেডের বংশধর ও তার পূজারীদের মুকাবিলায় তুমি আজ নিজের বংশধরের সাহায্য কর।"

ইবনে জারীর আবদুল মুত্তালিবের নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত করেন যা তিনি (আবদুল মুত্তালিব) দোয়া করার সময় পড়েছিলেন ঃ

يارب لاارجولهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا

"হে আমার আল্লাহ! তুমি ছাড়া তাদের মুকাবিলায় আমি অন্য কারো উপর আশা পোষণ করি না। হে আল্লাহ, তাদের থেকে তোমার হারামকে রক্ষা কর।"

ان عدوا البيت من عاداك امنعهم ان يخر بوا قراكا

"এ ঘরের দুশমন তোমার দুশমন। আপন বস্তি ধ্বংস করা থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ কর।"

কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আল্লাহর মোজেযা

উপরের দোয়াগুলো করে আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথী পাহাড়ের উপর চলে যান। পরদিন আবরাহা মক্কা প্রবেশের জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু মাহমুদ নামক তার যে বিশেষ হাতি সকলের সামনে চলছিল সে হঠাৎ বসে পড়লো, তাকে খুব মারপিট করা হলো, চোখে পিঠে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করা হলো। কিন্তু সে মোটেই নড়লো না। তাকে পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে চালাতে গেলে দৌড়ে চলে। কিন্তু মক্কার দিকে চালাতে গেলে বসে পড়ে এবং কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে চায় না। ইতিমধ্যে ঠোঁটে এবং পায়ে ছোট ছোট পাথর নিয়ে লোহিত সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আবরাহার সেনাবাহিনীর উপর তা ছুঁড়ে মারতে থাকে। এ পাথর যার উপরেই পড়তো তার শরীর গলে যেতো। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এবং ইকরিমা বলেন, যার উপরেই পাথর পড়তো, তার গা চুলকাতে শুরু করতো। যে স্থান চুলকানো হতো তা কেটে গোশ্‌ত পড়ে যেতো। ইবনে আব্বাসের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, গোশত এবং রক্ত পানির মতো বয়ে পড়তো এবং হাড় বেরিয়ে আসতো। আবরাহার নিজের অবস্থাও তাই হয়েছিল। তার শরীরের গোশ্‌ত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়তে থাকে। যেখান থেকেই কোনো খণ্ড পড়ে যেতো সেখান থেকে পুঁজ এবং রক্ত পড়তো। এ হুলস্থুল ও

বিশৃংখলার মধ্যে তারা ইয়েমেনের দিকে পালাতে থাকে। খাশয়াম্ থেকে যে নুফাইল বিন হাবীবকে তারা পথ দেখাবার জন্যে ধরে এনেছিল তাকে তারা খুঁজে বের করে বললো, এখন ফিরে যাওয়ার পথ দেখাও। সে স্পষ্ট অস্বীকার করে বললো–

اين المفرو الاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب

"এখন আর পালাবার স্থান কোথায় যখন আল্লাহ পেছনে ধাওয়া করেছেন। নির্লজ্জ (আবরাহা) এখন পরাজিত বিজয়ী নয়।"

এ পলায়নের সময় তারা যেখানে সেখানে পড়ে মরতে লাগলো। আতা বিন ইয়াসার বলেন, সকলে তখনই মরেনি। কিছু সেখানেই মরে এবং কিছু পলায়নের সময় রাস্তায় পড়ে মরে। আবরাহা খাশ্য়াম পৌঁছার পর মারা যায়।[১]

এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মুয্দালাফা এবং মিনার মধ্যবর্তী মুহাস্সাব উপত্যকার নিকটস্থ মুহাসসির নামক স্থানে। সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনামতে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর বিদায় হজ্বের যে কাহিনী ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মুয্দালিফা থেকে মিনার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন মুহাস্সের উপত্যকায় তাঁর চলার গতি দ্রুত করেন। ইমাম নাওয়াদী তার ব্যাখ্যায় বলেন যে, আস্হাবে ফীলের ঘটনা এখানে সংঘটিত হয়েছিল। এজন্যে এ স্থান দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নাত। ইমাম মালেক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন, গোটা মুয্দালিফা অবস্থানের জায়গা। কিন্তু মুহাস্সের উপত্যকায় অবস্থান করবে না।

আরবী সাহিত্যে এ ঘটনার সাক্ষ্য

নুফাইল বিন হাবীবের যে কবিতা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক উদ্ধৃত করেছেন তাতে সে এ ঘটনার চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়েছে ঃ

ردينه لورأيت ولاتريه لدى جنب المحصب مارأينا

"হে রুদায়না! আহা যদি তুমি দেখতে ! আর আমরা মুহাস্সাব উপত্যকার নিকটে যা দেখেছি তা তো তুমি দেখতে পাবে না।"

حمدت الله اذا بصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا

"আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি যখন আমি পাখিগুলো দেখলাম এবং আমা ভয় হচ্ছিল যে, পাথর আমাদের উপর না পড়ে।"

وكل القوم يسال عن نفيل كان على للحبشان دينا

১. আল্লাহ তাআলা হাবশীদেরকে শুধু এ শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরঞ্চ তিন চার বছরের মধ্যে ইয়েমেন থেকে হাবশীদের শাসন ক্ষমতা চিরতরে নির্মূল করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হাতির ঘটনার পর ইয়েমেনে তাদের শক্তি একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। স্থানে স্থানে ইয়েমেনী সরদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারপর সাইফ বিন যি ইয়াযন নামে একজন ইয়েমেনী সরদার ইরানের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। ছটি জাহাজে ইরান থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য আসে। হাবশী শাসন নির্মূল করার জন্যে এ ছিল যথেষ্ট। এ ছিল ৪৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।–গ্রন্থকার

"তাদের মধ্যে সবাই নুফাইলকে খুঁজছিল, যেন তার উপরে হাবশীদের কোনো কর্জ ছিল।"

এ তো বড়ো ঘটনা ছিল যে, তা সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তা নিয়ে কবিগণ কবিতা রচনা করে। এসব কবিতায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সকলে এ ঘটনাকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করে। একথা কেউ ইশারা-ইংগিতেও বলেনি যে, এর মধ্যে ঐসব দেব-দেবীর কোনো হাত ছিল কাবাঘরে যাদের পূজা করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইবনে আয্যিবা'রা বলেন ঃ

ستون الفالم يؤبوا ارضهم ولم يعش بعد الاياب سقيمها

"তারা ছিল ষাট হাজার যারা নিজেদের যমীনে ফিরে যেতে পারেনি। আর না ফিরে যাওয়ার পর তাদের রোগী (আবরাহা) জীবিত ছিল।"

كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها

"তাদের আগে এখানে আদ এবং জুরহুম ছিল। আর আল্লাহ বান্দাহদের উপর বর্তমান রয়েছেন। তিনি তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।"

আবু কুবাইস্ বিন আস্লাত বলেন–

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاخاشب

"উঠ এবং তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়ের মাঝে বায়তুল্লাহর কোণগুলো মাসেহ্ কর।"

فلما اتاكم نصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف حاصب

"যখন আরশের মালিকের সাহায্য তোমাদের কাছে পৌঁছলো তখন সে বাদশাহের সেনাবাহিনী ঐসব লোকদেরকে এমন অবস্থায় তাড়িয়ে দিল যে, কেউ মাটিতে পড়ে রইলো এবং কাউকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।"

এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা

উপরন্তু হযরত উম্মে হানী (রা) এবং হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কুরাইশগণ দশ বছর মতান্তরে সাত বছর) লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর বর্ণনা ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাসে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া এবং বায়হাকী তাঁদের আপন আপন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত যুবায়ের (রা)-এর বর্ণনা তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া এবং ইবনে'আসাফে উদ্ধৃত করেছেন। তার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েবের ঐ মুরসাল রাওয়ায়াত থেকে যা খতীব বাগ্দাদী তাঁর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

নবী (সা)-এর জন্ম

যে বছর এ ঘটনা ঘটে আরববাসী তাকে 'আমুল ফীল্' বা হাতির বছর নামে অভিহিত করে। এ বছরই নবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন। মুহাদ্দেসীন এবং ঐতিহাসিকগ এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, উক্ত ঘটনা ঘটেছিল মহররম মাসে এবং নবী (সা)-এর জন্ম হয় রবিউল আওয়াল মাসে। অধিকাংশের মতে হস্তী ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর নবী (সা)-এর জন্ম হয়।

কুরআনে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ কেন করা হয়েছে ?

যে ঐতিহাসিক বিশদ বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে তা সামনে রেখে সূরা ফীল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরায় কেন এতো সংক্ষেপে শুধু আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহর আযাবের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মোটেই পুরাতন ছিল না। মক্কার বালক-শিশু সকলেই তা জানতো। সাধারণভাবে আরববাসীও তা জানতো। সমগ্র আরববাসী একথা বলতো যে, আবরাহার আক্রমণ থেকে কা'বা ঘরকে কোনো দেব-দেবী রক্ষা করেনি। বরঞ্চ রক্ষা করেছেন আল্লাহ তাআলা। কুরাইশ সরদারগণ আল্লাহ তাআলার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। কয়েক বছর পর্যন্ত কুরাইশগণ এ ঘটনার দ্বারা এতোটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। এজন্যে সূরা ফীলে এর বিস্তারিত উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরঞ্চ এ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, যাতে বিশেষভাবে কুরাইশ এবং সাধারণভাবে আরববাসী মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে যে, নবী মুহাম্মাদ (সা) যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তা এছাড়া আর কিছু নয় যে, সকল দেব-দেবী পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে হবে। উপরন্তু তারা যেন এটাও চিন্তা করে দেখে যে, এ সত্যের আহ্বানকে নিস্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে তারা যদি জোর-জবরদস্তি করে তাহলে যে শাস্তি আসহাবে ফীলকে তছনছ করে দিয়েছে, সে আযাবের সম্মুখীন তারাও হবে।[৪৭৫]

খাতামুন্নাবিয়্যীনের আবির্ভাবের পর খৃস্টবাদ

[আসমানী কিতাবের বাহক হওয়ার কারণে ইহুদী ও খৃস্টান উভয় দলের উচিত ছিল ইসলামের অতি নিকটবর্তী হওয়া। কারণ মূলত তাদের দ্বীনও ইসলামই ছিল। বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে খৃস্টানদের সম্পর্ক দুটি কারণে ঘনিষ্টতর হওয়া উচিত ছিল। এক ঃ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াতের মাধ্যমেই হযরত ঈসা (আ)-এর রেখে যাওয়া কাজ পরিপূর্ণ হতো। দ্বিতীয়ত ঃ শেষ নবীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী খৃস্টানদের ধর্মীয় পুস্তকাদিতে ইহুদীদের চেয়ে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এসব যারা জানতো তাদের অনেকেই শেষ নবীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। প্রখ্যাত খৃস্টান মনীষী ওয়ারাকা বিন নাওফাল তাদেরই একজন ছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, খৃস্টানদের সাথে শেষ নবীর এমন কিছু বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যার কারণে শেষ নবী এবং মুসলমানদের সম্পর্কে খৃস্টানদের আচরণ ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদীদের ইহুদীবাদ এবং খৃস্টানদের খৃস্টবাদ মুসলমানদের ব্যাপারে এমন এক ব্যবধান সৃষ্টি করে যা ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করতে থাকে। মুসলমানদের সুমহান ব্যবহারের জবাবে তারা চরম আক্রোশ পোষণ করতে থাকে। এ আক্রোশ ক্রুসযুদ্ধগুলোতে রূপান্তরিত হয়। এসব ক্রুসেড বা ক্রুসযুদ্ধের পর মিল্লাতে ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীসহ খৃস্টানদের বিশ্বব্যাপী নীতি অত্যন্ত ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে।-[সংকলকদ্বয়]

ওয়ারাকা বিন নাওফাল কর্তৃক নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার[১]

হেরা গুহায় ফেরেশতার সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর ভীত সন্ত্রস্ত ও কম্পিত অবস্থায় নবী (সা) বাড়ি পৌঁছলে প্রথমে হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের নিকটে যান। জাহেলিয়াতের যুগে ওয়ারাকা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরবী এবং ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে বলেন, "ভাইজান, অপনার ভাইপোর ঘটনা শুনুন।"

---

১. ঐতিহাসিক সূত্রে জানতে পারা যায় যে, ওয়ারাকা বিন নাওফালের পূর্বে পাদ্রী বোহায়রা নবী (সা)-কে যখন তাঁর সিরিয়া সফর কালে দেখেন, তখন তাঁর মধ্যে তিনি নবী নিদর্শনের প্রতিবিম্ব দেখতে পান। এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেন ঃ

নবী (সা) যখন বারো বছর বয়সে পা দেন তখন তিনি আবু তালিবের সাথে সিরিয়া ভ্রমণে যান। পাদ্রী বোহায়রা তাঁর মধ্যে নবীর নিদর্শন দেখতে পেয়ে তাঁর স্বজাতিদেরকে কাছে ডেকে নিয়ে তাদেরকে মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে অবহিত করেন। একথা জীবনী গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান এবং তা সর্বজন বিদিত। তারপর দ্বিতীয় বার তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা বিনতে খোয়ায়লেদ বিন আসাদ বিন আবদুল ওয্যার পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাঁর গোলাম মায়াসারার সাথে সিরিয়া যান। তিনি যখন পাদ্রী নাস্তুরার নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি (পাদ্রী) তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের নিদর্শন দেখতে পেয়ে মায়সারাকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করেন। মায়সারা প্রত্যাবর্তন করে সকল কথা হযরত খাদিজা (রা)-কে বলে। এসব কথা শুনার পর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মাদ (সা)-কে স্বামীত্বে বরণ করার প্রস্তাব দেন।-ইবনে খালদুন উর্দু অনুবাদ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬- অনুবাদক আল্লামা হাকীম আহমদ হাসান ওসমানী।

ঐতিহাসিক গবেষণার নিরিখে এ বর্ণনার কোনো মর্যাদা দেয়া হোক বা না হোক, কিন্তু হুযুর (সা)-এর চেহারা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দেখে কেউ যদি এ অভিমত ব্যক্ত করে যে, যে প্রতিশ্রুত নবীর ধারণা প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়—তিনি এই নবীই, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কোনো কারণ থাকে না। আর দুই দুইজন খৃস্টান পাদ্রী

ওয়ারাকা হুযুর (সা)-কে বললেন, "ভাইপো, কি দেখলেন বলুন দেখি ?"

নবী (সা) যা কিছু দেখেছিলেন তা বলেন। ওয়ারাকা বলেন, "এ হচ্ছে সেই 'নামূস্' (অহী আনয়নকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিল করেন। আহা, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের যুগে শক্তিশালী হতাম এবং ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে বের করে দেবে।"

নবী (সা) বলেন, "এসব লোক কি আমাকে বের করে দেবে ?"

ওয়ারাকা বলেন, "নিশ্চয়ই, এমন কখনো হয়নি যে, আপনি যা এনেছেন তা যখন কেউ এনেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি আপনার সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবো।"

কিন্তু অল্পদিন পরেই ওয়ারাকার মৃত্যু হয়। ..... তিনি ছিলেন মক্কার একজন অতিবৃদ্ধ অধিবাসী, নবীর শৈশবকাল থেকেই তাঁকে দেখে এসেছেন এবং পনেরো বছরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা আরও গভীরভাবে নিকট থেকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি যখন এ ঘটনা শুনতে পান তখন তাকে অস্‌অসা বা মনের প্ররোচনা মনে করেননি। বরঞ্চ ঘটনা শুনার সাথে সাথেই তিনি বলেন, এ হচ্ছে সেই নামূস্ যা মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন। তার অর্থ এই যে, তাঁর দৃষ্টিতে নবী মুহাম্মাদ (সা)-ও এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল না।[৪৭৬]

খৃস্টান রাজ্যে মুসলমানদের প্রথম হিজরত

মক্কার অবস্থা যখন অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে নবী (সা) বলেন ঃ

(বোহায়রা এবং নাস্‌তুরা) হুযুর (সা)-কে তাঁর বাল্যকালে দেখে তাঁর মধ্যে যে নবুওয়াতের নিদর্শন দেখতে পান, তা খৃস্টানদের জন্যে কোনো না কোনো পর্যায়ের অকাট্য প্রমাণ বটে। খৃস্টানগণ যদি তাঁদের আপন দুজন পাদ্রীর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যে নবুওয়াতের নিদর্শন দেখতে পাওয়ার বর্ণনা সত্য বলে স্বীকার করে নেন, তাহলে তাঁদের এ কথাও স্বীকার করা উচিত যে, ভবিষ্যতে আগমনকারী যে নবীর উপর অহী নাযিল হবে, তাঁকে কোনো অনবীর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু শিখাবারই প্রয়োজন হতে পারে না। পাদ্রী বোহায়রার বর্ণনাকে ভিত্তি করে খৃস্টানগণ যে ভ্রান্ত বিতর্কের দাঁড় করিয়েছেন তা খণ্ডন মাওলানা মওদূদী এভাবে করেছেন ঃ

"নবী (সা)-এর সমসাময়িক দুশমনদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেনি যে, বাল্যকালে যখন তিনি পাদ্রী বোহায়রার সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন এসব কিছু তার কাছে শিখে নিয়েছেন। তারা কেউ এ কথাও বলেনি যে, যৌবনকালে যখন তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ করতেন তখন তিনি খৃস্টান পাদ্রী এবং ইহুদী রিব্বীদের নিকট থেকে এসব জ্ঞান লাভ করেছেন। কারণ তাঁর সফরের আগাগোড়া অবস্থা তাদের জানা ছিল। তিনি একাকিও সফর করেননি, বরঞ্চ তাঁর আপন কাফেলার সাথে করেছেন। তারা এ কথা জানতো যে, তিনি বাইরে থেকে কিছু শিখে এসেছেন, এ অভিযোগ কেউ করলে তাদের আপন শহরের শত শত লোক তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলতো। মক্কার প্রতিটি মানুষ তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করতো, যদি এ লোকটি বারো তের বছর বয়সে বোহায়রার কাছে এসব জ্ঞান লাভ করেছিল, অথবা পঁচিশ বছর বয়সে যখন তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশ যাতায়াত শুরু করেন, তখন থেকে এসব জ্ঞান লাভ করা শুরু করেন, তাহলে তোমরা তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত এসব কথা গোপন রেখেছিলো কেন। যেহেতু তিনি অন্যত্র কোথাও বাস করতেন না। বরঞ্চ তোমাদের মধ্যেই বাস করতেন ?"
–সংকলকবৃন্দ

لو خرجتم الى الارض الحبشة فان بها ملكا لايظلم عنده احد وهى ارض صدق حتى يجعل اللّه لكم فرجا مما انتم فيه -

"তোমরা বের হয়ে আবিসিনিয়া চলে গেলে ভালো হয়। সেখানে এমন এক বাদশাহ আছেন যেখানে কারো উপর যুলুম করা হয় না। সেটা হচ্ছে কল্যাণভূমি। যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের এ মুসিবত দূর করেন, তোমরা সেখানে থাকবে।"[১]

নবী (সা)-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা আবিসিনিয়া রওয়ানা হন। কুরাইশের লোকজন সমুদ্রকুল পর্যন্ত তাঁদের পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু সৌভাগ্য বশত শুআইবার নৌঘাঁটিতে যথাসময়ে তাঁরা জাহাজ পেয়ে যান। এভাবে তাঁরা ধরা পড়া থেকে বেঁচে যান। তারপর কয়েক মাস পর আরও কিছু লোক হিজরত করেন। তিরাশিজন পুরুষ এবং এগারোজন মহিলা ও সাতজন অকুরায়শী শেষ পর্যন্ত আবিসিনিয়া গিয়ে একত্র হন। মক্কায় নবী (সা)-এর সাথে মাত্র চল্লিশ জন রয়ে যান।[৪৭৮]

আবিসিনিয়ার খৃস্টান বাদশাহর সত্য-নিষ্ঠা

হিজরতের ঘটনা সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে। এখানে শুধু এতটুকু বলা বাঞ্ছনীয় যে, মক্কার মুশরিকদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ মুসলমান মুহাজিরগণের পিছু ধাওয়া করে যখন তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবী পেশ করলো এবং নবী (সা)-এর নবুওয়াত ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করলো, তখন খৃস্টান বাদশাহ নাজ্জাশী নবীর উপর অবতীর্ণ বাণীর কিয়দংশ শুনাবার জন্যে হযরত জা'ফর (রা)-কে অনুরোধ করেন। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশ পড়ে শুনিয়ে দেন যা হযরত ইয়াহইয়া (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত ছিল। নাজ্জাশী শুনছিলেন এবং কাঁদছিলেন। এমন কি তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। হযরত জা'ফর (রা) তাঁর তেলাওয়াত শেষ করলে নাজ্জাশী বলেন, এ বাণী এবং যা কিছু হযরত ঈসা (আ) এনেছিলেন তা একই উৎস কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়েছে।[২][৪৭৯]

মক্কার ঐ কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল রাজ দরবারের ধর্মীয় নেতাদের ঘুষ প্রদান করে নিজেদের দলভুক্ত করে নেয় এবং পরদিন দরবারে আমর বিন আল্-আস্ এ প্রশ্ন উথাপন করেন ঃ

---

১. অবিসিনিয়ার খৃস্টান রাজ্য সম্পর্কে নবী (সা) কত উদারতার সাথে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন। সেখানকার শাসকের ন্যায়পরায়ণতা লক্ষ্য করে সেখানে মুসলমানদের হিজরতের এ একটি ঘটনা এজন্যে যথেষ্ট ছিল যে, মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও জোরদার হতে পারতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তারা বিদ্বেষের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়।–সংকলকবৃন্দ

২. মক্কার মুসলিম মুহাজিরগণ যে বাদশাহের দরবারে হাজির হন, তিনি মুসলমানদের আকীদা এবং দৃষ্টিভংগীর সত্যতা স্বীকার করেন। নবী (সা)-এর শিক্ষাকেও সত্য বলে মেনে নেন। এ দিক দিয়ে নাজ্জাশী বাদশাহের দৃষ্টিভংগী ইসলামের নিকটতম ছিল।

পরবর্তীকালে নবী (সা) যখন বিভিন্ন বাদশাহ ও শাসকদের নিকটে পত্র দ্বারা ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, এ ধরনের একটা পত্র আবিসিনিয়ার বাদশাহকেও প্রেরণ করেন। তিনি নবী পাক (সা)-এর দাওয়াত কবুল করেন এবং প্রত্যুত্তরে পত্র প্রেরণ করেন—(রহমাতুল্লিল আলামীন।–কাজী সালমান মনসুর পুরী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৯-২১২)–সংকলকবৃন্দ।

"তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন যে, ঈসা বিন মারইয়াম সম্পর্কে তাদের ধারণা বিশ্বাস কি ?"

নাজ্জাশী পুনরায় মুহাজিরগণকে ডেকে পাঠান। তারপর আমর বিন আল-আসের উপস্থাপিত প্রশ্ন তাঁদের সামনে রাখেন। তখন হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন ঃ

هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمة الله القاها الى مريم العذراء البتول۔

"নাজ্জাশী একথা শুনে মাটি থেকে একটা তৃণখণ্ড তুলে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি যা কিছু বললে, হযরত ঈসা (আ) এ তৃণখণ্ড থেকে বেশী কিছু নন।"[৪৮০]

অবিসিনিয়া সম্পর্কে মুসলমানদের বিশেষ আচরণ

আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে নবী (সা)-এর একটি এরশাদ লিপিবদ্ধ আছে, যাতে তিনি আবিসিনিয়া সম্পর্কে এ নীতি নির্ধারিত করে দেন- دعوا الحبشة مادعوكم অন্য বর্ণনাতে اتركوا الحبشة ماتركوكم অর্থাৎ "আবিসিনিয়াবাসী যতোক্ষণ তোমাদেরকে অবাধে থাকতে দেবে, তোমরাও তাদেরকে অবাধে থাকতে দিও।"

মনে হয় এ নির্দেশ মুতাবেক খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ নির্দেশের তাৎপর্য সম্ভবত এ ছিল যে, আবিসিনিয়াবাসী মুসলমানদেরকে বিপদের সময় যে আশ্রয় দিয়েছিল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং একথা মনে রেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে অগ্রসর হওয়া চলবে না, যাতে করে বিশ্ববাসী এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে না পারে যে, মুসলিম একটি অকৃতজ্ঞ দল। এর আর একটি কারণও চোখে পড়ে। তাহলো এই যে, আবিসিনিয়ার ভৌগলিক অবস্থান ও তার অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করে নবী (সা) এ ধারণা করেছিলেন যে, ইসলামের ভৌগলিক কেন্দ্রস্থল হেজাজের প্রতিরক্ষার জন্যে আবিসিনিয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন। এ কারণেই তিনি হয়তো এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ইসলামী দাওয়াত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে দেশে পৌছাতে হবে এবং যথাসম্ভব যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে থাকতে হবে।[৪৮১]

মিসরের মুকাওকেসের আচরণ

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার পার্শ্বের যেসব শাসকদের[১] নিকটে পত্র প্রেরণ করেন তাঁদের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার রোমীয় শাসক Patriarch একজন ছিলেন। আরববাসী তাঁকে মুকাওকেস্ বলতো, হযরত হাতেব বিন আবি বালতাআ (রা) যখন নবী (সা)-এর পত্র নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি

১. রাহমাতুল্লিল্ আলামীনের গ্রন্থকার বলেন, নবী (সা) সপ্তম হিজরীর পয়লা মহররম বিভিন্ন শাসকদের নামে পত্র লিখে দূতগণের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের অধিকাংশই খৃষ্টান ছিলেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াও ভালো ছিল। আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী বাদশা আস্হামা বিন আবজাম্ ইসলাম গ্রহণ করেন। বাহারাইনের শাসক মানযের বিন সাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়। আম্মানের শাসকবৃন্দ জায়ফর এবং আবদ ফরযন্দানে জালিদীও চিন্তা-ভাবনার পর ইসলামের প্রতি নতি স্বীকার করেন। দামেশকের শাসনকর্তা মানযের বিন হারেস বিন আবু শামার নবী (সা)-এর পত্র হাতে নিয়ে খুব ক্রোধ প্রকাশ করেন কিন্তু পরে নিজেকে

পত্রের জবাবে ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু পত্র বাহককে সাদরে গ্রহণ করেন। পত্রের জবাবে তিনি বলেন, আমি জানি যে, একজন নবী আসা বাকী রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। তথাপি আমি আপনার দূতকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছি এবং আপনার খেদমতে দুটি বালিকা পাঠাচ্ছি। এরা সম্ভ্রান্ত কিব্‌তী বংশের।

–ইবনে সায়াদ

এ বালিকা দুটির একজন সিরীন এবং অপর জন মারিয়া কিবতিয়া। (খৃস্টানগণ হযরত মারইয়ামকে মারিয়া বলতো)।

মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে হযরত হাতেম উভয়ের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা)-এর দরবারে তাঁদেরকে পেশ করা হলে সিরীনকে হযরত হাস্‌সান বিন সাবেতের মালিকানায় দেয়া হয় এবং হযরত মারিয়া (রা)-কে নবী (সা)-এর পবিত্র অন্দর মহলে গ্রহণ করা হয়। ৮ম হিজরী সনে তাঁর পবিত্র গর্ভে রাসূল (সা)-এর ছেলে হযরত ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করে।

–(আল-ইসতিয়াব-আল-আসাবা)[৪৮২]

নবী (সা) এবং নাজরানের খৃস্টানগণ

নবম হিজরীতে নাজরানের একটি খৃস্টান প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়। নাজরান হেজাজ ও ইয়েমেনের মাঝে অবস্থিত। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে তিয়াত্তরটি জনপদ ছিল এবং বলা হয় যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী এক লক্ষ বিশ হাজার পুরুষ পাওয়া যেতো। অধিবাসী সকলেই ছিল খৃস্টান এবং তারা তিনজন সরদারের নেতৃত্বাধীন ছিল। একজনকে আকেব বলা হতো যাকে জাতির নেতার মর্যাদা দেয়া হতো। দ্বিতীয়জনকে বলা হতো সাইয়েদ। সে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখাশুনা করতো। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল উস্‌কুফ (বিশপ) যার কাজ ছিল ধর্মীয় নেতৃত্ব দান। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরববাসীর এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে দেশের ভবিষ্যৎ এখন নবী মুহাম্মাদ

সংযত করার পর উপঢৌকনাদিসহ দূতকে বিদায় করেন। ইয়ামামার শাসক হাওযা বিন আলী ইসলামী রাষ্ট্রের অর্ধাংশ দাবী করে। কিন্তু অল্পদিন পরই সে মারা যায়। বায়তুল মাকদিসে কনস্টান্টি নোপলের বাদশাহের অধীনে হেরাক্লিয়াস শাসক ছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর পত্র পাওয়ার পর বিরাট দরবার আহ্বান করেন। নবী (সা) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে তখন আবু সুফিয়ান ব্যবসা উপলক্ষ্যে সেখানে যায়। হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে দরবারে ডেকে নবী (সা) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, যাতে করে তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেন। অবশেষে তিনি আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

"প্রতিশ্রুত নবীর এসব নিদর্শনই আমাদেরকে বলা হয়েছে। আমি মনে করতাম যে, নবীর অবির্ভাব হবে। কিন্তু আরব থেকে হবে তা আমি মনে করিনি। আবু সুফিয়ান! তুমি যদি সঠিক জবাব দিয়ে থাক তাহলে একদিন এ স্থানের উপর তিনি অবশ্যই কর্তৃত্ব করবেন যেখানে আমি বসে আছি (সিরিয়া ও বায়তুল মাকদিস)। কত ভালো হতো যদি তাঁর কাছে আমি পৌঁছতে পারতাম এবং তাঁর পা ধুয়ে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করতাম।–রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৬-২২৪।

ফরওয়া বিন আমর খোযায়ী সিরিয়া অঞ্চলে রোম সম্রাটের অধীন শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কায়সার তাঁকে ডেকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বলেন। তিনি অস্বীকার করলে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়।–সংকলকদ্বয়

(সা)-এর হাতে। অতএব দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নবীর দরবারে প্রতিনিধি দল আসা শুরু হলো। নাযরানের তিনজন সরদার ব্যক্তি ও চল্লিশজন প্রতিনিধিসহ মদীনায় পৌঁছেন।[১]৪৮৩

পরিশিষ্ট

আরও দুটি বিষয় এ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত। এক ঃ যে, রোম ও ইরানের দ্বন্দ্বে মুসলমানদের নৈতিক সমর্থন খৃস্টানদের পক্ষে ছিল। দ্বিতীয়ঃ এই যে, তবুকে মুসলমানগণ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

রোম-ইরান দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিবরণ "রোমের বিজয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধে রয়েছে। (ভবিষ্যদ্বাণী ১ম খণ্ড)। তবুক অভিযানের বর্ণনা তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১. এ সময়ে প্রতিনিধিদের সামনে নবী (সা) কুরআনে বর্ণিত তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে খোদায়ীর আসনে ভূষিত করার এবং খৃস্টানদের অনান্য ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করেন। এ দাওয়াতে প্রতিনিধিবৃন্দের কেউ কেউ প্রভাবিত হয়ে পড়ে কিন্তু বিশপ ও পাদ্রীদের হঠকারিতা প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে নবী (সা) তাদেরকে মুবাহেলার আহ্বান দিয়ে বলে, যদি তোমাদের আকীদার সত্যতার উপর তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে এসো একত্রে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করি, "আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লানৎ হোক।"
কিন্তু তাদের কেউ এতে রাজী হলো না। এর ফলে প্রতিনিধিদের মধ্যে সরলমনা সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ খৃস্টান-অখৃস্টান জনসাধারণের নিকটে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নাজরানের খৃস্টান নেতাগণ এমন আকীদা পোষণ করে যার উপর তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই।
অবশেষে নাজরানবাসীদের আবেদনে নবী (সা) একটি চুক্তিপত্র লিখে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী অংশে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেবা।—সংকলকদ্বয়

নবুওয়াত পূর্ব পরিবেশ

আরবের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

বিভিন্ন দেশের সাথে আরববাসীর ব্যাপক যোগসূত্র

প্রাক ইসলামী যুগের আরব দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং বহির্জগতের সাথে তার যে সম্পর্ক ছিল তা লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় যে, আরব দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ ছিল না যার অধিবাসী তাদের উপত্যকা ও মরুভূমির বাইরের দুনিয়ার সাথে অপরিচত ছিল।

ব্যাপক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন

প্রাচীন ইতিহাসের যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে সে-কালে চীন, ভারত এবং অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর এবং পূর্ব আফ্রিকার যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য মিসর, সিরিয়া এবং এশিয়ামাইনর, গ্রীক এবং রোমের সাথে চলতো, তা সবই চলতো আরবের মধ্যস্থতায়। এ বাণিজ্য তিনটি বড়ো বড়ো পথে চলতো। একটি হচ্ছে ইরান থেকে যে মূল পথ ইরাক ও সিরিয়ার উপর দিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পারস্য উপ-সাগরের সামুদ্রিক পথ। এ পথে সকল পণ্যদ্রব্য আরবের পূর্ব উপকূলে নামতো। তারপর দুমাতুল জান্দাল অথবা তাদ্‌মুর (Palmyra)-এর উপর দিয়ে সামনের দিকে যেতো। তৃতীয় ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক পথ। এ পথে যতো পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করতো তা হাজরামাওত এবং ইয়ামেনের উপর দিয়ে অতিক্রম করতো। এ তিনটি পথ এমন ছিল যার উপর আরববাসীদের বসতি ছিল। আরববাসী একদিক দিয়ে পণ্যদ্রব্য খরিদ করতো এবং অন্য দিকে তা বিক্রি করতো। পরিবহণের কাজও (Carrying Trade) তারা করতো। তাদের এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে মোটা কর আদায় করে তাদের নিরাপদে অতিক্রম করার দায়িত্ব তারা নিত। এ তিন অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ সালের বনী ইসরাঈলের বাণিজ্য তৎপরতার উল্লেখ তাওরাতে পাওয়া যায়। হযরত ঈসা (আ)-এর দেড় হাজার বছর পূর্বে উত্তর হেজাজের মাদ্‌ইয়ান এবং দেদানে এ ব্যবসা চলতো এবং তারপরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। হযরত সুলায়মান (আ) এবং হযরত দাউদ (আ)-এর যুগে (খৃষ্টপূর্ব ১০০) ইয়ামেনের সাবাঈ গোত্র এবং তারপর হিম্‌ইয়ারী গোত্র খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে যাতায়াত করতো। মসীহ (আ)-এর সমসাময়িক কালে ফিলিস্তিনের ইহুদীগণ আরবে আগমন করে খায়বর, ওয়াদিউল কুরা (বর্তমান আলূউলা), তায়মা এবং তাবুক প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। সিরিয়া ও মিসরে ইহুদীদের সাথে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। সিরিয়া ও মিসর থেকে খাদ্যশস্য ও মদ আমদানী বেশীরভাগ ইহুদীরাই করতো। পঞ্চম শতাব্দী থেকে কুরাইশগণ বহির্বাণিজ্যে কার্যকর অংশগ্রহণ শুরু কর। নবী (সা)-এর যুগ পর্যন্ত একদিকে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার সাথে এবং অন্য দিকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার সাথে তাদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পূর্ব আরবে ইরানের যতো ব্যবসা ইয়ামেনের সাথে চলতো তার অধিকাংশ হিরা থেকে ইয়ামামা (বর্তমান রিয়াদ) এবং তারপর বনী তামীমের এলাকার উপর দিয়ে নাজরান এবং ইয়ামেনে পৌঁছতো।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

এসব বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পার্শ্ববর্তী সভ্যদেশগুলোর সাথে আরবদের গভীর সম্পর্ক ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী খৃষ্টপূর্বে উত্তর হেজাজে তায়মায় ব্যাবিলনের বাদশাহ Nabonidus তাঁর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এ কি করে সম্ভব ছিল যে, ব্যাবিলনের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা হেজাজবাসীদের অজানা ছিল। তৃতীয় শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব থেকে নবী (সা)-এর যুগ পর্যন্ত প্রথম পেট্রার (Petra) নাবতী রাষ্ট্র, অতপর তাদমুরের (Palmyra) সিরীয় রাষ্ট্র এবং তারপর হীরা এবং গাস্‌সানের আরব রাষ্ট্রগুলো ইরাক থেকে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত এবং হেজাজ ও নাজদের সীমন্ত থেকে আল্‌জিরিয়া এবং সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বরাবর কায়েম ছিল। এসব রাষ্ট্রের একদিকে গ্রীক ও রোম এবং অন্যদিকে ইরানের সাথে গভীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তারপর বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতে আরবের অভ্যন্তরীণ গোত্রগুলোও তাদের সাথে ব্যাপক সম্পর্ক রাখতো। মদীনার আনসার এবং গাস্‌সানের শাসক একই বংশোদ্ভূত ছিল এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল নবী (সা)-এর যমানায় তাঁর বিশিষ্ট কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা) গাস্‌সানী শাসকদের নিকটে যাতায়াত করতেন। হীরার আমীরদের সাথে কুরাইশদের সুসম্পর্ক ছিল। এমন কি কুরাইশগণ তাদেরই নিকটে বিদ্যা শিক্ষা করে এবং হীরা থেকে যে বর্ণলিপি তারা লাভ করে তা পরবর্তীকালে কুফার বর্ণলিপি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

উপরন্তু আরবদেশের প্রত্যেক অংশে বড়ো বড়ো শেখ, সম্ভ্রান্ত পরিবার ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের নিকটে রোম, গ্রীক ও ইরানের বহু সংখ্যক দাস-দাসী বিদ্যমান ছিল। ইরান ও রোমের যুদ্ধে উভয় পক্ষের যেসব যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানো হতো, তাদের মধ্যে যাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে করা হতো তাদেরকে খোলা বাজারে বিক্রি করা হতো। আরব ছিল এ মালের বড়ো বাজার। এসব দাসের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত ও সভ্য লোক থাকতো। তাদের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও পেশাজীবী লোকও থাকতো। আরবের শেখ এবং ব্যবসায়ীগণ তাদের নিকট থেকে বহু কাজ নিতো। মক্কা, তায়েফ, ইয়াসরিব এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে বিরাট সংখ্যক দাস বিদ্যমান ছিল এবং দক্ষ শ্রমিক হিসেবে তাদের মালিকের মূল্যবান খেদমত করতো।

বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থা

এর সাথে আরবের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আর একটি দিক লক্ষ্য করতে হবে। আরব কোনো যুগেই খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না এবং এমন কোনো শিল্প-কারখানাও গড়ে ওঠেনি যার দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যেতো। এদেশে সর্বদা খাদ্যদ্রব্য বাহির থেকে আমদানি করা হতো এবং সকল প্রকার শিল্পদ্রব্য, এমনকি পরিধানের কাপড় পর্যন্ত বেশীর ভাগ বাহির থেকে আমদানি করা হতো। নবী (সা)-এর কাছাকাছি যুগে এ আমদানি ব্যবসা বেশীর ভাগ দুটি দলের হাতে ছিল। এক হচ্ছে, কুরাইশ ও বনী সাকীফ্ এবং দ্বিতীয়, ইহুদী। কিন্তু এরা মাল আমদানি করে শুধু পাইকারী বিক্রি করতো। দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র জনপদে এবং উপজাতীয়দের মধ্যে ফেরী করে বিক্রি করা এদের কাজ ছিল না। উপজাতীয়রাও এ কথা মানতে রাজী ছিল না যে, ব্যবসার সকল মুনাফা এসব লোক ভোগ করুক এবং তাদের এ একচেটিয়া ব্যবসায়ে তাদের নিজেদের লোকজন কোনো

সুযোগই লাভ না করুক। অতএব পাইকারী বিক্রেতা হিসেবে এসব লোক দেশের অভ্যন্তরে খুচরা বিক্রেতা ব্যবসায়ীদের কাছে লাখ লাখ টাকার মাল বিক্রি করতো এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাল ধারে বিক্রি করা হতো।[৪৮৪]

রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল? সে অবস্থায় তিনি কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সে সময়ে আরব চারদিক থেকে অত্যাচারী রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিবেশী জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। নবী (সা)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেই হাবশী সেনাবাহিনী যে শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে শহর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আরবের সবচেয়ে উর্বর প্রদেশ ইয়ামেন প্রথমে হাবশীদের এবং পরে ইরানীদের পদানত হয়। আরবের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল ইরানীদের প্রভাবাধীন ছিল। নাজ্‌দের সীমান্ত পর্যন্ত ইরানী প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরে আকাবা এবং মায়ান পর্যন্ত বরঞ্চ তাবুক পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় তাদের নিজেদের স্বার্থে আরবের উপজাতীয়দেরকে পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত রাখতো। এভাবে আরবের অভ্যন্তরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতো। কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের কায়সার বিভিন্ন সময়ে মক্কার মতো ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো। প্রতিটি বৃহৎ শক্তি আরব জাতিকে তাদের কুক্ষিগত করতে চাইতো। কারণ এ জাতির দেশ অনুর্বর হলেও জাতি অনুর্বর ছিল না। বিশ্ব জয়ের জন্যে এ জাতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা সংগ্রহ করা যেতো।[৪৮৫]

সীরাতের পয়গাম

সীরাতের পয়গাম

[১৯৭৫ সালের ২২শে অক্টোবর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কর্তৃক আহূত সমাবেশে প্রদত্ত মাওলানার ভাষণ।]

জনাব ভাইস্ চ্যান্সেলার, ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ!

অদ্যকার এ সমাবেশে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সীরাতের পয়গাম সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে যুক্তির কষ্টিপাথরে কথা বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, একজন মাত্র নবীর সীরাতের পয়গাম কেন ? অন্য কারো পয়গাম কেন নয় ? নবীগণের মধ্যে শুধুমাত্র সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ (সা)-এর সীরাতের উপর প্রথমেই আলোচনা করা এজন্যে প্রয়োজন যে, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কোনো পথপ্রদর্শকের জীবন চরিত নয়, বরঞ্চ শুধুমাত্র একজন নবীর জীবন চরিতেই আমরা হেদায়াত বা পথের সন্ধান পেতে পারি। অন্য কোনো নবী অথবা ধর্মীয় নেতার জীবনে নয়, বরঞ্চ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবন চরিতেই আমরা সে সঠিক ও পূর্ণাংগ হেদায়াত লাভ করতে পারি। যার প্রকৃতপক্ষে আমরা মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াতের প্রয়োজন

এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহ্ তাআলাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তিনিই এ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষ পয়দা করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং স্বয়ং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও তার তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কার থাকতে পারে ? স্রষ্টাই তো তাঁর সৃষ্টিকে জানতে পারেন, সৃষ্টি ততোটুকুই জানতে পারে যতোটুকু তার স্রষ্টা তাকে জানাবেন। সৃষ্টির নিজস্ব কোনো মাধ্যম নেই, যার দ্বারা সে প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারে।

এ ব্যাপারে দুটি বিষয়ে পার্থক্য ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যাতে করে আলোচনায় কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে না পারে। একটি হচ্ছে, এমন কিছু তথ্য যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনারা লাভ করতে পারেন এবং তার থেকে চিন্তা-গবেষণা, যুক্তি ও পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন। এসব ব্যাপারে উর্ধজগত থেকে কোনো জ্ঞানলাভের প্রয়োজন করে না। এ আপনাদের নিজস্ব অনুসন্ধান, চিন্তা- গবেষণা, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের কাজ, এ দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা আপনাদের চারপাশে যা কিছু পান তা অনুসন্ধান করে বের করুন। তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করুন। তাদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক বিধি-বিধান কার্যকর রয়েছে তা উপলব্ধি করুন। তারপর উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের স্রষ্টা আপনাদেরকে একাকী ছেড়ে দেননি। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অননুভূত উপায়ে পর্যায়ক্রমে তাঁর সৃষ্ট জগতের সাথে আপনাদের পরিচয় করাতে থাকেন। নতুন নতুন তথ্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ইলহামের পদ্ধতিতে কোনো কোনো মানুষকে এমন ইংগিত দান করতে থাকেন যে, সে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে অথবা নতুন কোনো নীতি-পদ্ধতি জানতে পারে। তথাপি এ সবকিছু মানুষের জ্ঞানেরই আওতাভুক্ত, যার জন্যে কোনো নবী অথবা কোনো আসমানী কেতাবের প্রয়োজন হয় না। এ ব্যাপারে বাঞ্ছিত তথ্য লাভ করার উপায়-উপাদানও মানুষকে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু এমন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধে। তা আমাদের একেবারে নাগালের বাইরে। তা আমরা না পরিমাপ করতে পারি, আর না আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে তা আমরা জানতে পারি। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সে সম্পর্কে কোনো অভিমত পেশ করলে তা নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে করে থাকেন। তাকে 'জ্ঞান' বলা যেতে পারে না। এ হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত তথ্য, যে ব্যাপারে বিতর্কমূলক মতবাদকে স্বয়ং তাঁরাও সীমারেখা নিশ্চিত বলে ঘোষণা করতে পারেন না যাঁরা সে মতবাদ পেশ করেছেন। যদি তাঁদের জ্ঞানের সীমারেখা জানা থাকে তাহলে না, তাঁরা স্বয়ং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন আর না অন্য কাউকে বিশ্বাস করার আহ্বান জানাতে পারেন।

নবীগণের আনুগত্যের প্রয়োজন

এখন উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়ে কোনো জ্ঞান লাভ হলে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হতে পারে। কারণ সকল তত্ত্ব ও তথ্য তাঁর জানা আছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে বস্তুর মাধ্যমে এ জ্ঞানদান করেন তা হচ্ছে 'অহী' যা শুধুমাত্র নবীগণের উপর নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা আজ পর্যন্ত এ কাজ কখনো করেননি যে, একটি কিতাব মুদ্রিত করে প্রত্যেক মানুষের হাতে দিয়েছেন এবং তাদেরকে এ কথা বলে দিয়েছেন, 'তোমার এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব কি তা এ কিতাবখানা পড়ে জেনে নাও।' বরঞ্চ এ তত্ত্ব অনুযায়ী দুনিয়ায় তোমার কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত তাও জেনে নাও এবং এ জ্ঞান মানুষ পর্যন্ত পৌছাবার জন্যে তিনি সর্বদা নবীগণকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন—যাতে করে তাঁরা এ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত না হন বরঞ্চ তাদেরকে তা বুঝিয়ে দেবেন, সে অনুয়ায়ী নিজে কাজ করে দেখাবেন, তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করবেন এবং এ জ্ঞান যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে এমন একটা সমাজের আকারে সুসংবদ্ধ করবেন যাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে সে জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে, পথনির্দেশনার জন্যে আমরা শুধুমাত্র একজন নবীর সীরাতেরই মুখাপেক্ষী। কোনো অনবী যদি নবীর অনুসারী না হয়, তাহলে যতো বড়ো মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী হোক না কেন, সে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে না। কারণ তাঁর কাছে সত্যজ্ঞান নেই এবং যে, সত্য জ্ঞানের অধিকারী নয়। সে আমাদেরকে কোনো সত্য এবং সঠিক জীবনব্যবস্থা দিতে পারে না।

মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া অন্যান্য নবীগণের পক্ষ থেকে হেদায়াত না পাওয়ার কারণ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যাঁদেরকে আমরা নবী বলে জানি এবং যে সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাঁরা সম্ভবত নবী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সীরাত থেকে আমরা কেন পয়গাম লাভের চেষ্টা করি? এ কি কোনো গোঁড়ামির কারণে, না এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে?

আমি বলতে চাই যে, এর অত্যন্ত ন্যায়সংগত কারণ রয়েছে। যেসব নবীর উল্লেখ কুরআনে আছে, তাঁদেরকে যদিও আমরা নিশ্চিতরূপে নবী বলে জানি এবং মানি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো শিক্ষা ও জীবন চরিত কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌছেনি, যাতে করে তাঁর অনুসরণ আমরা করতে পারি। হযরত নূহ (আ), হযরত

ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) নিসেন্দেহে নবী ছিলেন। তাঁদের সকলের উপরে আমরা ঈমান রাখি। কিন্তু তাঁদের উপর নাযিল হওয়া কোনো কিতাব সংরক্ষিত আকারে আজ বিদ্যমান নেই যে, তার থেকে আমরা হেদায়াত গ্রহণ করতে পারি। তাঁদের মধ্যে কারো জীবন চরিত এমন সংরিক্ষত ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে আমাদের কাছে পৌছেনি যে, আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাঁদেরকে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করব। এসব নবীগণের শিক্ষা ও জীবন চরিত সম্পর্কে কেউ কিছু লিখতে চাইলে কয়েক পৃষ্ঠার অধিক লিখতে পারবে না এবং তাও কুরআনের সাহায্যে। কারণ কুরআন ছাড়া তাঁদের সম্পর্কে আর কোনো প্রামাণ্য উপকরণ বা মালমসলা বিদ্যমান নেই।

ইহুদী দ্বীনের গ্রন্থাবলী ও নবীগণের অবস্থা

হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর পর আগমনকারী নবীগণ ও তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একথা বলা হয়ে থাকে যে, সেসব বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেন্টে আছে। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে বাইবেলের পর্যালোচনা করে দেখুন। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বায়তুল মাকদিসের ধ্বংসের সময় তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই সাথে অনান্য নবীগণের সহীফাগুলোও বিনষ্ট হয়ে যায়, যাঁরা সে যুগের পূর্বে অতীত হয়েছেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যখন ইসরাঈলীগণ বেবিলনে বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করে তখন হযরত উযায়ের (আ) অন্যান্য বুযর্গানের সাহায্যে হযরত মূসা (আ)-এর সীরাত এবং বনী ইসরাঈলের ইতিহাস সংকলন করেন। তার মধ্যেই ওসব আয়াত সুযোগ মতো সন্নিবেশিত করেন, সেসব তাঁর ও তাঁর সাহায্যকারীগণের হস্তগত হয়েছিল। তারপর খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন লোক (জানি না তারা কে) ঐসব নবীগণের সহীফা সংকলন করেন, যাঁরা তাদের কয়েক শতাব্দী পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন। জানি না কোন্ সূত্রে তারা এসব করেছে। যেমন ধরুন, হযরত ঈসা (আ)-এর তিনশ' বছর পূর্বে হযরত ইউনুস (আ)-এর নামে কোনো এক ব্যক্তি একখানা বই লিখে বাইবেলের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেয়। অথচ তিনি খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে নবী ছিলেন। যুবর (Psalms) হযরত দাউদ (আ)-এর ইন্তেকালের পাঁচশ' বছর পরে লেখা হয় এবং তার মধ্যে হযরত দাউদ (আ) ছাড়াও একশ' অন্যান্য কবিদের কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়। জানি না কোন্ সূত্রে যুবর প্রনয়নকারীগণের কাছে এসব তথ্য পৌছে। হযরত সুলায়মান (আ) মৃত্যুবরণ করেন হযরত ঈসা (আ)-এর ৯৩৩ বছর পূর্বে এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রবাদগুলো লিখিত হয় হযরত ঈসা (আ)-এর দুশ' পঞ্চাশ বছর পূর্বে। তার মধ্যে অন্যান্য বহু জ্ঞানী ব্যক্তির কথাও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

মোটকথা বাইবেলের কোনো পুস্তকের সনদই ঐসব নবী পর্যন্ত পৌছে না যাদের প্রতি তা আরোপ করা হয়। উপরন্তু ইবরানী ভাষায় লিখিত বাইবেল এসব গ্রন্থ সত্তর খৃস্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দ্বিতীয় বার ধ্বংস হবার সময় বিনষ্ট হয়ে যায়। ও সবের শুধু গ্রীক ভাষায় অনুবাদ অবশিষ্ট ছিল। এ অনুবাদ করা হয়েছিল ২৫৮ খৃস্টপূর্ব থেকে প্রথম শতাব্দী খৃস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। ইহুদী পণ্ডিতগণ খৃস্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইবরানী বাইবেলে সব পাণ্ডুলিপি থেকে প্রণয়ন করে, যা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তার প্রাচীনতম যে বইখানি পাওয়া যায় তা ৯১৬ খৃস্টাব্দের লেখা। এছাড়া অন্য কোনো ইবরানী বাইবেল বিদ্যমান

নেই। লূত সাগরের (Dead Sea) সন্নিকটে 'গারে কামরানে' যে ইবরানী তফ্‌সিল (Scrolls) পাওয়া যায়, তাও বড়োজোর খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর লেখা। তার মধ্যে বাইবেলের শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশই পাওয়া যায়। বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকের যে সমষ্টি সামেরীয়দের (Samaritans) নিকটে প্রচলিত তার প্রাচীনতম পুস্তক খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর লেখা। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে গ্রীক অনুবাদ করা হয় তাতে অসংখ্য ভুলত্রুটি ছিল। তার থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে। হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের অবস্থা ও শিক্ষা সম্পর্কে এসব উপাদান ও মালমসলা কিসের মানদণ্ডে প্রামাণ্য (Authentic) বলা যেতে পারে ?

তাছাড়া ইহুদীদের মধ্যে লোক পরম্পরা কিছু মৌলিক বর্ণনা পাওয়া যায় যাকে মৌখিক আইন (Oral Law) বলা হয়। তের-চৌদ্দশ' বছর পর্যন্ত এসব অলিখিত ছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রিব্বী ইয়াহুদা বিন শামউন তা মিশ্‌না নামে লিখিত রূপ দান করে। ফিলিস্তিনের ইহুদী পণ্ডিতগণ হালাকা নামে এবং বেবিলনের পণ্ডিতগণ হাগ্‌গাদা নামে তার ভাষ্য লেখেন খৃস্টীয় তৃতীয় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে। এ তিনটি গ্রন্থের সমষ্টিকে বলা হয় তালমুদ। এ সবের কোনো বর্ণনারই কোনো সনদ নেই যাতে করে বুঝতে পারা যাবে যে, এসব কোন্ কোন্ লোকের দ্বারা কোন্ কোন্ লোকের কাছে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর খৃস্টধর্মের গ্রন্থাবলীর অবস্থা

হযরত ঈসা (আ)-এর সীরাত ও শিক্ষার অবস্থা কিছুটা এ ধরনেরই। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মূল ইঞ্জিল অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল, তা হযরত ঈসা (আ) লোকদেরকে মৌখিক শুনিয়ে দিতেন। তাঁর শিষ্যগণও সেসব অন্যদের কাছে মুখে মুখে এমনভাবে পৌঁছিয়ে দিতেন যে, নবীর অবস্থা এবং ইঞ্জিলের আয়াতগুলো একত্রে মিশ্রিত হয়ে যেতো। সে সবের কোনো কিছুই হযরত ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর পরে লিখিত হয়নি। লেখার কাজ ঐসব খৃস্টানগণ করেন যাদের ভাষা ছিল গ্রীক। অথচ হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা ছিল সুরিয়ানী (Syriac) অথবা আরামী (Aramaic)। তাঁর শিষ্যগণও এ ভাষা বলতেন। গ্রীক ভাষাভাষী অনেক গ্রন্থকার এ বর্ণনাগুলো আরামী ভাষায় শুনেন এবং তা গ্রীক ভাষায় লেখেন। এসব গ্রন্থকারের লিখিত কোনো গ্রন্থই ৭০ খৃস্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয়নি। তাঁদের কেউই কোনো ঘটনা অথবা হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো বাণীর সনদ বর্ণনা করেননি যার থেকে জানা যেতে পারে যে, তাঁরা কোন্ কথাগুলো কার নিকট থেকে শুনেছেন। তারপর তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলোও সংরক্ষিত নেই। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের হাজার হাজার গ্রীক ভাষার বই একত্র করা হয়, কিন্তু তার কোনো একটিও খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ খৃস্টীয় একাদশ থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। মিসরে পাপিরাসের উপরে লিখিত কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ পাওয়া গেছে। তার মধ্যেও কোনোটাই তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কে কখন এবং কোথায় করেন, সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায় না। চতুর্থ শতাব্দীতে পোপের নির্দেশে এসব পুনঃপরীক্ষা করে দেখা হয়। অতপর ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে ওসব পরিত্যাগ করে গ্রীক ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় এক নতুন অনুবাদ করা হয়। গ্রীক থেকে সুরিয়ানী ভাষায় চারটি ইঞ্জিলের অনুবাদ সম্ভবত ২০০ খৃস্টাব্দে করা হয়। কিন্তু তারও যে

প্রাচীনতম গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় তা চতুর্থ শতাব্দীর লেখা। পঞ্চম শতাব্দীর কলমে লেখা যে বইটি পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের। সুরিয়ানী থেকে আরবী ভাষায় যে অনুবাদ করা হয়েছে তার মধ্যেও কোনোটি অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। মজার ব্যাপার এই যে, প্রায় সত্তরটি ইঞ্জিলগ্রন্থ লেখা হয় কিন্তু তার মধ্যে মাত্র চারটি খৃস্টধর্মীয় নেতাগণ অনুমোদন করেছেন এবং অবশিষ্টগুলোকে নাকচ করে দিয়েছেন। জানি না অনুমোদন বা কেন করা হলো এবং নাকচই বা কেন করা হলো। এ ধরনের উপকরণ ও মালমসলার ভিত্তিতে লিখিত হযরত ঈসা (আ)-এর সীরাত এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা কোনো পর্যায়ে কি প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যেতে পারে ?

যরদশ্‌তের সীরাত ও শিক্ষার অবস্থা

অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অবস্থাও অন্য ধরনের নয়। যেমন ধরুন যরদশ্‌ত (Zoroaster), যাঁর সঠিক জন্মকাল এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। বড়োজোর একথা বলা যেতে পারে যে, আলেকজাণ্ডারের ইরান বিজয়ের আড়াইশ' বছর পূর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মসীহ (আ)-এর সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে। তাঁর গ্রন্থ আবেস্তা মূল ভাষায় এখন বিদ্যমান নেই এবং সে ভাষাও এখন মৃত যে ভাষায় তা লিখিত ছিল অথবা মৌখিক বর্ণনা করা হয়েছিল। খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে তার কিছু অংশের অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ নয় খণ্ডে করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে প্রথম দু খণ্ড বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এখন তার যে প্রাচীনতম খণ্ডটি পাওয়া যায় তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লেখা। এ হচ্ছে যরদশ্‌তের উপস্থাপিত গ্রন্থের অবস্থা। এখন রইলো তার নিজস্ব জীবন চরিতের ব্যাপার। তো এ সম্পর্কে আমাদের এর বেশি কিছু জানা নেই যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে তাবলীগ শুরু করেন। দুবছর পর বাদশাহ গুশ্‌তাস্‌প্‌ তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধর্ম সরকারী ধর্মে পরিণত হয়। সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মুত্যুর পর যতোই সময় অতিবাহিত হতে থাকে ততোই তাঁর সম্পর্কে নানান ধরনের আজগুবী গল্পকাহিনী রচিত হতে থাকে। তার কোনোটিকেই কোনো ঐতিহাসিক মর্যাদা দেয়া যায় না।

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা

দুনিয়ার প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে বুদ্ধ একজন। যরদশ্‌তের ন্যায়—তাঁর সম্পর্কে এ অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত তিনিও নবী ছিলেন। কিন্তু তিনি মোটেই কোনো কিতাব পেশ করেননি। তার অনুসারীগণও এমন কোনো দাবী করেননি যে, তিনি কোনো কিতাব এনেছেন। তাঁর মৃত্যুর একশ' বছর পর তাঁর কথা ও অবস্থা একত্র করার কাজ শুরু করা হয়। একাজ কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। কিন্তু এ ধরনের যতো গ্রন্থকেই বৌদ্ধ ধর্মের মূল গ্রন্থ মনে করা হয় তার কোনোটির মধ্যে কোনো সনদ সন্নিবেশিত করা হয়নি, যার দ্বারা এ কথা জানা যেতে পারে যে, বুদ্ধের অবস্থা, বাণী ও শিক্ষা যাঁরা সংকলন করেছেন কোন্‌ সূত্রে এসব তাঁদের নিকটে পৌঁছেছে।

শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সীরাত ও শিক্ষাই সংরক্ষিত আছে

এর থেকে জানা গেল যে, যদি আমরা অন্যান্য নবী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হই তাহলে তাঁদের সম্পর্কে এমন কোনো প্রামাণ্য মাধ্যম পাওয়া যায় না যার দ্বারা আমরা

তাঁদের শিক্ষা ও জীবন চরিত থেকে নিশ্চিন্ত ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো পথনির্দেশনা পেতে পারি। অতঃপর আমাদের জন্যে এছাড়া আর অন্য কোনো পথ থাকে না যে, আমরা এমন এক নবীর শরণাপন্ন হবো যিনি নির্ভরযোগ্য ও সকল প্রকার বিকৃতি ও মিশ্রণের উর্ধে এক গ্রন্থ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এবং যাঁর বিস্তারিত অবস্থা, বাণী ও শিক্ষাদীক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকটে পৌছেছে যার থেকে আমরা পথ নির্দেশনা পেতে পারি। এমন ব্যক্তিত্ব সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাসে একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর পবিত্র সত্তা।

কুরআন পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষিত আল্লাহর কিতাব

নবী মুহাম্মাদ (সা) একটি গ্রন্থ (আল কুরআন) এ সুস্পষ্ট দাবী সহকারে পেশ করেছেন যে, এ আল্লাহ তাআলার বাণী—যা তাঁর উপরে নাযিল হয়েছে। এ গ্রন্থের যখন আমরা পর্যালোচনা করি তখন নিশ্চিতরূপে অনুভব করি যে, তাতে কোনো প্রকার সংমিশ্রণ ঘটেনি। স্বয়ং নবী (সা)-এর কোনো কথা এর সাথে সন্নিবেশিত করা হয়নি। বরঞ্চ তাঁর কথাগুলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে। বাইবেলের ন্যায় তাঁর জীবনের অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ এবং আরবের ইতিহাস ও কুরআন নাযিলকালে উদ্ভূত ঘটনাবলী আল্লাহ তাআলার এ কালামের সাথে মিশ্রিত ও সংযোজিত করা হয়নি। এ বিশুদ্ধ আল্লাহর কালাম (Word of God)-এর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একটি শব্দও সন্নিবেশিত করা হয়নি। তার শব্দাবলীর মধ্যে কোনো একটি শব্দও বাদ পড়েনি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত অবিকল চলে আসছে।

যে সময় থেকে এ কিতাব নবী (সা)-এর উপর নাযিল হওয়া শুরু হয় তখন থেকে তিনি একে লেখাতে শুরু করেন। যখন কোনো অহী নাযিল হতো, তক্ষুণি তিনি কোনো না কোনো লেখককে ডেকে নিতেন এবং তাকে লিখিয়ে দিতেন, লেখার পর তা আবার তাঁকে শুনানো হতো এবং যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে, লেখক সঠিকভাবে তা লিখেছে, তখন তিনি তা একটা নিরাপদ স্থানে রেখে দিতেন। নাযিল হওয়া প্রতিটি অহী সম্পর্কে তিনি লেখককে বলে দিতেন—তা কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পূর্বে এবং কার পরে সংযোজিত করতে হবে। এভাবে তিনি কুরআনকে ক্রমিক পর্যায়ে সাজাতে থাকেন এবং অবশেষে কুরআন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অতপর নামায সম্পর্কে ইসলামের সূচনা থেকেই এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, তার মধ্যে কুরআন পাঠ করতে হবে। এ জন্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা মুখস্থ করতে থাকেন। অনেকে গোটা কুরআন মুখস্থ করেন এবং তাঁদের চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যক লোক কমবেশী তার বিভিন্ন অংশ তাঁদের স্মৃতি পটে সংরক্ষিত রাখেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা লিখতে ও পড়তে পারতেন তাঁরাও কুরআনের বিভিন্ন অংশ নিজেরা লিখে নিতেন। এভাবে কুরআন নবী (সা)-এর জীবনেই চারটি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছিল ঃ

এক ঃ তিনি স্বয়ং অহী লেখকদের দ্বারা আগাগোড়া লিখিয়ে নেন।

দুই ঃ বহু সাহাবী গোটা কুরআন প্রতিটি শব্দসহ মুখস্থ করে রাখেন।

তিন ঃ সাহাবায়ে কেরামের (রা) মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না—যিনি কুরআনের কোনো না কোনো অংশ, অল্প হোক বেশী হোক, মুখস্থ করে রাখেননি।

চার ঃ বহুসংখ্যক শিক্ষিত সাহাবী নিজেদের প্রচেষ্টায় কুরআন লিখে নেন এবং তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পড়ে শুনিয়ে তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

অতএব এ এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে, আজ যে কুরআন আমাদের কাছে রয়েছে এটি অক্ষরে অক্ষরে অবিকল সে জিনিস যা নবী মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর কালাম হিসেবে পেশ করে ছিলেন। নবীর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) সকল হাফেয এবং লিখিত অংশগুলোকে একত্র করেন এবং গ্রন্থের আকারে পরিপূর্ণ কুরআন লিখিয়ে নেন। হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে তারই সকল সরকারীভাবে ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রীয় স্থানগুলোতে পাঠানো হয়। এর দুটি প্রতিলিপি এখনও দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে—একটি ইস্তাম্বুল এবং দ্বিতীয়টি তাশ্‌খন্দে। কেউ ইচ্ছা করলে কুরআন মজিদের যে কোনো মুদ্রিত একটি সংখ্যা নিয়ে তার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। কোনো পার্থক্যই তিনি দেখতে পাবেন না। আর পার্থক্যই বা হবে কি করে যখন নবী (সা)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বংশানুক্রমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাফেয বিদ্যমান রয়েছে। একটি শব্দও কেউ পরিবর্তন করলে এসব হাফেয সে ভুল ধরে ফেলবেন। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্‌স্টিটিউট ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রত্যেক যুগের লিখিত কুরআন মজিদের হাতে লেখা এবং ছাপানো ৪২ হাজার কুরআন একত্র করে। পঞ্চাশ বছর ধরে তার উপর গবেষণা করা হয়। অবশেষে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয় তাতে বলা হয় যে, এসব গ্রন্থে লেখার ত্রুটি ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নেই। এসব ছিল প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের কুরআন মজিদ। আর এসব সংগ্রহ করা হয়েছিল দুনিয়ার প্রত্যেক স্থান থেকে। পরিতাপের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর উপর বোমা বর্ষণের ফলে ইন্‌স্টিটিউটটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তার গবেষণার ফল দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়নি।

কুরআন সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই, যে ভাষায় এটি নাযিল হয়েছিল, তা একটি জীবন্ত ভাষা। ইরাক থেকে মারাকাশ পর্যন্ত প্রায় বারো কোটি মানুষ আরবীকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে এবং অনারব দুনিয়ায় লক্ষ কোটি মানুষ তা পড়ে এবং পড়ায়। আরবী ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান, তার শব্দের উচ্চারণ এবং তার বাগ্‌ধারা বিগত চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। আজও প্রত্যেক আরবী শিক্ষিত লোক তা পড়ে ঐভাবেই বুঝতে পারে যেমন চৌদ্দশ' বছর পূর্বের আরববাসী বুঝতে পারতো।

এ হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা তিনি ছাড়া অন্য কোনো নবী বা ধর্মগুরুর ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে তাঁর উপরে যে কিতাব নাযিল হয়েছিল, তা তার মূল ভাষায় এবং মূল শব্দাবলীসহ অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

রাসূলের সীরাত ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা

তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি সকল আম্বিয়া ও ধর্মীয় গুরুদের মধ্যে এ ব্যাপারে একক। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রতি প্রদত্ত কিতাবের ন্যায় তাঁর সীরাতও সংরক্ষিত আছে যার থেকে আমরা জীবনের প্রতি বিভাগে পথনির্দেশনা পেতে পারি। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতো লোক তাঁকে দেখেছে, তাঁর

জীবনের অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ দেখেছে, তাঁর বাণী শুনেছে, তাঁর ভাষণ শুনেছে, তাঁকে কোনো আদেশ করতে অথবা কোনো কিছু বিষয়ে নিষেধ করতে শুনেছে, তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক সবকিছু হৃদয়ে গেঁথে রেখেছে এবং পরবর্তী বংশধরদের কাছে তা পৌছিয়ে দিয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে এমন লোকের সংখ্যা এক লক্ষ যাঁরা চোখে দেখা এবং কানে শুনা ঘটনাগুলোর বিবরণ পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন। নবী (সা) কতিপয় হুকুম-আহকাম লিখিয়ে নিয়ে কিছু লোককে দিয়েছেন বা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যা পরবর্তী যুগের লোকেরা পেয়েছে। সাহাবায়েকিরামের মধ্যে অন্তত ছ'জন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাঁরা হাদীস লিপিবদ্ধ করে নবী (সা)-কে শুনিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে তার মধ্যে কোনো ভুল থাকতে না পারে। এসব লিখিত তথ্যাবলী পরবর্তী কালের লোকেরা লাভ করেছে এবং নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর অন্তত পঞ্চাশজন সাহাবী নবীর অবস্থা ও কার্যকলাপ এবং তাঁর কথা লিখিত আকারে একত্র করেন এবং এসব জ্ঞানভাণ্ডার তাঁদেরও হস্তগত হয় যাঁরা হাদীস সঞ্চয়ন ও সংকলনের কাজ করেন। তারপর যেসব সাহাবী সীরাত সম্পর্কিত তথ্যাবলী মৌখিক বর্ণনা করেন তাদের সংখ্যা, যেমন আমি একটু আগে বলেছি, এক লক্ষ পর্যন্ত পৌছে। আর এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপারও নয়। কারণ নবী (সা) যে বিদায় হজ্ব সমাধা করেন তাতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এতো বিরাট সংখ্যক লোক তাঁকে হজ্ব করতে দেখেছেন, তাঁর নিকট থেকে হজ্বের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করেছেন এবং এ হজ্বের সময় যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তা তাঁরা শুনেছেন। কি করে সম্ভব এতো লোক যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নবীর সাথে হজ্বে শরীক হওয়ার পর নিজেদের অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সেখানে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীগণ তাঁদের নিকট থেকে এ হজ্ব ভ্রমণের বিবরণ জিজ্ঞেস করেননি এবং হজ্বের নিয়ম-পদ্ধতি জেনে নেননি ? এর থেকে অনুমান করুন যে, নবী (সা)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর লোক কত আগ্রহের সাথে তাঁর অবস্থা ও কাজ-কর্ম, তাঁর কথা, নির্দেশ ও হেদায়াত সম্পর্কে ঐসব লোকের নিকট থেকে জানতে চাইবে যাঁরা তাকে দেখেছেন এবং তাঁর নির্দেশাবলী শুনেছেন।

সাহাবায়েকিরাম (রা) থেকে যেসব বর্ণনা পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছেছে, সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই এ পন্থা অবলম্বন করা হয় যে, যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর প্রতি আরোপ করে কোনো কথা বলতেন তাঁকে এ কথা বলতে হতো যে, তিনি সে কথা কার কাছে শুনেছেন এবং তাঁর আগে ধারাবাহিকতার সাথে সে কার কাছ থেকে সে কথা শুনেছেন। এভাবে নবী (সা) পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরায় গোটা সংযোজন (Link) লক্ষ্য করা হতো, যাতে করে এ নিশ্চয়তা লাভ করা যেতো যে, কথাটি সঠিকভাবে নবী (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদি বর্ণনার সকল সংযোজক পাওয়া না যেতো, তাহলে তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতো। আবার বর্ণনা পরম্পরা নবী (সা) পর্যন্ত পৌছেছে, কিন্তু মাঝখানের কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) অনাস্থা ভাজন হয়েছে, তাহলে এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এখন একটু চিন্তা করে দেখলে আপনি অনুভব করবেন যে, দুনিয়ার কোনো মানুষের জীবনবৃত্তান্ত এভাবে সংকলিত হয়নি। এ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর যে, তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা বিনা সনদে মেনে নেয়া হয়নি। আর সনদে শুধু এতোটুকই দেখা হয়নি যে, একটি হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা নবী পর্যন্ত পৌছেছে

কি না, বরঞ্চ এটাও দেখা হয়েছে যে, এ সম্পর্কিত সকল রাবী (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য কিনা। এ উদ্দেশ্যে রাবীগণের জীবনবৃত্তান্তও পুংখানুপুংখরূপে যাঁচাই করা হয়েছে এবং এ বিষয়ের উপরে বিস্তারিত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। তার থেকে জানা যায় যে, কে নির্ভরযোগ্য ছিল এবং কে ছিল না। কার চরিত্র ও ভূমিকা কি রকম ছিল। কার স্মরণশক্তি প্রখর ছিল এবং কার ছিল না। কে ঐ ব্যক্তির সাথে দেখা করে যার থেকে বর্ণনা নকল করা হয়েছে এবং কে তার সাথে সাক্ষাত না করেই তাঁর নামে রেওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছে। এভাবে এতো ব্যাপক আকারে রাবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যে, আজও আমরা এক একটি হাদীস যাঁচাই করতে পারি যে, তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, না অনির্ভরযোগ্য সূত্রে। মানব ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এমন পাওয়া যেতে পারে কি যাঁর জীবন বৃত্তান্ত এমন নির্ভরযোগ্য সূত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ? এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি আছে যে, এক ব্যক্তির জীবন চরিতের সত্যতা নির্ণয়ের জন্যে হাজার হাজার লোকের জীবনের উপর গ্রন্থাদি প্রণীত হয়েছে যাঁরা ঐ এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করেছেন ? বর্তমান যুগে খৃস্টান ও ইহুদী পণ্ডিতগণ হাদীসের সত্যতা সন্দিগ্ধ প্রতিপন্ন করার জন্যে যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার প্রকৃত কারণ এ বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় গুরুদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে মোটেই কোনো সনদ বিদ্যমান নেই। তাঁদের মনের এ জ্বালার কারণেই তাঁরা ইসলাম, কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সমালোচনার ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা (Intellectual honesty) পরিহার করেছেন।

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনের প্রতিটি দিক ছিল সুপরিচিত ও সুবিদিত

নবী (সা)-এর সীরাতের শুধু এ একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই নয় যে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌছেছে, বরঞ্চ এটাও তাঁর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকের এতো বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় যে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে ততোটা পাওয়া যায় না। তাঁর পরিবার কেমন ছিল, নবুয়ত পূর্ব জীবন তাঁর কেমন ছিল, কিভাবে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন, কিভাবে তাঁর উপর অহী নাযিল হতো, কিভাবে তিনি ইসলামী দাওয়াত ছড়ালেন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা কিভাবে করলেন, আপন সংগীসাথীদের কিভাবে তরবিয়ত দিলেন, আপন পরিবারের সাথে কিভাবে জীবন-যাপন করতেন, বিবি-বাচ্চাদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, বন্ধু ও শত্রুর প্রতি তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, কোন্ নৈতিকতার শিক্ষা তিনি দিতেন এবং আপন চরিত্রের মাধ্যমে কোন্ জিনিসের নির্দেশ তিনি দিতেন, কোন্ কাজ করতে তিনি নিষেধ করতেন, কোন্ কাজ হতে দেখে তা নিষেধ করেননি, কোন্ কাজ হতে দেখে তা নিষেধ করেছেন এসব কিছু পুংখানুপুংখরূপে হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি একজন সামরিক জেনারেলও ছিলেন এবং তাঁর অধিনায়কত্বে যতো যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হয়েছে তার বিশদ বিবরণ আমরা পাই। তিনি একজন শাসকও ছিলেন এবং তাঁর শাসনের যাবতীয় বিবরণ আমরা জানতে পারি। তিনি একজন বিচারকও ছিলেন এবং তাঁর সামনে উপস্থাপিত সকল মামলা-মোকদ্দমার পূর্ণ কার্যবিবরণী আমরা দেখতে পাই। আমরা এটাও জানতে পারি যে কোন্ মামলায় তিনি কি রায় দিয়েছেন। তিনি বাজার পরিদর্শনেও বেরুতেন এবং দেখতেন মানুষ কেনা-বেচার কাজ কিভাবে করতো। ভুল কাজ দেখলে তা করতে নিষেধ করতেন এবং যে

কাজ সঠিকভাবে হতে দেখতেন, তা অনুমোদন করতেন। মোটকথা, জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই যে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত হেদায়াত দান করেননি।

এ কারণেই আমরা পক্ষপাতহীনভাবে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে এ কথা বলি যে, সকল নবী ও ধর্মীয় প্রধানদের মধ্যে নবী মুহাম্মাদই (সা) একমাত্র সত্তা সমগ্র মানবজাতি হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্যে যাঁর শরণাপন্ন হতে পারে। কারণ তাঁর উপস্থাপিত কিতাব তার মূল শব্দাবলীসহ সংরক্ষিত আছে এবং হেদায়াতের অত্যাবশ্যক তাঁর সীরাতের বিশদ বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

এখন লক্ষ্যণীয় এই যে, তাঁর সীরাত পাক আমাদেরকে কোন্ পয়গাম এবং কোন্ হেদায়াত দান করছে।

তাঁর পয়গাম সমগ্র মানবজাতির জন্যে

প্রথম যে জিনিসটি তাঁর দাওয়াতে আমাদের চোখে পড়ে তাহলো এই যে, তিনি বর্ণ, বংশ, ভাষা ও মাতৃভূমির স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করে মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্বোধন করেন এবং এমন কিছু মূলনীতি পেশ করেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্যে মংগলকর। এ মূলনীতি যে ব্যক্তি মেনে নেবে সেই মুসলমান হবে এবং একটি বিশ্বজনীন উম্মতে মুসলিমার সদস্য হবে, তা সে কৃষ্ণাংগ হোক অথবা শ্বেতাংগ। প্রাচ্যবাসী হোক অথবা পাশ্চাত্যবাসী, আরবী হোক অথবা আযমী। যেখানেই কোনো মানুষ আছে, সে যে দেশে, যে জাতিতে এবং যে বংশেই পয়দা হোক না কেন, যে ভাষা সে বলুক এবং তার গায়ের রং যেমনই হোক না কেন—নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াত তারই জন্যে। সে যদি তাঁর উপস্থাপিত মূলনীতি মেনে নেয়, তাহলে সমান অধিকার সহ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কোনো ছুঁৎ-ছাঁৎ, কোনো উচুঁ-নিচু, কোনো বংশীয় বা শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য, কোনো ভাষাগত, জাতিগত ও ভৌগলিক পার্থক্য, যা বিশ্বাসের ঐক্য স্থাপিত হওয়ার পর একজন মানুষকে অন্যজন থেকে পৃথক করে দেয়, এ উম্মতের মধ্যে নেই।

বর্ণ ও বংশের গোঁড়ামির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিকার

আপনি চিন্তা করলে অনুধাবন করবেন যে, এ এক বিরাট নিয়ামত যা নবী মুহাম্মাদ আরবী (সা)-এর বদৌলতে মানবজাতি লাভ করেছে। মানুষকে যে জিনিস সবচেয়ে ধ্বংস করেছে তাহলো মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই স্বাতন্ত্র্য। কোথাও তাকে অপবিত্র ও অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ যে অধিকার ভোগ করে তার থেকে তারা বঞ্চিত। কোথাও তাকে নির্মূল করে দেয়ার যোগ্য বলে স্থির করা হলো কারণ, সে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় এমন সময় জন্মগ্রহণ করে যখন বহিরাগতদের প্রয়োজন হয়েছিল তাকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করায়। কোথাও তাকে ধরে দাসে পরিণত করা হলো এবং তার কাছ থেকে পশুর মতো শ্রম নেয়া হলো। কারণ সে আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার গায়ের রং ছিল কালো। মোটকথা মানবতার জন্যে জাতি, মাতৃভূমি, বংশ, বর্ণ ও ভাষার এ স্বাতন্ত্র্য প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিরাট বিপদের কারণ হয়ে রয়েছিল। এরই ভিত্তিতে যুদ্ধবিগ্রহ হতে থাকে। এরই ভিত্তিতে এক দেশ আর এক দেশ দখল করে বসেছে। এক জাতি আর এক জাতিকে লুন্ঠন করেছে এবং বহু বংশ সমূলে ধ্বংস করেছে। নবী মুহাম্মাদ (সা)-এ রোগের এমন এক প্রতিকার করেন যা ইসলামের শত্রুগণও স্বীকার করেন। তা এই যে, ইসলাম বর্ণ, বংশ ও জন্মভূমির স্বাতন্ত্রের সমাধানে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা আর কেউ করতে পারেনি।

আফ্রিকা বংশোদ্ভূত আমেরিকাবাসীদের প্রখ্যাত নেতা এবং শ্বেতাংগদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাংগদের পক্ষ থেকে চরম বিদ্বেষ প্রচারের এককালীন পতাকাবাহী ম্যালকম্ এক্স ইসলাম গ্রহণের পর যখন হজ্বে গমন করেন এবং দেখেন যে, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সকল দিক থেকে সকল বংশ-বর্ণ-দেশ ও ভাষার লোক হজ্ব করতে আসছে, সকলে একই ধরনের এহ্রামের পোশাক পরিধান করে আছে, সকলে একই স্বরে 'লাব্বায়ক' 'লাব্বায়ক' ধ্বনী উচ্চারণ করছে, একত্রে তাওয়াফ করছে, একই জামায়াতে একই ইমামের পেছনে নামায পড়ছে, তখন তিনি চিৎকার করে বলছেন, বর্ণ ও বংশের যে সমস্যা, তার সুষ্ঠু সমাধান একমাত্র এটাই। আমরা এতোদিন যা করে আসছি, তা নয়। এ বেচারাকে তো যালেমেরা হত্যা করে কিন্তু তাঁর প্রকাশিত আত্মচরিত এখনো বিদ্যমান আছে। তার থেকে আপনারা জানতে পারেন যে, হজ্বের দ্বারা কত গভীরভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হজ্ব তো ইসলামের ইবাদাতগুলোর মধ্যে একটি মাত্র। যদি কেউ চক্ষু উন্মিলিতি করে সামগ্রিকভাবে ইসলামের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে তার কোথাও অংগুলি সংকেত করে এ কথা বলতে পারবে না যে, এ শিক্ষা কোনো বিশেষ জাতি, কোনো গোত্র, কোনো বংশ অথবা কোনো শ্রেণীর স্বার্থের জন্য। গোটা দ্বীন তো এ কথার সাক্ষ্য দান করে যে, এ সমগ্র মানবজাতির জন্যে এবং তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান যারা তার মূলনীতি স্বীকার করে নিয়ে তার তৈরী বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। এ অমুসলিমের সাথেও এমন কোনো আচরণ করে না যা শ্বেতাংগরা কৃষ্ণাংগের সাথে করেছে, যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের শাসনাধীন জাতির সাথে করেছে, যা কমিউনিস্ট সরকারগুলো তাদের শাসনাধীনে বসবাসকারী অকমিউনিস্টদের সাথে এমন কি আপন দলের অবাঞ্ছিত সদস্যদের সাথে করেছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, মানবতার কল্যাণের জন্যে সে মূলনীতি কি যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করেছিলেন এবং তার মধ্যে এমন কোন্ বস্তু রয়েছে যা শুধু মানবতার কল্যাণেরই নিশ্চয়তা দানকারী নয়, বরঞ্চ সমগ্র মানবজাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে একটি উম্মতও বানাতে পারে।

আল্লাহ তাআলার একত্বের ব্যাপকতম ধারণা

এ মূলনীতির প্রধানতম বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াহ্দানিয়াত বা একত্ব স্বীকার করে নেয়া। শুধু এ অর্থে নয় যে আল্লাহ আছেন এবং নিছক এ অর্থেও নয় যে, আল্লাহ শুধু এক। বরঞ্চ এ অর্থে যে, এ বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্তা এবং শাসক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সমগ্র সৃষ্টি জগতে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই যার শাসনক্ষমতার কর্তৃত্ব অধিকার রয়েছে, যার আদেশ ও নিষেধ করার কোনো অধিকার আছে, যার হারাম করার কারণে কোনো জিনিস হারাম হয়ে যায় এবং যার হালাল করার কারণে কোনো জিনিস হালাল হয়ে যায়। এ অধিকার এখতিয়ার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। কারণ যিনি স্রষ্টা ও মালিক, প্রভু, একমাত্র তাঁরই এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তাঁর সৃষ্ট দুনিয়ায় তাঁর বান্দাদেরকে যে জিনিসের ইচ্ছা তা করতে আদেশ করতে পারেন এবং যে জিনিসের ইচ্ছা তার থেকে নিষেধ করতে পারেন। ইসলামের দাওয়াত এই যে, আল্লাহ তাআলাকে এ হিসেবে মেনে নাও। তাঁকে এভাবে মেনে নাও যে, তিনি ব্যতীত আর কারো বান্দাহ

আমরা নই, তাঁর আইনের বিপরীত আমাদের উপর হুকুম করার অধিকার কারো নেই, আমাদের মাথা তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে অবনত হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি, আমাদের জীবন-মরণ তাঁরই এখতিয়ারাধীন। যখন ইচ্ছা তখন তিনি আমাদের মৃত্যু দান করতে পারেন। যতোদিন ইচ্ছা ততোদিন আমাদেরকে জীবিত রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে যদি মৃত্যু আসে তাহলে দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই যে, আমাদের বাঁচাতে পারে। আর তিনি যদি জীবিত রাখতে চান তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই আমাদের ধ্বংস করতে পারে না। আল্লাহ্ সম্পর্কে এই হলো ইসলামের ধারণা।

এ ধারণা অনুযায়ী যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহর অনুগত, আজ্ঞাবহ এবং এ সৃষ্টিজগতের মধ্যে বসবাসকারী মানুষেরও কাজ এই যে, সেও আল্লাহর অনুগত-আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। সে যদি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয় অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য গ্রহণ করে, তাহলে তার জীবনের গোটা ব্যবস্থা বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থার পরিপন্থী হয়ে পড়বে। অন্য কথায় এভাবে বুঝবার চেষ্টা করুন যে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহর হুকুমের অধীন চলছে এবং এ প্রকৃত সত্যকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এখন যদি আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুমের অধীন চলি অথবা আপন খুশি মতো যে দিক ইচ্ছা সে দিকে চলি, তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, আমাদের জীবনের সমগ্র গাড়ীখানি বিশ্বপ্রকৃতির গাড়ীর বিপরীত দিকে চলছে। এতে করে আমাদের এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক চিরন্তন সংঘর্ষ চলতে থাকবে।

আর একদিক দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের ধারণা অনুযায়ী মানুষের জন্যে সঠিক জীবন পদ্ধতি (Way of life) শুধু এই যে, সে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করবে। কারণ সে সৃষ্ট এবং আল্লাহ তার স্রষ্টা। সৃষ্টজীব হওয়ার দিক দিয়ে তার স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়াও ভুল এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব আনুগত্য করাও ভুল। এ দুটি পথের মধ্যে যেটিই সে অবলম্বন করবে, তা হবে সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সত্যের সাথে সংঘর্ষের বিষময় পরিণাম সংঘর্ষকারীকেই ভোগ করতে হয়, তাতে সত্যের কোনো ক্ষতি হয় না।

আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াত হলো এ সংঘর্ষ বন্ধ কর। তোমার জীবনের বিধান ও রীতি-পদ্ধতি তাই হওয়া উচিত যা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির। তুমি না স্বয়ং আইন প্রণেতা সাজো, আর না অন্যের এ অধিকার স্বীকার কর যে, সে আল্লাহর যমীনের উপরে আল্লাহর বান্দাহদের উপর তার আইন চালাবে। বিশ্বজগতের স্রষ্টার আইনই হচ্ছে সত্যিকার আইন এবং অন্যসব আইন ভ্রান্ত ও বাতিল।

রাসূলের আনুগত্যের দাওয়াত

এখান পর্যন্ত পৌছুবার পর আমাদের সামনে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াতের দ্বিতীয় দফাটি আসছে। তা হচ্ছে তাঁর এ দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা—আমি আল্লাহ তাআলার নবী এবং মানবজাতির জন্যে তিনি তাঁর আইন আমারই মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আমি স্বয়ং সে আইনের অধীন। স্বয়ং আমারও এতে কোনো পরিবর্তন করার এখতিয়ার নেই। আমি শুধু মেনে চলার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছু তৈরী করার অধিকারও আমার নেই। এ কুরআন এমন আইন যা আমার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা

হয়েছে। আমার সুন্নাত এমন আইন যা আমি আল্লাহর নির্দেশে জারী করি। এ আইনের সামনে সকলের প্রথমে মস্তক অবনতকারী স্বয়ং আমি (انا اول المسلمين) তারপর আমি সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন অন্যের আইনের আনুগত্য পরিহার করে এ আইনের আনুগত্য করে।

আল্লাহর পরে আনুগত্য লাভের অধিকারী আল্লাহর রাসূল

কারো মনে যেন এ সন্দেহ না জাগে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং আপন সুন্নাতের আনুগত্য কিভাবে করতে পারেন যখন সে সুন্নাত হচ্ছে তাঁর নিজের কথা ও কাজ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরআন যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে, ঠিক তেমনি রসূল হিসেবে তিনি যে হুকুম দিতেন, অথবা যা করতে তিনি নিষেধ করতেন, অথবা যে রীতি-পদ্ধতি তিনি নির্ধারিত করতেন তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে হতো। একেই বলে সুন্নাতে রাসূল এবং এর আনুগত্য তিনি স্বয়ং সেভাবেই করতেন যেভাবে করা সকল ঈমানদারদের জন্যে ছিল অপরিহার্য। এ কথাটি এমন অবস্থায় পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন সাহাবায়েকিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কোনো বিষয়ে নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথা কি আপনি আল্লাহর হুকুমে বলছেন, না এ আপনার নিজের অভিমত ? নবী জবাবে বলতেন, আল্লাহর হুকুমে নয়, বরঞ্চ এ আমার নিজস্ব অভিমত। এ কথা জানার পর সাহাবায়েকিরাম নবীর কথায় একমত না হয়ে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করতেন। তখন নবী (সা) তাঁর অভিমত পরিহার করে তাঁদের প্রস্তাব মেনে নিতেন। এভাবে এ কথা সে সময়েও পরিষ্কার হয়ে যেতো যখন নবী (সা) সাহাবাকিরামের সাথে পরামর্শ করতেন। এ পরামর্শ একথা প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি। কারণ আল্লাহর হুকুম হলে তো সেখানে পরামর্শের কোনো প্রশ্নই আসে না। এ ধরনের নবী (সা)-এর জীবনে বহুবার ঘটেছে যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে পাই। বরঞ্চ সাহাবায়েকিরাম (রা) বলেন, আমরা নবী (সা) থেকে অধিক পরামর্শকারী আর কাউকে দেখিনি। এ বিষয়ে চিন্তা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এটাও নবীর সুন্নাত ছিল, যে ব্যাপারে আল্লাহর কোনো নির্দেশ নেই সে ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে। অন্য কোনো শাসক তো দূরের কথা আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব অভিমতকে অপরের জন্যে শিরোধার্য বলে ঘোষণা করেননি। এভাবে নবী (সা) উম্মতকে পরামর্শভিত্তিক কাজ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ থাকবে তা দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে চলতে হবে। আর যেখানে আল্লাহর কোনো নির্দেশ থাকবে না সেখানে স্বাধীন মতামতের অধিকার নির্ভয়ে ব্যবহার করবে।

স্বাধীনতার প্রকৃত চার্টার

এ মানবজাতির জন্যে স্বাধীনতার এমন এক চার্টার যা একমাত্র দীনে হক ছাড়া আর কেউ মানবজাতিকে দান করেনি। আল্লাহর বান্দাহ শুধু এক আল্লাহরই বান্দাহ হবে। অন্য কারো বান্দাহ হবে না। এমন কি আল্লাহর রাসূলের বান্দাহও হবে না। এ চার্টার মানুষকে এক আল্লাহর ছাড়া অন্যান্য সকলের বন্দেগী (দাসত্ব-আনুগত্য) থেকে স্বাধীন করে দিয়েছে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের খোদায়ী বা প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব চিরদিনের জন্যে খতম করে দিয়েছে।

এর সাথে এক মহানতম নিয়ামত যা এ পয়গাম মানুষকে দান করেছে তা এমন এক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব যা বাতিল করার, বিকৃত করার এবং রদবদল করার অধিকার কোনো বাদশাহ্, ডিক্টেটর অথবা কোনো গণতান্ত্রিক আইন সভা অথবা ইসলাম গ্রহণকারী কোনো জাতির নেই। এ আইন ভালো ও মন্দের এক শাশ্বত মূল্যবোধ (Permanent values) মানুষকে দান করে যা পরিবর্তন করে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো করা যায় না।

আল্লাহর নিকটে জবাবদিহির ধারণা

তৃতীয় যে জিনিসটি নবী মুহাম্মাদ (সা) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, তোমাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হব। তোমাকে দুনিয়ায় লাগামহীন পশুর মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, যা খুশী তাই করবে। খুশীমতো যে কোনো ক্ষেত-খামারে চরতে থাকবে এবং তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবে না। বরঞ্চ তোমার এক একটি কথা এবং তোমার গোটা স্বেচ্ছামূলক জীবনের ক্রিয়াকর্মের হিসেব তোমাকে তোমার স্রষ্টা ও প্রভুকে দিতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাকে পুনর্জীবিত হতে হবে এবং আপন প্রভুর সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে হাজির হতে হবে। এ এমন এক বিরাট নৈতিক শক্তি যে, তা যদি মানুষের বিবেকের মধ্যে স্থান লাভ করে তাহলে তার অবস্থা এমন হবে যেন তার সাথে সর্বদা একজন চৌকিদার লেগে আছে যে দুষ্কৃতির প্রতিটি প্রবণতার জন্যে তাকে সতর্ক করে দেয় এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে তাকে বাধা দেয়। বাইরে কোনো পাকড়াওকারী পুলিশ এবং শাস্তিদানকারী সরকার থাকুক বা না থাকুক, তার ভেতরে এমন এক ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বসে থাকবে যার দ্বারা ধরা পড়ার ভয়ে সে কখনো নিভৃতে, বন-জংগলে, গভীর অন্ধকারে অথবা কোনো জনমানবহীন স্থানেও আল্লাহর নাফরমানী করতে পারবে না। মানুষের নৈতিক সংস্কার সংশোধন এবং তার মধ্যে এক মজবুত চরিত্র তৈরি করার এর চেয়ে উৎকৃষ্টতম উপায় আর কিছু নেই। অন্য যে কোনো উপায়েই চরিত্র গঠনের চেষ্টা করুন না কেন, এর চেয়ে অধিক অগ্রসর হতে পারবেন না যে, সৎকাজ দুনিয়ার জীবনে মংগলকর হবে এবং অসৎকাজ অমংগলকর হবে এবং ঈমানদারী একটা মহৎ নীতি। তার অর্থ এ হলো যে, নীতিগতভাবে যদি অসৎকাজ এবং বেঈমানী মংগলকর হয় এবং তাতে ক্ষতির কোনো আশংকা না থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় তা করে ফেলা যায়। এ দৃষ্টিকোণের পরিণাম তো এই যে, যারা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ আচরণের অধিকারী তারাই জাতীয় আচার-আচরণে চরম পর্যায়ের বেঈমানী, প্রতারক, লুণ্ঠনকারী, যালেম ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে। বরঞ্চ ব্যক্তিগত জীবনেও কোনো কোনো ব্যাপারে তারা সৎ হলেও অন্যান্য ব্যাপারে চরম অসৎ হয়ে পড়ে। আপনারা দেখতে পাবেন যে, একদিকে তারা লেনদেনে সৎ এবং আচার-আচরণে ভদ্র, অপরদিকে মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, জুয়াড়ী, অত্যন্ত চরিত্রহীন এবং কলুষিত ও কলংকিত। তাদের কথা এই যে, মানুষের ব্যক্তি জীবন এক জিনিস এবং সমাজ জীবন বা লোক জীবন (Public life) অন্য জিনিস। ব্যক্তি জীবনের কোনো দোষ ধরলে তারা ত্বরিত জবাব দেয়, আপন চরকায় তেল দাও।

ঠিক এর বিপরীত হচ্ছে আখেরাতের আকীদাহ-বিশ্বাস। তাহলো এই যে, পাপ সব সময়েই পাপ—দুনিয়ার জীবনে তা কল্যাণকর হোক অথবা অনিষ্টকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে জাবাবদিহির অনুভূতি পোষণ করে তার জীবনে ব্যক্তি ও সমাজের দুটি বিভাগ স্বতন্ত্র হতে পারে না। সে ঈমানদারী অবলম্বন করলে এ জন্যে করে না যে, এ একটা উত্তম

নীতি। বরঞ্চ তার অস্তিত্বের মধ্যেই ঈমানদারী শামিল হয়ে যায় এবং সে চিন্তাই করতে পারে না যে, বেঈমানী করাটা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতে পারে। তার আকীদাহ-বিশ্বাস তাকে এ কথা শিক্ষা দেয় যে, যদি সে বেঈমানী করে তাহলে সে পশুরও নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছুবে। যেমন কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ -

"আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকার-আকৃতিতে পয়দা করেছি। অতপর তাকে উল্টিয়ে ফিরিয়ে সর্ব নিম্নস্তরের করে দিয়েছি।"

এভাবে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নেতৃত্বে মানুষ শুধু শাশ্বত নৈতিক মূল্যবোধ সম্বলিত একটা অপরিবর্তনীয় আইনই লাভ করেনি, বরঞ্চ ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্র ও আচার-আচরণের জন্যে এমন একটি বুনিয়াদও লাভ করেছে যা একেবারে অনড় ও অটল। এ আইন এ জিনিসের মুখাপেক্ষী নয় যে, কোনো সরকার, কোনো পুলিশ, কোনো আদালত যদি থাকে তাহলে আপনি সৎ পথে চলতে পারবেন, নতুবা অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।

বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে দুনিয়াদারীতে চরিত্রের ব্যবহার

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াত আমাদেরকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করে। তা এই যে, চরিত্র সংসারবিরাগীদের নিভৃত কক্ষের জন্যে নয়, দরবেশদের খানকাহর জন্যে নয়, বরঞ্চ দুনিয়ার জীবনের সকল বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে। দুনিয়া ফকীর এবং দরবেশদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি তালাশ করে, আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে রাষ্ট্রীয় মসনদে এবং বিচারালয়ের আসনে এনে রেখেছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহভীতি ও দিয়ানতদারীর সাথে কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন, পুলিশ ও সৈনিককে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর অলী সেই হতে পারে যে দুনিয়াকে বর্জন করে শুধু 'আল্লাহ আল্লাহ' করতে থাকবে। তিনি বলেন অলীত্ব এটার নাম নয়, বরঞ্চ প্রকৃত অলীত্ব হচ্ছে এই যে, মানুষ একজন শাসক, একজন বিচারক, একজন সেনাধ্যক্ষ, একজন থানার দারোগা, একজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়ে এক পুরো দুনিয়াদার হলেও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহভীরু এবং সৎ ও বিশ্বস্ত হওয়ার প্রমাণ দেবে যেখানে তার ঈমান অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এভাবে তিনি চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতাকে বৈরাগ্যবাদের নিভৃত কোণ থেকে টেনে বের করে অর্থনীতিতে ও সামাজিকতায়, রাজনীতিতে ও বিচারালয়ে এবং যুদ্ধ ও সন্ধির ময়দানে নিয়ে এসেছেন। তারপর এসব স্থানে পুণ্য পূতঃচরিত্রের শাসন কায়েম করেছেন।

নবী (সা)-এর হেদায়াতের উত্তম প্রভাব

এ ছিল তাঁরই হেদায়াত ও পথনির্দেশনার মহৎ প্রভাব (فيض) যে, নবুওয়াতের সূচনালগ্নে যারা ছিল ডাকাত তাদেরকে তিনি এমন অবস্থায় রেখে গেলেন যে, তারা আমানতদার এবং মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত আবরুর রক্ষক হয়ে পড়লো। যাদেরকে তিনি পেয়েছিলেন পরসম্পদ হরণকারী। তাদেরকে অধিকার দানকারী, অধিকার রক্ষক এবং অন্যান্যকে অপরের অধিকার প্রদানে উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে রেখে গেলেন। তাঁর পূর্বে

দুনিয়া শুধু ঐসব শাসকদের সম্পর্কে অবগত ছিল যারা যুলুম নিষ্পেষণের মাধ্যমে প্রজাদেরকে দমিত করে রাখতো এবং আকাশচুম্বী প্রাসাদে বসবাস করে নিজেদের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব খাটাতো। নবী মুহাম্মাদ (সা) সে দুনিয়াকেই এমন সব শাসকের সাথে পরিচিত করে দিলেন, যারা হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করতেন এবং ন্যায়-নীতি ও সুবিচার দিয়ে মানুষের মন জয় করতেন। তাঁর পূর্বে দুনিয়া ঐসব সৈনিককে জানতো যারা কোনো দেশে প্রবেশ করলে চারদিকে হত্যাকাণ্ড চালাতো, জনপদগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিত এবং বিজিত জাতির নারীদের সম্ভ্রম-সতীত্ব বিনষ্ট করতো, তিনি সেই দুনিয়াকেই আবার এমন সেনাবাহিনীর সাথে পরিচিত করে দিলেন যারা কোনো শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে দুশমনের সেনাবাহিনী ছাড়া কারো উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতো না এবং বিজিত শহর থেকে আদায়কৃত কর পর্যন্ত তাদেরকে ফেরৎ দিয়ে দিত। মানব ইতিহাস বিভিন্ন দেশ ও নগর বিজয়ের কাহিনীতে ভরপুর। কিন্তু মক্কা বিজয়ের কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। যে শহরের লোকেরা তের বছর যাবত নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর যুলুম নিষ্পেষণ করেছে সে শহরেই বিজয়ীর বেশে তাঁর প্রবেশ এমনভাবে হয়েছিল যে, আল্লাহর সামনে অবনত মস্তকে তিনি চলছিলেন। তাঁর কপাল উঁটের হাওদা ছোঁয়া ছোঁয়া হচ্ছিল এবং তাঁর অচরণে গর্ব অহংকারের কোনো লেশ ছিল না। ঐসব লোক, যারা তের বছর ধরে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে থাকে, যারা রাসূলকে হিজরত করতে বাধ্য করে এবং হিজরতের পরও তাঁর বিরুদ্ধে আট বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে, তারা পরাজিত হয়ে যখন তাঁর সামনে হাজির হয়ে করুণা ভিক্ষা করে, তখন নবী মুহাম্মাদ (সা) প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে বলেন,

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْ هَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ ـ

"আজ তোমাদের কোনো পাকড়াও নেই। যাও, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো।"

নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর আদর্শের যে প্রভাব মুসলিম উম্মাহর উপর পড়েছে, তা যদি কেউ ধারণা করতে চায় তাহলে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সে দেখতে পাবে যে, মুসলমান যখন বিজয়ীর বেশে স্পেনে প্রবেশ করে তখন তাদের আচরণ কিরূপ ছিল এবং খৃস্টানগণ যখন তাদের উপর বিজয়ী হয় তখন তারা কোন্ ধরনের আচরণ করেছিল। ক্রুসেড যুদ্ধকালে যখন খৃস্টানগণ বায়তুল মাকদিস প্রবেশ করে তখন তারা মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করে এবং মুসলমানগণ যখন বায়তুল মাকদিস খৃস্টানদের নিকট থেকে পুনঃ দখল করে তখন খৃস্টানদের প্রতি তাদের আচরণ কিরূপ ছিল।

নবী করীম (সা)-এর সীরাত এমন এক মহাসমুদ্র যা কোনো গ্রন্থেও সমাবিষ্ট করা সম্ভব নয়। আর একটি বক্তৃতায় তার চিন্তাও করা যায় না। তথাপি আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি আলোকপাত করলাম। তাঁরাই ভাগ্যবান যাঁরা এই একমাত্র হেদায়াতের মাধ্যমে জীবনের পথনির্দেশনা লাভ করবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

—: সমাপ্ত :—

নির্দেশিকা

(২৫২)	তাফহীমুল কুরআন	সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ১৭
(২৫৩)	ঐ	সূরা আল ফুরকান, টীকা ৫৪
(২৫৪)	ঐ	সূরা ইউসুফ, টীকা ৭৯
(২৫৫)	ঐ	সূরা আয্ যারিয়াত, টীকা ২১
(২৫৬)	ঐ	সূরা হুদ, টীকা ১১৫
(২৫৭)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা ভূমিকা
(২৫৮)	ঐ	সূরা ইউনুস, টীকা ১৮
(২৫৯)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৪৭
(২৬০)	ঐ	সূরা হুদ, টীকা ৪৬
(২৬১)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৪৮
(২৬২)	ঐ	সূরা নূহ, টীকা ১৬
(২৬৩)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৪৮
(২৬৪)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ৮৫
(২৬৫)	ঐ	সূরা হুদ, টীকা ৪২
(২৬৬)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৪৬
(২৬৭)	ঐ	সূরা আল আনকাবূত ২৫
(২৬৮)	ঐ	সূরা আল কামার ১৪
(২৬৯)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৫১
(২৭০)	ঐ	সূরা আল আহ্কাফ, টীকা ২৫
(২৭১)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ২৫
(২৭২)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৫৬
(২৭৩)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ৮৬
(২৭৪)	ঐ	সূরা আত্ তাওবা, টীকা ৭৯
(২৭৫)	ঐ	সূরা হামীম আস্ সাজদা, টীকা ২০
(২৭৬)	ঐ	সূরা আল কামার, টীকা ১৬
(২৭৭)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১৬
(২৭৮)	ঐ	সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৬৫
(২৭৯)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৫৭
(২৮০)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৫৯
(২৮১)	ঐ	সূরা আল হিজর, টীকা ৪৫
(২৮২)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৫৭
(২৮৩)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ৯৫
(২৮৪)	ঐ	সূরা আল কামার, টীকা ১৭
(২৮৫)	ঐ	সূরা আন্ নামল, টীকা ৫৮
(২৮৬)	ঐ	সূরা আল কামার, টীকা ১৯
(২৮৭)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৫৮
(২৮৮)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ১০৫
(২৮৯)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৬১
(২৯০)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৫৮
(২৯১)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৬১

(২৯২) ঐ সূরা আন্ নামল, টীকা ৬৫

(২৯৩) ঐ সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ১০৬

(২৯৪) ঐ সূরা হূদ, টীকা ৭৪

(২৯৫) ঐ সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ৯৯

(২৯৬) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১২৩

(২৯৭) ঐ সূরা আল আনআম, টীকা ৫২

(২৯৮) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ২৫৮

(২৯৯) ঐ ঐ ঐ, ২৯১-২৯২

(৩০০) ঐ সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৬২

(৩০১) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৬২

(৩০২) ঐ সূরা আশ শুআরা, টীকা ৭৩

(৩০৩) ঐ সূরা আনকাবূত, টীকা ৪৯

(৩০৪) ঐ সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৬৬

(৩০৫) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৬৩

(৩০৬) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৬৩

(৩০৭) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৬৩

(৩০৮) ঐ সূরা আল হিজর, টীকা ৪২

(৩০৯) ঐ সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৫১-৫২

(৩১০) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৬৪

(৩১১) ঐ সূরা হূদ, টীকা ৮৬-৮৮

(৩১২) ঐ সূরা আল হিজর, টীকা ৩৯

(৩১৩) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩৯

(৩১৪) ঐ সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ১১১

(৩১৫) ঐ সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৫৩

(৩১৬) ঐ সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৫৫

(৩১৭) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫৬

(৩১৮) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫৭

(৩১৯) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫৮

(৩২০) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫৮

(৩২১) ঐ সূরা হূদ, টীকা ৮৬

(৩২২) ঐ সূরা আল কামার, টীকা ২২

(৩২৩) ঐ সূরা আয্ যারিয়াত, টীকা ৩২

(৩২৪) ঐ সূরা হূদ, টীকা ৯১

(৩২৫) ঐ সূরা আয্ যারিয়াত, টীকা ৩৪

(৩২৬) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩৪

(৩২৭) ঐ সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ১১৪

(৩২৮) ঐ সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৫৯

(৩২৯) ঐ সূরা আয্ যারিয়াত, টীকা ৩৫

(৩৩০) ঐ সূরা আন্ নামল, টীকা ২৯

(৩৩১) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩০

(৩৩২) ঐ সূরা আস সাবা, টীকা ৩৫

(৩৩৩) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩৩

(৩৩৪) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩৭

(৩৩৫)	ঐ	সূরা আশ শুআরা, টীকা ১১৫
(৩৩৬)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৬৯
(৩৩৭)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৭৪
(৩৩৮)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৭৫
(৩৩৯)	ঐ	সূরা আশ্ শুআরা, টীকা ১১৭
(৩৪০)	ঐ	সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৮৩
(৩৪১)	ঐ	সূরা ইউনুস, টীকা ৯৮-১০০
(৩৪২)	ঐ	সূরা আল বাকারা, টীকা ১২৩
(৩৪৩)	ঐ	সূরা আল মায়েদা, টীকা ৪২
(৩৪৪)	ঐ	সূরা ইসরা, টীকা ৬-৭
(৩৪৫)	ঐ	সূরা আল বাকারা, টীকা ১০৪-১০৬
(৩৪৬)	ঐ	সূরা ইসরা, টীকা ৮
(৩৪৭)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ৯
(৩৪৮)	ঐ	সূরা আলে ইমরান, টীকা ৫১
(৩৪৯)	ঐ	সূরা আল মারইয়াম, টীকা ১২
(৩৫০)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১৪-১৯, ২১
(৩৫১)		ইসলামী বিপ্লবের পথ ঃ পৃষ্ঠা (উর্দু) ২৪-২৫
(৩৫২)		আল জিহাদ ফিল ইসলাম পৃষ্ঠা ২৭-২৮
(৩৫৩)		তাফহীমুল কুরআন সূরা ইখলাস ভূমিকা
(৩৫৪)	ঐ	সূরা আল হুজুরাত, টীকা ২৮
(৩৫৫)		তাফহীমাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪১
(৩৫৬)		তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আনআম, টীকা ১০৯
(৩৫৭)	ঐ	সূরা আন নাজ্‌ম, টীকা ১৫
(৩৫৮)	ঐ	সূরা নূহ, টীকা ১৭
(৩৫৯)	ঐ	সূরা আস্ সাফ্‌ফাত, টীকা ৭১
(৩৬০)	ঐ	সূরা আল আনআম, টীকা ১
(৩৬১)	ঐ	সূরা ইখলাস, টীকা ২
(৩৬২)	ঐ	সূরা আল আনআম, টীকা ১০৫
(৩৬৩)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১০৬
(৩৬৪)	ঐ	সূরা আন্ ন্যহল, টীকা ৬৪
(৩৬৫)	ঐ	সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮৪
(৩৬৬)	ঐ	সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮৪
(৩৬৭)	ঐ	সূরা আন্ নাহ্‌ল, টীকা ১৯
(৩৬৮)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১৯
(৩৬৯)	ঐ	সূরা আয্ যুখরুফ, ভূমিকা
(৩৭০)	ঐ	সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১৪৮
(৩৭১)	ঐ	সূরা আল আহ্‌কাফ, টীকা ৬
(৩৭২)	ঐ	সূরা ইউনুস, টীকা ৩৭
(৩৭৩)	ঐ	সূরা আন্ নূর, টীকা ৫৯
(৩৭৪)	ঐ	সূরা আল মায়েদা, টীকা ১৪
(৩৭৫)	ঐ	সূরা আল আনআম, টীকা ১১১
(৩৭৬)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১১২
(৩৭৭)	ঐ	ঐ ঐ, টীকা ১১৪

(৩৭৮) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ১১৮
(৩৭৯) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১৯৯
(৩৮০) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ২১৮
(৩৮১) ঐ ঐ ঐ, টীকা ২২১
(৩৮২) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ৮৮
(৩৮৩) ঐ সূরা আল ব্যকারা, টীকা ১৯৮
(৩৮৪) ঐ সূরা জিন, টীকা ৭
(৩৮৫) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ৪
(৩৮৬) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৮৮
(৩৮৭) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৪৯
(৩৮৮) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ২৫০
(৩৮৯) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ৪
(৩৯০) ঐ ঐ ঐ, টীকা ১৫৫
(৩৯১) ঐ সূরা আল মাউন, টীকা ৫
(৩৯২) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫
(৩৯৩) ঐ সূরা আল আনআম, টীকা ১০৭
(৩৯৪) ঐ সূরা আল ফাজর, টীকা ১৩
(৩৯৫) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ৫৫
(৩৯৬) ঐ সূরা আত তাকভীর, টীকা ৯
(৩৯৭) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৯
(৩৯৮) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১৭৭
(৩৯৯) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১৫
(৪০০) ঐ সূরা আল আদিয়াত, ভূমিকা
(৪০১) ঐ সূরা আল আদিয়াত, টীকা ৩
(৪০২) ঐ সূরা আল কুরাইশ, টীকা ৫
(৪০৩) ঐ সূরা আস্ সাজ্দা, টীকা ৫
(৪০৪) ঐ সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮৪
(৪০৫) ঐ সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১৫
(৪০৬) তাফহীমাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৩
(৪০৭) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ২৭
(৪০৮) ঐ সূরা লুকমান, টীকা ৬১
(৪০৯) ঐ সূরা আর রাহমান, টীকা ১৩
(৪১০) ঐ সূরা আশ শুআরা, টীকা ৫৭
(৪১১) ঐ সূরা আস্ সাবা, টীকা ৭৬
(৪১২) রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮
(৪১৩) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নামল, টীকা ৭৩
(৪১৪) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৭৪
(৪১৫) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৮০
(৪১৬) ঐ সূরা আর রূম, টীকা ৬
(৪১৭) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১২৩
(৪১৮) ঐ সূরা আল হাশর, টীকা ৪
(৪১৯) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ৪২
(৪২০) ঐ সূরা আল হাশর, টীকা ৪

(৪২১) ঐ সূরা আল জুমুআ, টীকা ১০
(৪২২) ঐ সূরা ইউসুফ, ভূমিকা
(৪২৩) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৬৯
(৪২৪) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৬৮
(৪২৫) ঐ সূরা ইউসুফ, টীকা ৬৮
(৪২৬) ঐ সূরা আল কাসাস, টীকা ৫
(৪২৭) ঐ সূরা আস্ সাজদা, টীকা ৩৬
(৪২৮) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৮৬
(৪২৯) ঐ সূরা ইউনুস, টীকা ৭৮
(৪৩০) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৭৯
(৪৩১) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৯৩
(৪৩২) ঐ সূরা ইউনুস, টীকা ৭৯
(৪৩৩) ঐ সূরা তোয়াহা, টীকা ৫৩-৫৪
(৪৩৪) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ৪৬
(৪৩৫) ঐ সূরা ইবরাহীম, টীকা ১২
(৪৩৬) ঐ সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৯৮
(৪৩৭) ঐ সূরা ইস্‌রা, টীকা ৭
(৪৩৮) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৭
(৪৩৯) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৭
(৪৪০) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৭
(৪৪১) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৮
(৪৪২) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৮
(৪৪৩) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৯
(৪৪৪) ঐ সূরা আলে ইমরান, টীকা ১৩২
(৪৪৫) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১৬
(৪৪৬) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ৯০
সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ৩৪
সূরা আত্ তাওবা, টীকা ৩৩
(৪৪৭) আল জিহাদ ফীল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৮০-৩৮২
(৪৪৮) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টীকা ২
(৪৪৯) ঐ সূরা আল হাশর, ভূমিকা
(৪৫০) ঐ ঐ ঐ
(৪৫১) ঐ সূরা আল বাকারা, ভূমিকা
(৪৫২) ঐ সূরা আলে ইমরান, টীকা ৬৪
(৪৫৩) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ৮০
(৪৫৪) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ৭০
(৪৫৫) ঐ সূরা আল আনআম, টীকা ১২২
(৪৫৬) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ৯৫
(৪৫৭) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৫৮
(৪৫৮) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ৩৬
(৪৫৯) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৩৬
(৪৬০) ঐ সূরা আল বাকারা, টীকা ১৩৫
(৪৬১) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ৩৯

(৪৬২) ঐ সূরা আন নিসা, টীকা ২১২
(৪৬৩) ঐ ঐ, টীকা ২১৩
(৪৬৪) ঐ ঐ ঐ, ২১৫
(৪৬৫) ঐ সূরা আল কাহ্‌ফ, টীকা ২০
(৪৬৬) ঐ সূরা আস্ সফ, টীকা ৮
(৪৬৭) ঐ সূরা আল হাদীদ, টীকা ৫৪
(৪৬৮) আল জিহাদ ফীল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪০৭-৪১০
(৪৬৯) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস্ সফ, টীকা ৮
(৪৭০) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৯
(৪৭১) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদা টীকা ১০১
(৪৭২) ঐ সূরা আত্ তাগাবুন, টীকা ৫
(৪৭৩) ঐ সূরা আল মায়েদা, টীকা ১৩০
(৪৭৪) ঐ সূরা আস্ সফ, টীকা ৭
(৪৭৫) ঐ ঐ ঐ, টীকা ৮
(৪৭৬) ঐ সূরা আল বুরুজ, টীকা ৪
(৪৭৭) ঐ সূরা আল ফীল, ভূমিকা
(৪৭৮) ঐ সূরা আল আলাক, ভূমিকা
(৪৭৯) ঐ সূরা আল ফুরকান, টীকা ১২
(৪৮০) ঐ সূরা আল মারইয়াম, ভূমিকা
(৪৮১) ঐ ঐ ঐ
(৪৮২) ঐ ঐ ঐ
(৪৮৩) রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০
(৪৮৪) তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত্ তাহ্‌রীম, টীকা ২
(৪৮৫) ঐ সূরা আলে ইমরান, টীকা ২৯
(৪৮৬) সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, উর্দু, পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮২
(৪৮৭) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫
(৪৮৮) সীরাতের পয়গাম, পৃষ্ঠা ৩-৩৬